সোনালী ডানার পাখি

চিত্তরঞ্জন মাইতি



দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা
ডিসেম্বর ১৯৫০

Sonali Danar Pakhi
A Bengali Novel by
Chittaranjan Maity
Published by Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073

প্রকাশক
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
ধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ISBN-81-7079-427-7

পরম স্নেহভাজন
সুধাংশুশেখর দে
ও
সুভাষচন্দ্র দে
অনুজপ্রতিমেষু

সাহিত্যক্ষেত্রে অন্য এক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি আবির্ভূত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর দু'-একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত লেখক চিত্তরঞ্জন মাইতির কালানুক্রমিক একটি গ্রন্থ-তালিকা নিচে দেওয়া হল। শিশুসাহিত্য ও অনুবাদ গ্রন্থগুলি এই তালিকায় দেওয়া হল না। সেই সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের নাম-পৃষ্ঠায় যুক্ত হল তাঁর স্বাক্ষর।

শৈলপুরী কুমায়ুন
কলাভূমি কলিঙ্গ
অগ্নিকন্যা
অনেক বসন্ত দুটি মন
ভোরের রাগিণী
ডাক্তার জনসনের ডায়েরী
রোদ বৃষ্টি ভালবাসা
কন্যা কাশ্মীর
বসন্ত বিলাপ
হিরণ্যগড়ের বধূ
আঁধার পেরিয়ে
বর্ষা বসন্ত ছুঁয়ে
রিসেপ্‌শনিস্ট
ফরেস্ট বাংলো
নির্জনে খেলা
মোহিনী
কালের কল্লোল
পরমা
আর্য-অনার্য
আপন ঘর
নির্জন নির্ঝর
সাইক্লোন
মহাকালের বন্দর
ত্রিবেণী
মরু-মৃগয়া
বনপর্ব
মেঘ-ময়ূরী
কালের রাখাল
জয়িতা
অনুরাগিণী
মন-অরণ্য
অনন্যা
শ্রেষ্ঠ গল্প
অমৃত নিকেতন
স্বপ্ন-শিখর
পদধ্বনি
লীলা সঙ্গম
মন্থন
নীলাঞ্জনা
দাহা তিসি গোংগা
মনের মধ্যে মন
শাহজাদা শুজা

মাঝরাতে আধো ঘুমে
পাতা থেকে ঝরে পড়া
বৃষ্টির শব্দের মত স্বপ্নময়
পায়ের পাতার ধ্বনি তুলে
স্থির চোখে চেয়েছিল,
বিদ্যুতের চকিত শিখায়
দৃষ্টি বিনিময়,
স্মৃতির সরণী বেয়ে
আজ তারা বড় প্রিয়, একান্ত আপন।
অমর্তের আলোকধেনুরা
চিরদিন অধরামাধুরী,
মর্তের মাটির পাত্র তাই
ওরাই ভরেছে বার বার।
তাতারসি-ব্যথা,
আনন্দের অশ্রুভরা মেঘ,
বুকে নিয়ে
বসুধার সঞ্চিত সুধায়।
শাওনের আকুল প্লাবন,
বসন্তের ডালভরা ফুল,
বকুলের করুণসুবাস,
হলুদ সোনার ছোঁয়া আমার জীবনে,
বেলাশেষে
জোনাকির ঝিলিমিলি।
কণ্ঠভরা সুরে
সোনার পালকে
'সোনালী ডানার পাখি'
ওদেরই উজ্জ্বল উচ্চারণ!

বৌভাত সারা হলো দেশের বাড়িতে। এখন মধুচন্দ্রিমা যাপনের পালা। কোথায় যাওয়া যায়? বালিশে কনুই ঠেকিয়ে আমরা মুখোমুখি বসে আলোচনা করছিলাম।

আমি বললাম—

'দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।'

সঙ্গীতা থুতনিতে হাতের পাতা ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগল।

আমি আবার বললাম, চল কুলু মানালী যাই।

ও মুখ তুলল। দুটো গভীর চোখ আমার মুখের ওপর রেখে বলল, তোমার মুখে তোমাদের চকবাড়ির কথা অনেক শুনেছি। আদিম বন্য গন্ধ আছে জায়গাটায়। নদীও বইছে। চল না গো, নৌকো করে ওখানে যাই।

বললাম, দারুণ পরিকল্পনা। সভ্য জগতের বাইরে ভারী নির্জন জায়গা। কটা দিন বড় একান্তে কাটান যাবে।

নৌকো ঠিক হলো। দুখানা গাঁয়ের ওপারে তেখালিতে মাঝির বাড়ি। হাটে এসেছিল, কথা পাকা করে আগাম দেওয়া হলো।

পূর্ণিমার জোয়ারে ভরা খালের ওপর দিয়ে নৌকো চলবে। ঘণ্টাতিনেক আঁকাবাঁকা খালের ভেতর দিয়ে চলা, তারপর সুনিয়ার গাঙে গিয়ে পড়বে নৌকো। রান্নাবান্না হবে নৌকোতে অথবা নদীর চরে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা হবে।

সাঁঝের শাঁখ বেজে উঠল গাঁয়ের ঘরে ঘরে। মন্দিরে আরতির সঙ্গে সঙ্গে খোল করতালে গৃহ-দেবতার বন্দনা-গান চলল।

জয় জয়, লক্ষ্মী জনার্দন প্রভুর আরতি সাজে
শঙ্খ ঘণ্টা আর ঝাঁঝর বাজে।

গান শেষ হলে আমরা ঠাকুর প্রণাম সেরে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই নৈশ নৌ-যাত্রার পরিকল্পনা আমরা দুজনে করেছিলাম। মধুচন্দ্রিমার যাত্রাটা পূর্ণচন্দ্রের অলোতেই হোক, এই ছিল বাসনা। অবশ্য আষাঢ়ের বর্ষা কখনো-সখনো একরাশ বকুল ফুলের মতো ঝরে পড়ছিল। কিন্তু আমাদের যাত্রার সময় আকাশে জেগেছিল ঝকঝকে রুপোর থালার মতো চাঁদ। দিগন্তে মেঘের আভাস থাকলেও আকাশ ঘিরে চাঁদের লোভে লোভে মেঘ জমে ওঠেনি।

দীনু মাঝি তার জোয়ান ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। দাঁড় টানবে,

দরকার হলে গুণও টানবে। দীনু মাঝির ছেলের নাম কালাচাঁদ। এছাড়া আছে কুন্তীদির মেয়ে শৈল। সে আমাদের সঙ্গে তাদের চরের বাড়িতে যাবে কুন্তীদির সঙ্গে দেখা করতে।

সঙ্গীতা কৌতুক করে আমার কানে কানে বলল, ও কালাচাঁদ নয়, চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু।

বললাম, ঠিক বলেছ। কালো একখানা পাথর কুঁদে যেন তৈরি হয়েছে। মুখখানাতে নবীন মেঘের লাবণ্য মাখানো।

কথায় কাব্যের গন্ধ পেয়ে সঙ্গীতা আমার দিকে তাকাল। মুখে এক-টুকরো হাসি।

নৌকো চলেছে সংকীর্ণ খালের ভেতর দিয়ে। কূলে যাতে নৌকো না ঠেকে যায়, কালাচাঁদ লগির ঠেলায় নৌকোর মাথা সিধে রাখছে। নৌকোর সরু কিনারে সে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করছে। লগি ঠেলছে কখনো বসে, কখনো দাঁড়িয়ে। অনুকূল জোয়ার আর সজোরে লগির ঠেলায় তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে নৌকো। আমরা দুজনে বসে আছি ছই-এর ভেতর। চাঁদের আলোয় মাঠঘাট, বনবাদাড়, ঘরদোর মায়াপুরী বলে মনে হচ্ছে।

সঙ্গীতা গুনগুন করে কি একটা গানের কলি ভাঁজছে। বড় চেনা চেনা সুর, কিন্তু গানের কথা মনে আনতে পারছি না।

বললাম, 'তোমার গোপন কথাটি, সখী রেখো না মনে।'

ওর গুনগুনানি থেমে গেল। অনুচ্চে বলল, ওদের সামনে কি গলা ছেড়ে গান গাওয়া যায়!

বললাম, কেন কি হয়েছে তাতে?

সঙ্গীতা বলল, গাঁয়ের মানুষ হাটে গিয়ে তোমার বেহায়া বউয়ের নামে বদনাম ছড়াবে। কথাটা মায়ের কানে গেলে কি হবে ভেবেছ?

কিছুই হবে না। আমার মাকে তো চেন না, মিথ্যা অপবাদ মা থোড়াই কেয়ার করে। মা ভারী স্বাধীনচেতা আর গানের বড় ভক্ত।

সঙ্গীতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গান ধরল—

'পুব-হওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয় নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।।'

সুরের লহরী জ্যোৎস্নাধোয়া বনপ্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। বনপাদপের কম্পিত পল্লব পেল সে সুরের ছোঁয়া। নৈশ নীড়ে সুপ্ত পাখিরা সহসা জেগে উঠে শুনল সে গানের সুর। শুরু হলো জোনাকির ঝিকিমিকি নাচ।

এ সবই শ্রোতার কল্পনা। ভাল লাগা মনে এমনি সব ছবি তৈরি হতে থাকে।

গ্রামের ভেতর দিয়ে খাল চলে গেছে। খাল-পাড়ে মাড়া রাস্তা দেখা যাচ্ছে। বাঁশবন নুয়ে পড়েছে খালের ওপর। নৌকোর ছইএর মাথায় লেগে সর্‌সর্ শব্দ হচ্ছে। ছই যেন সর্‌সর্ শব্দ তুলে সরিয়ে দিচ্ছে পথ আগলে রাখা অবাঞ্ছিত ডালপাতাগুলোকে।

খাল পারাপারের জন্য কোথাও বা বাঁশের সাঁকো বাঁধা আছে। কালাচাঁদ দেখা গেল বেশ হুঁশিয়ার। সে ঠিক জায়গায় এসে মাথাটা নিচু করল। দু'হাত ওপরে তুলে সাঁকো ধরে ঠেলতেই নৌকোটা সড়াৎ করে সামনে এগিয়ে গেল।

কোথাও-বা খালের ধারে মাটির ঘরবাড়ি। ছোট ছোট ঝোরকা দিয়ে টেমির আলো বেরিয়ে আসছে। রাতের রান্না সারছে বাড়ির বউড়ীরা। গামা গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরেছে খালের খসে পড়া পাড়। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ফুটে আছে হাবুলি গাছের লাল হলুদ ফুল। ঘুঘুর ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, একটা আমড়া গাছের ডালে দুটো ঘুঘুপাখি বসে আছে। চাঁদের ফুটফুটে জ্যোৎস্নাকে দিনের আলো বলে ভুল করল নাকি!

এবার ফাঁকা প্রান্তরের বুক চিরে খালটা চলে গেছে। খালের দু-পাড়ে কিছুদূর অব্দি মাটি জ্যোৎস্নার আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। তার ঠিক পর থেকেই চাষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

সংগীতা বলল, এই মাটিগুলো এমন সাদা দেখাচ্ছে কেন?

কোটালে খালের জল উপচে পড়ে দু-কূল ভাসিয়ে দেয়। সমুদ্রের জল নদীতে উঠে আসে জোয়ারে। ঐ জল ঠেলে ঢুকে পড়ে খালের ভেতর। জলটা খর লোনা, তাই জল শুকুলেই মাটিতে চকচকে সাদা রঙ ধরে।

সংগীতা বলল, খালের সব জায়গা কিন্তু এমন নয়।

বললাম, নামাল বা নিচু জায়গাতেই এ দৃশ্য দেখা যায়। এখন ভর জোয়ার চলছে, একটু পরেই কোটালের জল পাড় উপচে বইবে। ততক্ষণে আমরা নদীতে গিয়ে পড়ব।

আবার নদীর ধারে শেয়ালকাঁটার ঝোপ শুরু হলো। গামা জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা শেয়াল।

চুপি চুপি বললাম, দেখ, দেখ।

সংগীতা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি করছে ও?

বললাম, চাঁদের আলোয় প্রাণে খুশির জোয়ার জেগেছে, তাই গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে।

সত্যি!

হেসে বললাম, ওর আর একটা উদ্দেশ্য আছে। জোয়ার নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খালের পাড়ে জলে ডোবা গর্তগুলো জেগে উঠবে। তখন গর্তে পা ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরে খাবে।

ওর পায়ে কি নখ আছে বেড়ালের মতো যে কাঁকড়াকে আঁচড়ে তুলে আনবে?

বললাম, কথায় আছে শেয়ালের বুদ্ধি। ও পা ঢুকিয়ে দেবে গর্তে, অমনি কাঁকড়াটা কামড়ে ধরবে পায়ে, সঙ্গে সঙ্গে ও কাঁকড়া সমেত পা-টা ওপরে তুলে আনবে। তারপর ধারাল দাঁতের কামড়ে কাঁকড়া ভক্ষণ।

শেয়ালটা নৌকোর শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল, তারপর লেজ গুটিয়ে

মাঠের দিকে মুখ করে চোঁচা দৌড় লাগাল।

আমরা যখন নদীতে পড়লাম তখন জোয়ার থেমে গেছে। নদী কানায় কানায় ভরা, চারদিকে থমথমে ভাব।

দীনু মাঝি বলল, ছোটবাবু, ইখানে লৌকো বেঁধে রান্না চড়াই ?

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো চোখের ওপর ফুটে উঠল একটা মুখ। কতদিন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলিনি, কেমন আছ কুমু ?

কোনোদিক না ভেবে হঠাৎ স্থির করে ফেললাম, সংগীতাকে নিয়ে কুমুর কাছে গিয়ে দাঁড়াব।

দীনুকে বললাম, সমুদ্রের দিকে মাইল দুয়েক এগিয়ে গিয়ে ওপারের চড়ায় নৌকো বাঁধ।

দীনু সারাজীবন নদীনালা চুঁড়ে বেড়িয়েছে। সে বলল, দু-মাইলটাক গেলে সুনিয়ার পারঘাট মিলবে। কিন্তু বাবু, ওটা যে আপনার উল্টোদিক হয়ে গেল।

বললাম, তা হোক দীনু, এবার ভাটা শুরু হয়ে যাবে। গুণ টেনে আর কন্দুর নিয়ে যেতে পারবে নৌকো। তার চেয়ে চল সুনিয়ার ঘাটেই যাওয়া যাক, ওখানে তোমরা রান্না চাপাবে আর আমি একটু কাজ সেরে নেব।

দাঁড়ে হাত লাগাল কালাচাঁদ আর হাল ধরে বসে রইল দীনু। এখন সারা গাঙ স্থির, যোগীর মতো বসে আছে নিশ্বাস রোধ করে। না প্রতিকূল, না অনুকূল গতি।

কালাচাঁদ ভাটার টানের সাহায্য না পেলেও উজান ঠেলার কষ্ট থেকে বাঁচল। সে সমান তালে দাঁড় টানতে টানতে নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল সুনিয়ার খেয়াঘাটের দিকে।

সংগীতাকে বললাম, এখন ভাটা শুরু হবে। ভাটা ঠেলে চকবাড়ির দিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। কয়েক ঘণ্টা নোঙর ফেলে থাকতে হবে আমাদের। তাই ভাবলাম, একজনের সঙ্গে দেখা করে আসি।

কে তিনি ? কোথায় থাকেন ?

মাইল দুয়েক দূরে খেয়াঘাটের পাশে তার আস্তানা। সে তোমারই মতো একটি মেয়ে, বয়সে সামান্য কিছু বড় হবে তোমার চেয়ে।

তুমি তো কই তার কথা আমাকে কিছু বলনি। কি নাম তার ?

কুমু, কুমুদিনী !

নামটি তো বেশ মিষ্টি। এখনো বিয়ে হয়নি নিশ্চয় ?

কি করে বুঝলে ?

আমার বয়সী একটি মেয়েকে এত রাতে তুমি তার শ্বশুরবাড়িতে দেখতে যাবে, এটাতে মন সায় দিচ্ছে না। বরং নিজের বউকে নিয়ে মেয়েটির বাপের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া চলে।

বললাম, যাচ্ছি ওর বাপের বাড়িতেই, তবে কুমু বিবাহিতা।

সেকি, কুমুর স্বামী ঘরজামাই রয়েছেন বুঝি ?

তা কিছুটা সত্যি। কুমুর বাবা-মা নেই। তাই কুমু তার বাবার বাড়িতেই থাকে। কুমুর স্বামীর সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ অনেকখানি। হতে পারে কুমু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পরিণীতা। আমি সঠিক জানি না। তবে ভদ্রলোক তাঁর পৈতৃক আবাসে সপ্তাহে পাঁচ ছ-দিন কাটান। শনিবার সন্ধ্যায় কুমুর কাছে আসেন, সোমবার ভোর না হতেই চলে যান।

এভাবে স্ত্রীকে ফেলে রেখে যাবার অর্থ ?

চাকরির জায়গাটা নিজের বাড়ির কাছে কিনা, তাই এরকম ব্যবস্থা।

বাকি এতগুলো দিন কুমু একা কি করে কাটায় ?

বললাম, ওর বাবার আমলের একটি বয়স্ক কাজের লোক আছে, সে কুমুকে সারাক্ষণ আগলে রাখে। তবে কুমুকে তার মনের কণ্ট মনেই চেপে রাখতে হয়।

সঙ্গীতা একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, কুমুর বাবা-মায়ের কি চলে যাবার বয়েস হয়েছিল ?

চলে যাবার কি সময় অসময় আছে সঙ্গীতা ? তবে ওদের ছোট্ট সংসারের আলাদা একটা ইতিহাস আছে।

সঙ্গীতা আমার মুখের ওপর কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

ভাবলাম, সঙ্গীতার সবটুকু জানা দরকার। তবে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কুমুদের সংসারের কাহিনী শুরু করলাম।

ধু-ধু নদীর চরে একটা ছোট্ট খালের ধারে কুমুদের বাড়ি। আশপাশে কোনো জনমনিষ্যি নেই। বাড়িটার একপাশে একটা বড় ঝিল।

সঙ্গীতা জানতে চাইল, লোকালয়ে কুমুরা বাস করে না কেন ?

সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি, কুমুরা বামুন বাড়ির মেয়ে। ওদের আদিবাড়ি ছিল একটা জমজমাট গাঁয়ে। ওর মা নতুনবউ হয়ে পালকিতে চেপে প্রথম শ্বশুরবাড়ি এল। পালকি থেকে নেমে প্রণামপর্ব সারতে গিয়ে ভুলে একটি বুড়ো বেহারার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। হৈ হৈ রব উঠল চারদিকে। নির্দোষ সেই বুড়ো বেহারাটিকে দু-ঘা জুতোর বাড়ি মেরে উঠোন থেকে বের করে দেওয়া হলো। নতুন বউ এ দৃশ্য দেখল।

সমাজের মোড়ল-মাতব্বরেরা বিধান দিলেন নববধূকে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কথাটা শুনে বেঁকে বসলেন কুমুর মা। অসম্ভব তেজস্বী ছিলেন মহিলা। স্বামীকে একান্তে পেয়ে বললেন, বাপের বয়সী বুড়ো মানুষটিকে প্রণাম করে আমি কোনো অন্যায় করিনি। তাই প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এতে আমাকে যদি বাড়ি থেকে বেরও করে দেওয়া হয়, সে শাস্তি আমি মাথায় নিয়ে চলে যাব।

এ নিয়ে বাপের সঙ্গে ছেলের বিরোধ বাধল। শেষে ছেলে-বউ দুজনেই বিতাড়িত হলো। সেই থেকে এই নদীর চরে, লোকালয় থেকে বেশ খানিক দূরে ওঁরা ওঁদের বসতি পত্তন করেছেন। বাড়ি থেকে মাইল চারেক দূরে একটি প্রাইমারী স্কুলে কাজ করতেন কুমুর বাবা। নদীর ওপারে দু-এক ঘর যজমানও

ছিল তাঁর। এদিকে কুমুর মা সকাল থেকে সংসারের কাজ সেরে, গরু-বাছুরের পরিচর্যা করে, স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে রওনা করিয়ে দিতেন। তারপর নিজে দুপুরের খাওয়া শেষ করে চলে যেতেন পারঘাটের ধারে। সেখানে ছোট্ট একটা টঙ, তালপাতার ছাউনি। ঐ টঙের ভেতর জালাতে খাবার জল ভরে রাখা হতো। কুমুর মা ওরই ভেতর বসতেন। হাতের কাছে রাখতেন গুড় আর ছোলা। পারাথীরা জল খেতে চাইলে হাতে ছোলা গুড় দিয়ে জল দিতেন। বর্ষাকালে গরিব মানুষদের হাতে তুলে দিতেন তালপাতার পাখিয়া। ঝিলের ধারের তালগাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে নিজেই ওসব বানাতেন।

কুমুর জন্ম হলো। বড় হয়ে কোনো স্কুলে গেল না সে। ঘরে মা-বাবার কাছেই সে পড়ত। মা মারা যাবার পর বাবাই তাকে আগলে রাখতেন।

সংগীতা বলল, কুমুর মা কি হঠাৎ কোনো অসুখে মারা গিয়েছিলেন?

কুমুর বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু কুমুর মা তাঁর আগেই মারা যান একটি দুর্ঘটনায়।

কি রকম!

সাইক্লোন হলো বিয়াল্লিশে। সমুদ্রতীরের গাঁগুলো প্রায় ভেসে গেল। কত যে গাছগাছালি আর ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। সেই প্রচণ্ড ঝড় আর জলপ্লাবন উপেক্ষা করে গোয়ালে গরুর বাঁধন খুলে দিতে গিয়েছিলেন কুমুর মা। খুলেও দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে বন্যার প্রবল একটা ঢেউ খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই অবলা জীবটার সঙ্গে কুমুর মাকেও।

চাপা একটা কষ্টের আওয়াজ বেরিয়ে এল সংগীতার মুখ থেকে।

বললাম, কুমুর মুখেই শুনেছি, ঐ প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়ে কুমুর বাবা ওর মাকে উঠোন পেরিয়ে গোয়ালের দিকে যেতে দিতে চাননি। কিন্তু কুমুর মা নাকি বলেছিলেন, মঙ্গলী কুমুর বয়সী। তোমার মেয়ে যদি এ দুর্যোগে গোয়ালঘরে থাকত তাহলে তুমি কি তাকে একা সেখানে ফেলে থাকতে পারতে?

হৃদয় আর জেদ, দুটোই ছিল কুমুর মায়ের ভেতর। তিনি মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্বামীর বারণ না শুনে।

সংগীতা বলল, নমস্য মহিলা। ওঁর কথা শুনলে অভিভূত হতে হয়, মাথা আপনি নুয়ে আসে।

মা মারা যাবার পর কুমুর বাবা বড় অসহায় হয়ে পড়লেন। বেশি কথাবার্তা বলতেন না। কুমু কিশোরী থেকে তরুণী হলো। ওর বাবার জানাশোনা বয়স্ক এক টোলের শিক্ষক ওকে সংস্কৃত পড়াতে আসতেন। হঠাৎ বাবা মারা যাবার পর ঐ পণ্ডিতমশায় কুমুর রক্ষক হন। শেষে কুমুকে বিয়েও করে ফেলেন।

কুমুর এতে সম্মতি ছিল?

আমার মনে হয় সে সময় কুমুর সম্মতি অসম্মতির প্রশ্ন ছিল না, আত্ম-রক্ষার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সংগীতা। ছইএর ভেতর আলোছায়ার লীলায় ওর ভাবান্তর ধরা পড়ল না।

একসময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সংগে ওদের পরিচয় হলো কি করে ?

মামার বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে আসার পথে এই খেয়াঘাট পেরুতে হতো। সেই সূত্রে কুমু আর তার বাবার সংগে আলাপ। মানুষটি আমাকে বড় স্নেহ করতেন। ওঁর বাড়িতে থেকেছি খেয়েছি একাধিক দিন। ঝিলের ধারে আমার বেড়াতে খুব ভাল লাগত। একদিন কুমু আর আমি ঐ ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক সূর্যাস্ত দেখেছিলাম।

সংগীতা অমনি বলে উঠল, সে কিরকম সূর্যাস্ত আমাকে একটু বলবে না ?

তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। কোমল হলুদ একটা আলো এসে পড়েছিল তরুণ তালগাছের সাদাটে সবুজ কচি পাতায়। তালের পাতাগুলো যেন পেখম মেলে দাঁড়িয়েছিল। তারই ফাঁক দিয়ে সুবর্ণ পালকের মতো পড়ন্ত রোদ ছুটে এসে ছুঁয়ে গেল আমাদের দুজনকে। ঐ রোদের ছোঁয়ায় একজন তরুণী যে এমন মনোরম হয়ে উঠতে পারে তা আগে কখনো ভাবিনি। আমি কুমুকে দেখছিলাম, ওর চোখ কিন্তু ছিল ওপারে।

হঠাৎ ও কিশোরী কন্যার মতো চেঁচিয়ে উঠল, দেখ রঞ্জনদা, কি চমৎকার রামধনু উঠেছে।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেদিন রূপের দেবতার অপরূপ ছবি দেখেছিলাম।

সংগীতা বলল, কুমুর কি ভাগ্য ! সেই আশ্চর্য মুহূর্তে যখন দেবলোকের দ্বার খুলে গিয়েছিল তখন কুমু ছিল তোমার পাশে।

বললাম, সংগীতা, ঈশ্বর কখন যে কাকে কার পাশে দাঁড় করিয়ে দেন আবার সরিয়ে নেন তা আমাদের বোধবুদ্ধির অগম্য।

নৌকোটা পারঘাটে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ থেমে গেল। আমরা ছইএর ভেতর গল্প করছিলাম, তাই লক্ষ্য করিনি। মনে হলো, একটা কূলে ভিড়েছে নৌকোটা। তাকিয়ে দেখি সত্যি তাই।

ততক্ষণে নেমে পড়েছে দীনু মাঝি। একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ছই থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, একটা সরু খালের জল ভাটার টানে বেরিয়ে আসছে তোড়ে। তারই মুখে জাল ঘিরে বসে আছে একটা জেলে নৌকো।

দীনু কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কাটিয়ে যখন ফিরে এল তখন দেখলাম ও গামছায় বেঁধে এনেছে এক পুঁটলী মাছ। নৌকোয় ফেলে দিতে দেখলাম, বেশ বড় সাইজের কয়েকটা খরসুলা মাছ। নোনা জলের মাছ, খেতে ভারী সুস্বাদু।

বললাম, দীনু, আজ রাতের খাবারটা জমবে ভাল।

এজ্ঞে সবই তেনার ইচ্ছে।

দীনু মনে হয় ঈশ্বরে সমর্পিত প্রাণ।

মিনিট কয়েকের ভেতরেই আমরা পারঘাটে এসে পৌঁছলাম। নৌকো নোঙর করে দীনু আর কালাচাঁদ একটা তক্তা ফেলে দিলে শুকনো ডাঙার সঙ্গে নৌকোর সেতুবন্ধন করতে। তখনও নদীতে শুরু হয়নি খর ভাটার টান।

কুন ভয় নেই মা ঠাকরুণ, সন্তানের হাতটা ধরুন।

দীনু কেবল ঈশ্বরানুরাগীই নয়, শুদ্ধ ভাষার প্রতি তার অনুরাগ লক্ষ্য করে পুলকিত হলাম।

আমরা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে ডাঙায় উঠলাম।

প্রথমেই আমার চোখ গিয়ে পড়ল তালপাতায় ছাওয়া জলসত্রটির ওপর। মা মারা যাওয়ার পরে তৃষ্ণার্ত পারার্থীদের জলদানের কাজটি কুমুই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। শেষবারে যখন এদিক দিয়ে পার হই তখন কুমুই আমাকে বিদায় দিয়েছিল এই জলসত্রের পাশে এসে। বলেছিল, রঞ্জনদা, তোমার হাত ধরে এ জীবনে আর কোনোদিনও আমার রামধনু দেখা হবে না।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কুমুর দীর্ঘশ্বাস ভরা ঐ কথাগুলো এতদিন পরেও বুকে এসে হাহাকারের মতো বেজে উঠল। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত দিগন্তছোঁয়া চরকে কুমুর চোখের জলে ধোয়া বলে মনে হতে লাগল।

কি ভাবছ?

সংগীতার কথায় চমকে ফিরে তাকালাম। বললাম, ভাবছিলাম কুমুদিনীর কথা। আজ মনে হচ্ছে, এই মেয়েটিই নিজের অজান্তে আমার রোমাণ্টিক জগতের দরজাটা খুলে দিয়েছিল। আমার মনের কল্পনার জগতকে করেছিল সীমাহীন। তুমি ঠিকই বলেছ সংগীতা, সেই রামধনুর পথ দিয়ে এক দেবলোকের দ্বার খুলে গিয়েছিল আমার চোখের সামনে। কিন্তু কুমুর জীবনে সে দ্বার হয়ত চিরকালের জন্য বন্ধই রইল।

ভাবাবেগে একটানা অনেকগুলো অন্তরের কথা বেরিয়ে এল। লজ্জিত হলাম, বললাম, কথাগুলো অবচেতন থেকে সরাসরি বেরিয়ে এল। কিছু মনে করলে না তো সংগীতা?

সংগীতা আমার হাত দুটি নিবিড় করে ধরে বলল, যে নারীর পাশে দাঁড়িয়ে তোমার রোমাণ্টিক জগতের দরজাটা উন্মুক্ত হয়েছিল, সেই কুমুদিনী ছাড়া আমাদের হনিমুন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। চল তোমার কুমুর ওখান থেকে ঘুরে আসি।

তারপর সংগীতা আবার কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল, একটু নৌকো থেকে ঘুরে আসছি।

দীনুর সাহায্যে ও নৌকোয় নামল, আবার কিছুক্ষণের ভেতরেই ওপরে উঠে এল।

দীনু আর কালাচাঁদ রান্নার তোড়জোড় করতে লাগল। আমি সংগীতাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললাম কুমুর আস্তানার দিকে।

হাতে ওটা কি?

সঙ্গীতা উত্তর দিল, শাড়ি।

কি করবে শাড়ি নিয়ে ?

একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, শুধু হাতে কি যাওয়া যায়। নতুন শাড়িখানা ভাগ্যিস সঙ্গে ছিল।

সঙ্গীতার বিবেচনায় মনে মনে খুশিই হলাম।

খালের ওপর একটা বাঁশের সাঁকো। সঙ্গীতা পা তুলতেই বাঁশগুলো নড়ে উঠে শব্দ করল। সে থেমে গেল দেখে আমি ওকে সাহস দেবার জন্য একবার স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলাম।

আমার হাত ধরে চলে এসো, কোনো ভয় নেই।

আমাকে একা পেরুতে দাও, তাতেই আমার সোয়াস্তি।

বেশ, নির্ভয়ে একাই চলে যাও।

ওপারে যখন এসে পেঁছিলাম তখন সঙ্গীতা বলল, হাত ধরার বিপদ হলো সব কাজে নির্ভরতা। তুমি আমার পাশে আছ, এই বোধটুকুই আমাকে সাহস দিক, আর কিছু আমি চাই না।

কথাটা বলেই কিন্তু ও আমার হাতটা মুঠো করে ধরে আমার মুখের দিকে তাকাল। একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে ওর মুখে।

কি হলো আবার ?

সঙ্গীতা বলল, ধরি আর না ধরি, এ হাতখানা যে আমার সে অধিকারটুকু জানিয়ে দিচ্ছি।

আমরা কথায় কথায় কুমুর বাড়ির সামনে এসে পেঁছিলাম। সদর বন্ধ। ভেতরে একটা আলো জ্বলছে, তার ক্ষীণ রশ্মি আধ ভেজান জানালার ফাঁকে এসে পড়েছে।

সঙ্গীতাকে বললাম, তুমি ঐ বাতাবিলেবু গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও।

সঙ্গীতা আড়ালে চলে যেতেই আমি দাওয়ায় উঠে দরজায় ঘা দিলাম। দু-তিন বার ধাক্কা দেবার পর জানালা দিয়ে কথা ভেসে এল, কে ?

কুমুর গলা পেয়ে বুঝলাম, আজ ওর স্বামী বাড়ি নেই। অবশ্য আমি যতটুকু শুনে গিয়েছিলাম তাতে শনি আর রোববার ছাড়া কুমুর স্বামীর এ বাড়িতে থাকার কথা নয়।

বললাম, নির্ভয়ে দরজাটা খোল, আমি নিশিকুটুম্ব নই।

রঞ্জনদা ! একটা তীব্র আনন্দের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল ঘর থেকে বাইরে।

আমার মনে হলো ঐ ডাক ঝিলের বুকে আনন্দের তরঙ্গ তুলে দিগন্তে মায়াময় কোনো ময়ূরীর মেলে দেওয়া কলাপকে স্পর্শ করল।

দরজা খুলে গেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কুমু। কনকচাঁপার মতো আঙুলে ঢেকে রেখেছে মুখ।

হাত খুলে মুখ ফিরিয়ে নেবার সময় এক ঝলকে দেখলাম, আবেগ আর আনন্দের অশ্রুতে চোখ দুটি ভরা।

আঁচলে মুখ মুছে ও এগিয়ে এসে আমার হাত ধরল, আসতে পারলে ?

হঠাৎ আমার মনে পড়ল সঙ্গীতার কথা। একটু আগে এই হাত দুখানার ওপর সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছে।

বললাম, যতদিন পরেই আসি না কেন, তোমাকে যে ভুলতে পারিনি সে কথা কি এই মুহূর্তে প্রমাণ হয়ে যায়নি!

ও হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ কুমুর মাথায় কি খেলে গেল। ও বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থাক তুমি, আমার ছোট কদম গাছটাতে একটি মাত্র ফুল ফুটেছে। ওটা তোমার হাতে দিয়ে তবে অতিথি বরণ করব।

ভারী ভাবুক মেয়ে কুমু। ও পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি সেই অবসরে সঙ্গীতাকে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলাম দরজার সামনে। বললাম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাগলীর কাণ্ড দেখ। আমি এবার আড়ালে রইলাম।

আড়াল থেকে সবই দেখা যাচ্ছে। দুটি সবুজ পাতার ফাঁকে একটি বিকশিত কদম্ব নিয়ে বেরিয়ে আসছিল কুমু, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

এত বিস্মিত বুঝি জীবনে কোনদিন হয়নি কুমুদিনী। জ্যোৎস্নার কুমুদ চেয়ে চেয়ে দেখছে প্রভাতের কমলিকাকে। একের মুখে হাসি, অন্যের চোখে বিস্ময়।

বুদ্ধিমতী কুমুর ব্যাপারটা বুঝে নিতে বেশি বিলম্ব হলো না। বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই সে সঙ্গীতাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। নিবিড় বাঁধনে দুজনে বাঁধা পড়ল কতক্ষণ।

বাঁধন খুলে কুমু বলল, রঞ্জনদা পালাল কোথায়? তার এমন সুন্দর পছন্দের জন্য আমি তাকে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলটি পুরস্কার দেব।

সঙ্গীতা বলল, তার আগে আমার সামান্য একটা উপহার তোমাকে নিতে হবে।

কাঁধে ঝোলান একটা ব্যাগের ভেতর থেকে সোনালী ডুরেকাটা নীল একখানা শাড়ি বের করে কুমুর হাতে তুলে দিল সঙ্গীতা।

কুমুর প্রতিবাদ, এ আবার কেন?

সঙ্গীতা অমনি বলল, তোমাকে এটা পরিয়ে দেখব শ্রীরাধার মতো সুন্দর দেখায় কিনা।

কথা ঘোরাল কুমু, গেল কোথায় তোমার মানুষটি? এসো না রঞ্জনদা।

অগত্যা রঙ্গমঞ্চে হাজির হতে হলো। ফুলের উপহার পেলাম। কুমু সঙ্গীতাকে পরম আদরে আগলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

নিজের শয্যাটির ওপর আমাদের পাশাপাশি বসাল কুমু। অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে বলল, দেখছি কেমন মানিয়েছে।

হঠাৎ কুমু চঞ্চল হয়ে পড়ল। সে রাতের আহারের ব্যবস্থা করতে ঢুকছিল রান্নাঘরে, সঙ্গীতা তার উদ্দেশ্য বুঝে হাত ধরে আটকাল।

আজ তোমার অরন্ধন, তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে।

তার মানে!—কুমুর চোখে-মুখে একরাশ বিস্ময়।

বললাম, শুধু তোমাকে দেখব বলে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। মাঝি ডাঙায় উঠেই রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। ধরেই নাও না আজ আমাদের সকলের চড়ুইভাতি ওখানে।

কুমু ঝট করে আমার হাত দুটো টেনে ধরে বলল, দয়া করে ওঠ রঞ্জনদা, কৃপা করে যে এটুকু এসেছ, এজন্যে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। রাত হলো, তোমাদের আর আটকে রাখব না।

বুঝলাম, ক্রোধের তাপের চেয়ে অভিমানের তাপ অনেক বেশি।

সঙ্গীতা পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল। বলল, আজ আমার কত আনন্দের রাত! এ রাতে তুমি দুঃখ পেলে সে দুঃখ রাখার ঠাঁই আমার থাকবে না। এসো, দু-বোনে মিলে রান্না চাপাই।

যেমন অল্পেতেই অভিমানে ফুঁসে উঠেছিল কুমু তেমনি সঙ্গীতার কথায় অতি সহজেই শান্ত হয়ে গেল।

অনেক রাত, কিন্তু কারুরই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যে কয়েকটা মুহূর্ত কাছে পেয়েছি পরস্পরকে, পরমধন প্রাপ্তির মতো তাকে নিবিড় করে আগলে ধরে থাকতে হবে।

রান্নাঘর থেকে একসময় বেরিয়ে এসে সঙ্গীতা বলল, মাঝিদের বলে এসো আমাদের চাল যেন তারা না নেয়। আর কয়েকখানা মাছের টুকরো এনো এখানকার জন্যে। শৈল ওখানেই খেয়ে নিক।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতার নির্দেশ পালিত হলো।

বেশ খানিক রাত করে আমরা একসঙ্গে খেতে বসলাম। ওরা দুজনে পরস্পরের পাতে মাছ দেয়ানেয়া করল। হাসি-ঠাট্টা আনন্দ-গানে আসর সরগরম।

রাত কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝতেই পারছি না। হঠাৎ মনে হলো পানুদার কথা। যে বুড়ো মানুষটি থাকত কুমুর কাছে।

বললাম, পানুদার খবর কি কুমু?

কুমু বলল, না বাঁচার মতো বেঁচে আছে। চোখে একেবারে দেখে না, কানের অবস্থাও তথৈবচ। হাঁটাচলা নেই বললেও চলে।

দেশে ছেলেপুলেদের কাছেই রয়েছে তো?

ওর ত্রিভুবনে কেউ নেই রঞ্জনদা। ও যাবে কোথায়, আমার কাছেই রয়েছে।

এখানে রয়েছে পানুদা! একবারও তার সাড়া পেলাম না।

সন্ধ্যে হতে না হতেই দুটি খাইয়ে বিছানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

সঙ্গীতা বলল, তোমার সাহায্যের কোনো লোক নেই?

নিজের সংসারের কাজ নিজেই করি। তার ওপর পানুদার পুরোপুরি সেবার ভার।

বললাম, এ সমস্যা সমাধানের আর কি কোনো পথ নেই কুমু?

একমাত্র ঈশ্বর যদি ওকে কৃপা করেন তাহলে ও বেঁচে যায়। কিন্তু ওকে ছাড়া আমি কি করে বাঁচি রঞ্জনদা! তবু মানুষটাকে নাড়াচাড়া করে আমার

সময় কেটে যায়। ও চলে গেলে তো চারদিকে ধূধূ শ্মশান। সেই সপ্তাহের শেষ দিনটিতে তোমাদের পণ্ডিতমশায় আসবেন কর্তব্য সারতে, আবার ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়বেন সপ্তাহের প্রথম দিনে। আমার নিঃসংগতা কাটে কি করে বলতে পার?

বললাম, সেরকম অবস্থা বুঝলে মদনমোহনবাবু হয়ত কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

কুমু বলল, কর্তব্যপালন যে এত হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর হতে পারে সেটা তোমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের সংগে বিয়ে না হলে জানতে পারতাম না। তাই ও প্রসংগ তুলে কেন আর আমার দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাও রঞ্জনদা। এই যে তুমি তোমার নতুন বউটিকে নিয়ে এক জ্যোৎস্নাভরা রাতে আমার এখানে এলে, তারপর যখন চলে যাবে তখন মনে হবে, স্বপ্ন দেখেছিলাম। বারবার ভাবব, সত্যি! বারবার সে সত্য মুছে গিয়ে মনে হবে নিছক স্বপ্ন। পানুদার যদি মানুষের মতো সামান্য বোধবুদ্ধিও থাকত তাহলে তাকে বারবার জিজ্ঞেস করে সত্যটাকে ধরে রাখতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি অদ্ভুত একটা মায়ার জগতে বাস করছি। এই জ্যোৎস্না-ধোয়া রাত, এই বয়ে চলা নদী, থৈথৈ জলে ভরা ঝিল, ধূধূ চর, সবকিছু আমার কাছে অলৌকিক জগৎ বলে মনে হয়। আমি নিশি পাওয়ার মতো একা একা ঘুরে বেড়াই। অনেক সময় আমার মনে হয়, আমি এ জগতের কেউ নয়। সেই ভাবনাটা যখন আমার ভেতর ঢুকতে থাকে তখন আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে যাই। ভাবি, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি! তখন বিশ্বাস কর রঞ্জনদা, আমি একটা মানুষ দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠি। নদীতে একটা নৌকো ভেসে গেলেই হাঁক দিয়ে বলি, কোন ঘাটের নৌকো মাঝি!

ওরা কেউ উত্তর দিলে আমি আশ্বস্ত হয়ে ভাবি, আমি মানুষ, কোনো অলৌকিক জগতের জীব নয়।

বেশ কিছু সময় একটানা কথা বলে ও চুপ করে গেল। আমরা ওর কথা শুনছিলাম আর আমাদের বুক ওর নিঃসঙ্গতার ব্যথায় টনটন করে উঠছিল। কুমুর এই পরিণতির জন্য হঠাৎ নিজেকেই যেন দায়ী মনে হলো।

মনে হলো, এখানে না এলেই বুঝি ভাল ছিল। যখন ফিরে যাব তখন আমার দিন আমার রাত্রি এই অসহায় নিঃসঙ্গ মেয়েটির চিন্তায় বিবর্ণ হয়ে উঠবে।

শেষ রাতের জোয়ারে নৌকো ছেড়ে দিল। খেয়াঘাট অব্দি আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল কুমু। অনেক দূরে গিয়েও ওর লালপাড় সাদা কাপড়ের আঁচলটাকে পুব হাওয়ার দমকে উড়তে দেখেছিলাম। আমি ভাবতে চাইছিলাম না তবু একটা ছবি বারবার আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছিল, কুমু শ্বেতপরী হয়ে গেছে। সে জ্যোৎস্নার জলে ভাসতে ভাসতে আকাশের নীলে মিশে যাচ্ছে।

ভারি মিষ্টি মেয়ে শৈল। মুখখানি যেমন সুন্দর হাসিটিও তেমনি।

চোদ্দ বছরে পড়ে ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছে। সারাক্ষণ টুকিটাকি ফরমাস খাটছে সঙ্গীতার। হলদে বনি, কুঁচবক, গোখুটে, সাতভায়া, গাঙচিল চেনাচ্ছে নতুন বউকে।

চড়বড়িয়ে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, এখন চারদিক রোদ-ঝলমল।

শৈল গাঙতাড়া আর ভুমরো মাছের তফাৎটা বুঝে নিচ্ছে কালাচাঁদদার কাছ থেকে।

আমাকে ফিসফিসিয়ে বলল সঙ্গীতা, কালাচাঁদ ছেলেটি কিন্তু বেশ। শৈলের সঙ্গে মানাবে ভাল।

বললাম, হানিমুনের মধু আর পরের চরকায় খরচ না করে নিজেদের জন্য রাখ না, তাহলে তো আমার একটু বাড়তি লাভ হয়।

কিছুটা অপ্রস্তুতে আর কিছুটা লজ্জায় পড়ে সঙ্গীতা শুধু বলে উঠল—ধ্যাৎ।

কালাচাঁদ হাল্‌কা চালে দাঁড় টানছে। জোয়ার ঠেলে নিয়ে চলেছে নৌকো। দীনু হালে হাত লাগিয়ে বসে আছে স্থির হয়ে।

দীনুর দিকে চেয়ে বললাম, তোমরা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করেছ তো? আমরা একেবারে নজর দিতে পারিনি।

দীনু বলল, ওসব কিছু ভাববেননি ছোটবাবু। খুব খেইছি আমরা। কত তরকারিপাতি এনিছিলেন বাড়ি থেকে, সে সব কি খেয়ে তুলতে পারি। ঐ যে কচি লক্ষ্মীঠাক্‌রুনটি, নিজ হাতে সব রান্না করিছে। কি হাতের রন্ধন, চেয়ে চেয়ে খাইছি। দুজনার ভাত একা খাইছে কালাচাঁদ। চাঁছিপুঁছি ব্যঞ্জন খাইছে। যত বলি, মা ঠাক্‌রুনের জন্যে রাখ ব্যাটা। কালাচাঁদ বলে, অত ভাল রন্ধন করলি থাকবে কি করি! কালাচাঁদের কথা শুনি মা লক্ষ্মীর সে কি হাসি!

সুযোগ বুঝে বললাম, তোমার কটি ছেলেমেয়ে দীনু?

সঙ্গে সঙ্গে দীনু মাঝির গলা ধরে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তিন বছরেরটিকে আমার কোলে ফেলি দিয়ে সতীলক্ষ্মী চোখ বুজল। ঐ কালাচাঁদই আমার সবেধন নীলমণি দাদাবাবু। কথা বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হলো দীনু।

অমনি নৌকোর মাথাটা ঘুরে গেল।

দীনু বেকুব বনে গিয়ে ছুটল হাল সামলাতে।

কালাচাঁদ চেঁচিয়ে উঠল, মাথা ঘুরল কেন বাবা?

দীনু বলল, ও কিছু না, একটু ঝিমুনি আসছিল, তুই টানি যা।

কালাচাঁদ হেসে বলে, রাতে নৌকা বাইব বলি কাল সারা দুপোর ঘুমাইল, সুনিয়ার গাঙচরে নাক ডাকল দুঘড়ি, আর কত ঘুমাইব বাবা?

শৈল অমনি দীনুর পক্ষ নেয়, যত বল কালাচাঁদদা, রাতে ঘুম না হলে দিনের বেলা ঢুলুনি আসবেই।

দীনু অমনি সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, কও তো মা।

সঙ্গীতার চোখ গিয়ে পড়ল দূরে একটা ঝিলের ওপর। ঝিলের পাড় ঘিরে বড় বড় গাছ। গাছের ফাঁক দিয়ে খানিক দূরে একসারি কোঠাবাড়ির টুকরো টুকরো ছবি দেখা যাচ্ছিল।

সঙ্গীতা সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি বললাম, আরে, আমরা তো প্রায় আমাদের চকবাড়ির কাছাকাছি এসেই গিয়েছি। ঐ ঝিল আর বাড়িগুলো আমার মেজ পিসিমাদের।

সঙ্গীতা বলল, এই ধূধূ নদীচরের মাঝখানে এমন একখানা সম্পন্ন সুন্দর বসতবাড়ির কথা ভাবাই যায় না।

বললাম, ঠাকুমা বেশির ভাগ সময় চকেই থাকতেন, তাই তাঁর মেজ মেয়েটিকে কাছেপিঠে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কি নাম পিসিমার ?

চিন্ময়ী। সব কটি পিসিই শ্রীময়ী। হিরণ্ময়ী, চিন্ময়ী, মৃণ্ময়ী, জ্যোতির্ময়ী।

সঙ্গীতা অমনি জানতে চাইল, তুমি যে বলেছিলে তোমার এক পিসির বিয়েতে বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি অব্দি কয়েক মাইল রাস্তা জুড়ে রাতের বেলা রোশনাই-এর আয়োজন করা হয়েছিল, সে কি এই পিসিমার বিয়েতে ?

না তিনি আমার মেজ ঠাকুর্দার মেয়ে। তবে মেজ পিসিমার বাড়ির দুটি ঘটনা মনে রাখার মতো। শুনেছি, আষাঢ়ে বিয়ের আয়োজন হয়েছে। শ' দেড়েক বরযাত্রী এসেছে। মেঠো পথ পেরিয়ে এসেছে কিন্তু একটি জুতোতেও কাদার ছিটেফোঁটা লাগেনি। ছোট পিসি যেমন হাসিখুশি তেমনি রগুড়ে। বরযাত্রীদের একাই মাতিয়ে রেখেছে। বর-কনে পালকিতে রওনা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বরযাত্রীরাও উঠে পড়েছে। কিন্তু জুতো কই ! দেড়শ জোড়া জুতো হাওয়া ! কেই-বা সোনাদানা, মণ্ডামেঠাই ফেলে জুতো চুরি করতে যাবে ! আর তাছাড়া জঙ্গল, জবালপাই জায়গায় চাষাভুষো বাগ্‌দীরা জুতো পরে না। তাহলে এত জুতো গেল কোথায় ? সবাই খুঁজতে লেগে গেল কিন্তু একটিও জুতোর টিকির দেখা পাওয়া গেল না। এত হাসিখুশি ছোট পিসি, তার মুখখানাও চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে।

পাদুকার শোকচ্ছায়ায় সকলেই বিবর্ণ বিষণ্ণ। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বরযাত্রীই আক্ষেপ করে বলতে লাগল, বিবাহ উপলক্ষে দূর শহর থেকে বহু-মূল্যে জুতো জোড়াগুলি ক্রয় করা হয়েছে।

কি আর করা যায়, আনন্দযাত্রা সন্তাপযাত্রায় পরিণত হলো।

হঠাৎ ফুড়ুৎ করে কোথা থেকে উড়ে এলেন এক পুরুতমশাই। তিনি নাকি খড়ি পেতে হাওয়া হয়ে যাওয়া মানুষ থেকে ছুঁচ অব্দির হদিস দিতে পারেন।

যাত্রাবিরতি ঘটল। সবাই উঠোনে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে পুরুতমশায়ের অংককষা দেখল। আশা-নিরাশার দোলায় তখন দুলছে দেড়শোটি বরযাত্রীর ভগ্নহৃদয়।

স্লেটের ওপর অনেক সময় খড়ি চালনার পর পুরুতমশায়ের শ্রীমুখ দিয়ে বাণী বেরুল, যে কোনোভাবেই হোক, অসম্মান করা হয়েছে পাদুকার, তাই এ অন্তর্ধান। গৃহে ফিরে পাদুকা পুজা করুন তাহলে অবশ্যই অভীষ্ট ফললাভ হবে।

অনেকের মনে হয়েছিল জ্যোতিষী গাঁজায় দম দিয়ে বলছে, কিন্তু সাহস করে মনের কথা কেউ কাউকে বলতে পারছিল না।

বরযাত্রীরা ফিরে গিয়ে বরের বাড়িতেই জুতোর পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে একটুকরো চিঠি, ছোট পিসির লেখা।

মাননীয় মহাশয়গণ,

পাদুকা যুগল পদে পরিধানেরই জন্য। আপনারা কর্দম ও ধুলার ভয়ে সেই পাদুকা স্বহস্তে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। পাদুকা বহন করিতে অবশ্যই আপনাদের কষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছে। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় বরযাত্রীরা যাহাতে সেই অসুবিধায় পুনরায় না পড়েন কন্যাপক্ষের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাই সমস্ত পাদুকা পাত্রের বাড়িতে দুইজন মুটের মাথায় চাপাইয়া পাঠাইলাম। গনিয়া লইবেন।

পুনশ্চঃ পাদুকা কেবলমাত্র তখনই হস্তে ধারণ করা যায় যখন অন্যের পৃষ্ঠদেশ সিধে করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিনীতা
জ্যোতির্ময়ী

বলা বাহুল্য, পুরুতমশাইকে ছোট পিসিই শিখিয়ে পড়িয়ে গণকঠাকুর সাজিয়ে এনেছিল।

অন্য একটি ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা। আমি তখন আট-ন বছরের বালকমাত্র। পিসিমার বাড়ি কালীপুজো উপলক্ষ্যে যাই। প্রতি বছরই মহা ধুমধামে ঐ ঝিলের পাড়ে কালীপুজো হয়। চারদিক ঘেরাও করে সামিয়ানা টাঙিয়ে ডে-লাইট, পাঁচ-লাইট ঝুলিয়ে সে কি সমারোহ! নিচে জ্বলে সারি সারি গ্যাস লাইট। দুদিকে ঝিলের পাড় আর মাঠ জুড়ে বসে যায় বিরাট মেলা। অন্য একদিকে পিসেমশায় আসর জমিয়ে বসেন। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, স্কুলের শিক্ষক, বাড়ির ও নিমন্ত্রিত মেয়েরা যে যার নির্দিষ্ট স্থানে ঘেরা জায়গার ভেতর আশ্রয় নেন। ঐদিকেই থাকে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির। শেষ যেদিকটি রইল সেদিকেই মহাকালীর আসন পাতা। আর সেই নৃমুণ্ডমালিনীর সামনে সারা পাড় জুড়ে সারি সারি যূপকাষ্ঠ। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মানসিক বলির জন্য ভক্তেরা নিয়ে আসত পাঁঠা। সারা রাত ধরে দেবীর উদ্দেশ্যে সেই পাঁঠা বলিদান করা হতো। সে কি দশ-বিশটা পাঁঠা! প্রায় চার হাজার ছাড়িয়ে যেত।

একবার আমাকে কেউ হাত ধরে ঐ বলির স্থানে নিয়ে যায়। আমি মুহুর্মুহু খড়্গের ওঠা পড়া, রক্তের প্রবাহ দেখে আর অসহায় জীবগুলোর আর্ত চীৎকার শুনে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। চৈতন্য ফিরে এলে দেখি আমি

মেলার কম্পাউণ্ডের বাইরে খোলা হাওয়ায় একটা বেঞ্চের ওপর শুয়ে আছি। ছোট কাকা আমার পায়ের কাছে বসে।

আমাকে উঠে বসতে দেখে ছোট কাকা বলল, কেমন লাগছে রে?

মাথা নেড়ে বললাম, ভাল।

কাকা বলল, এখানে বসেই বাজি পোড়ান দেখব। মেলার গুঁতোগুঁতির ভেতর দাঁড়িয়ে দেখার চেয়ে এ অনেক ভাল হলো। ভাগ্যিস তুই তাল বুঝে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি, তাই এই বাড়তি সুযোগটা পেয়ে গেলাম।

আমার ছোট পিসির মতো ছোট কাকাও খুব রগুড়ে ছিল।

কলকাতা থেকে সেরা সব বাজি আনা হ'তো। কতরকম যে বাজি তার ইয়ত্তা নেই! আলোর ফুলে ভরে যেত আকাশ আর মাটি। কতরকমের রঙমশলা, চরকি, তুবড়ি, বোমা, পটকা, হাউই!

দেখার মতো কটা হাউই উঠল। একটাতে 'ওয়েলকাম' লেখা। অন্যটায়, দুলতে দুলতে আঁকাশপথে চলেছে ফুলের মালা।

সবশেষে বিলিতি ব্যাণ্ড বেজে উঠত। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়া হতো শেষ হাউই। পাশাপাশি কিং পঞ্চম জর্জ আর কুউন মেরি বসে আছেন মেলার ঠিক ওপরের আকাশে।

কিন্তু দীর্ঘদিনের এই মেলা শেষ হয়ে গেল একদিন।

সেবার পুজোর দুদিন আগেই গেছি পিসিমাদের বাড়ি। সারাবাড়ির আনাচে-কানাচে খাঁচা ঝুলছে। রঙবেরঙের কত যে পাখি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কাকাতুয়া দেখলাম, দু-তিন রকম রঙের। ময়না, চন্দনা, টিয়েতে জমজমাট। সবাই কথা বলছে। কেউ বলছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা। আবার কেউ বলছে, আসুন, আসুন। একজন তো বলেই বসল, শালা ঢুলছিস্?

এই শেষোক্ত পাখিটি কাছারিবাড়ির বারান্দায় থাকে। পিসেমশায় দ্বিপ্রহরের নিদ্রা যান ঐ বাড়িতে। দুটি বালক ভৃত্য পালাক্রমে পিসেমশায়ের অঙ্গসংবাহন করে। তাদের কেউ ঢুলছে টের পেলেই পিসেমশায় ঐ উক্তিটি করেন। পাখিটি নিখুঁতভাবে সেটিকে কণ্ঠে তুলে নিয়েছে। কোনো কোনো সময় পিসেমশায় হয়ত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন আর ভৃত্যটি তার কাজে ঢিলে দিয়েছে, অমনি ভেসে এল আওয়াজ, শালা ঢুলছিস?

ভৃত্যটি গম্ভীর গলার শব্দ শুনে প্রথমটা চমকে উঠবে, তারপর বিহঙ্গটির বাঁদরামো বুঝতে পেরে ভেংচি কাটবে। এসব ছবি সেই বালক বয়সে আমার চোখে দেখা।

সঙ্গীতা বলল, ঐ কালীর মেলাটি বন্ধ হয়ে গেল কি করে বললে না তো?

সেবার সবে মেলা শুরু হয়েছে। সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে মেলার আলো। একদিকে জড়ো করে রাখা হয়েছে বলির পাঁঠাগুলোকে। পুরোহিত দেবীকে জাগ্রত করার জন্য সবে শুরু করেছেন মন্ত্রপাঠ। হঠাৎ বাইরে একটা হল্লা শোনা গেল। মনে হলো যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমরা পিসেমশায়দের বসার জন্য ঘেরা জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলাম।

দেখলাম, ঝিলের ওপারের জ্বলন্ত লাইটগুলোকে ডান্ডা মেরে কারা যেন ভেঙে ফেলছে। কয়েক মিনিটের ভেতরেই অন্ধকার হয়ে গেল ওদিকটা। এবার দুদ্দাড় করে এদিকে ছুটে আসছে দেখে কে যেন হেঁকে উঠল, বন্দুক দুটো ছুটে গিয়ে নিয়ে আয়।

পিসেমশায়ের গলা শোনা গেল, না না, ওরা ডাকাত নয়, বন্দুকবাজি করতে যেও না।

ওরা এদিকের আলোগুলো না ভেঙে ছুটল মা কালীর আস্তানার দিকে। কুড়ি-পঁচিশখানা হাঁড়িকাঠ উপড়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। তারপর রক্তপানের আগেই দেবী প্রতিমাটিকে শূন্যে তুলে ঝিলের জলে সশব্দে দিলে বিসর্জন।

ফেরার পথে আলোগুলো ভাঙতে লাগল। কেবল জ্বলে রইল পিসে-মশায়ের মাথার ওপরের ডে-লাইটটা।

আমি তখন ছোট কাকাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপছি। দলের সর্দারের গলা শোনা গেল, এর পরের বছর যদি দেবীর সামনে একটাও পাঁঠা বলি হয় তাহলে পুজোর উদ্যোক্তাদের সব কটাকে হাঁড়িকাঠে পুরে বলি দেব।

বলার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আলোটাকে ভেঙে দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল রহস্যময় বিদ্যুৎবাহিনী। অল্পসময়ের ভেতরেই শূন্য হয়ে গেল মেলার প্রাঙ্গণ। কেবল অন্ধকারের ভেতর থেকে শোনা যেতে লাগল ইতস্তত ছড়িয়ে পড়া বলির পাঁঠাগুলোর আর্ত চীৎকার।

আমি থামলে সঙ্গীতা বলল, কারা এসেছিল জানতে পারনি?

বললাম, আমি তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, তাই ওসব কৌতূহল আমার ছিল না তবে কালীপুজোর ঐ ভয়াবহ রক্তপ্রবাহ বন্ধ করার জন্য সেই রহস্যময় বিদ্যুৎবাহিনীকে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতাম।

মেজ পিসেমশায়ের গল্প শেষ হলো আর ওঁদের গ্রামখানাও চোখের সামনে থেকে অস্পষ্ট হতে হতে মুছে গেল।

হালে বসে হাঁকল দীনু, কোশখানেক গুণটানি চল, হাত-পা ছাড়বে।

দীনু হাল নেড়ে একটা পারে নৌকো ভেড়াল।

গলুইয়ে আটকানো বাঁশের খুঁটোয় কাছির এক প্রান্ত বাঁধল কালাচাঁদ। তারপর অন্য প্রান্তটি বাঁধল আর এক খুঁটোয়। কাছিটা পড়ে রইল কাঁধের পেছনে। ঐ খুঁটোখানা বুকে আগলে ধরে এগিয়ে চলল কালাচাঁদ। তার চলার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে লাগল নৌকো।

এখন আর দাঁড় টানার আওয়াজ আসছে না। মিষ্টি কুলকুল একটা শব্দ কানে এসে লাগছে। ওদিকে কালাচাঁদ রোদ্দুরে কিছুক্ষণের ভেতরেই ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তার সারা গা চক্‌চক্‌ করছে।

সঙ্গীতাকে বললাম, দেখ, কালাচাঁদ এখন যথার্থ কালকেতু হয়ে উঠেছে। কষ্টিপাথর কুঁদে যেন নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা।

ঠিকই বলেছ তুমি, ধুলোমাটি রোদে-জলে যারা মিশে থাকে তাদের

লাবণ্যই আলাদা।

মাথায় লাল ডুরে একখানা গামছা জড়িয়েছে, হাঁটুর ওপর আধময়লা কাপড়খানা মালাকোঁচা মেরে পরা।

শৈল তাকিয়ে আছে তার কালাচাঁদদার দিকে। কিশোরীর চোখে মুগ্ধতা। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে, ও কালাচাঁদদা, সামলে চল, শেয়ালকাঁটার বন।

কালাচাঁদ হাসিমুখে হাঁক পাড়ে, তুই থাম।

হাবুলী গাছে কটা অসময়ের লাল হলুদ ফুল ফুটেছে, অমনি শৈলর আব্দার, কালাচাঁদদা, হাবুলী ফল পেড়ে দাও, লাটিম ঘোরাব।

সংগীতা আমার কাছে জানতে চাইল, হাবুলী ফলটা কি?

বললাম, ঐ যে নদীর পাড়ে লাল হলুদ ফুলওয়ালা গাছ দেখছ, ওটাতে সবুজ রঙের দুদিক চাপা গোল একরকমের ফল হয়। ঐ ফলের মাঝামাঝি একটা ছোট্ট ঝাঁটার কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোরালেই লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে।

কালাচাঁদ গাছের কাণ্ডে কাছিটা জড়িয়ে নৌকো আটকালো। গাছে উঠে কয়েকটা ফল পাড়ল। একটা ডাল নুইয়ে ফুল সমেত সরু ডাল ভাঙল। নৌকোর কাছে এসে ফুলের ডালটি দুহাতে চেপে সঙ্গীতার দিকে এগিয়ে ধরল।

সংগীতা বলল, কল্কে ফুলের মতো ফুলগুলো, ভারী চমৎকার।

নাকে গন্ধ নিতে যাচ্ছিল, বললাম, বর্ণ আছে কিন্তু গন্ধ নেই। লাল হলুদ কেবল নয়, সাদাও আছে।

কালাচাঁদ শৈলর হাতে ফল কটা তুলে দিতেই সে খুশিতে ডগমগ।

এবার কালাচাঁদ তিন লাফে উঠে গেল ডাঙায়। সে কাছি খুলে নিয়ে বাঁশের খুঁটি বুকে আগলে ধরে ঝুঁকে ঝুঁকে টানতে শুরু করল।

আবার সেই জলতরঙ্গের বাজনা বাজছে। একটা নৌকো ভাটার টানে হুস করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

দীনু বলল, বিশু ঠাকুরকে দেখলাম ছোটবাবু।

কোন বিশু ঠাকুর?

যিনি বিশু পানিগ্রাহী বলি নাম দস্তখত করেন গো।

শেরখাঁ চকের বিশ্বনাথ পানিগ্রাহী?

আজ্ঞা হাঁ, যাকে লিয়ে অনেক কোট-কাচারী হইলো।

বুঝেছি। এদিকেও বিশু ঠাকুরের গতিবিধি আছে নাকি?

দীনু বলল, সারা তল্লাট চষি বেড়াইতেছেন। জস অচল লোকদের উনিই তো যজনযাজন করছেন। তাই ডাক পড়ে বহু দূর দূর গেরাম থিকে।

সংগীতাকে বললাম, এই বিশু ঠাকুরকে নিয়ে একসময় জল অনেক দূর গড়িয়েছিল।

কিরকম?

ওর কথা জানতে গেলে আগে ভুবন পানিগ্রাহীর কথা জানতে হবে। বেশ

সম্পন্ন পরিবারের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। যৌবনেই হারিয়েছিলেন তাঁর মা-বাবাকে। অভিভাবকহীন ভুবনবাবুর বিয়ে হয়েছিল আরও সম্পন্ন বাড়ির এক মেয়ের সঙ্গে। সেই মহিলা শ্বশুরবাড়ি আসার পর জানতে পারলেন, ভুবনবাবুর একখানি বাগানবাড়ি আছে। ধনী ব্যক্তির একমাত্র সন্তান ছিলেন ভুবনবাবু। সুদর্শন পুরুষ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ। আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। পানদোষ নেই, তোষামুদে অথবা বন্ধুবান্ধবদের ভীড় নেই। গান-বাজনার প্রতি সাধারণভাবে মানুষের যতখানি আগ্রহ তার বেশী নয়। বাগানবাড়িতে মধ্যরাত অব্দি গানের আসর বসে এমন অপবাদ ভুবনবাবুর শত্রুতেও দেবে না।

ভুবনবাবু তাঁর বাগানবাড়িতে দিনের অনেকখানি সময় কাটাতেন। না, জপধ্যান কিংবা গুহ্য কোনো সাধনা করতেন না। ফলকর বৃক্ষাদি ছিল, এগুলি তাঁর পিতার আমলের। এখন পরিচর্যা ছাড়াই ফলফুল দান করছিল বৃক্ষগুলি।

সঙ্গীতা বলল, তুমি যে দেখছি 'ভুবনবাবুর বাগানবাড়ি' শিরোনামে একটি বক্তৃতাই রচনা করে ফেললে।

ঠিক তাই, এখন বল তো দেখি ভুবনবাবু মানুষটাকে তোমার কেমন মনে হচ্ছে?

ভালই তো। অনেকগুলো অপগুণ নেই, একজন আত্মকেন্দ্রিক ভদ্রলোক।

বললাম, এবার রহস্যের যবনিকা উন্মাটিত হোক। ঐ বাগানবাড়ির এক নিভৃত কুটিরে অসূর্যম্পশ্যা এক সুন্দরী বাস করত। কালেভদ্রে দেখা যেত তাকে। মাঠের পথ ধরে যে সব পথচারী যাতায়াত করত, বৃক্ষ-লতাগুল্মের ফাঁকে চকিত চমকের মতো তারা দেখতে পেত ঐ রমণীর অপরূপ অঙ্গকান্তি, আর উদ্যানবাটিকায় নিঃসঙ্গ সঞ্চরণ।

সঙ্গীতা বলল, দারুণ জমে উঠেছে তোমার গল্প।

গল্প অবিশ্বাসিনী! সেণ্ট পার্সেণ্ট সত্য কাহিনী।

সঙ্গীতা বলল, আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করছি তোমার কথা।

ভুবনেশ্বর পানিগ্রাহী ওঁর আসল নাম, সংক্ষেপে ভুবন পানিগ্রাহী। এখন ভুবনবাবু বিয়ের আগে থেকেই মহিলাটিকে বাগানবাড়িতে এনে তোলেন। কোথা থেকে এনেছেন, মহিলার কি পরিচয় তা কেউ জানে না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ভুবনেশ্বরকে এ নিয়ে কেউ ঘাটাতেও চায়নি। কেউ কেউ বলে, গঙ্গা-সাগরে গিয়ে এক দুঃস্থা স্বজন-পরিত্যক্তা বিধবাকে ভয়ংকর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান ভুবনেশ্বর। ভিন্ন প্রদেশবাসিনী সুন্দরী ঐ মহিলাটিকে সেবায় সুস্থ করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এক নিশীথে সবার দৃষ্টির অলক্ষ্যে মহিলাটিকে নাকি এনে তোলেন ঐ বাগানবাড়িতে।

সঙ্গীতা বলল, এ কথার সত্যতার কোনো সূত্র কি পাওয়া গেছে?

ভুবনবাবুর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু নাকি এ কথাগুলি কারু কারু কাছে প্রকাশ করেন।

সঙ্গীতা বলল, ভুবনেশ্বরবাবু কি নিছক দয়াপরবশ হয়ে মহিলাটিকে বাগানে আশ্রয় দিয়েছিলেন, না অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল তাঁর ?

প্রথম দিকে একজন অসহায়ার প্রতি হয়ত স্বাভাবিক করুণা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যৌবনের দুর্বার স্রোতে শেষ পর্যন্ত নিজেকে না ভাসিয়ে স্থির থাকতে পারেননি।

তার কিছু প্রমাণ আছে কি ?

প্রমাণ আছে বইকি, ঐ বিশু ঠাকুরই তো ভুবনেশ্বরের সন্তান।

তার মানে বিশ্বনাথ পানিগ্রাহীর মা ঐ রহস্যময়ী মহিলা !

মহিলা রহস্যময়ী কিনা জানি না, তবে একসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ঐ বাগানবাড়িতেই আশ্রয় নেন ভুবনবাবু। ঐ মহিলার অক্লান্ত সেবাতেই নাকি তিনি প্রাণ ফিরে পান।

সঙ্গীতা বলল, হয়ত সেই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের জন্যই মহিলার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন ও নিবিড় যোগাযোগ ঘটে।

সম্ভব, আর তার ফলেই বিশ্বনাথের জন্ম।

সঙ্গীতা উত্তেজিত হয়ে বলল, এ পর্যন্ত মেনে নিতে আমাদের কোনো বাধা নেই, কিন্তু তারপরেও উনি বিয়ে করলেন কি করে ?

শুনেছি, ওঁর মায়ের হাহুতাশ আর কান্নাকাটিতে। অবশ্য ওঁর বিয়ের আগে এ মহিলার কোনো সন্তানাদি হয়নি। ভুবনবাবুর সামাজিক বিয়ের সন্তানই আগে ভূমিষ্ঠ হয়।

সঙ্গীতা জানতে চাইল, জল অনেক দূর গড়াল বলছিলে, সেটা কি ব্যাপার ?

ভুবনবাবু মারা যাবার আগে ঐ বাগানবাড়িটি বিশ্বনাথের মায়ের নামে লিখে দিয়ে যান। কিন্তু সে মহিলা ঐ দলিলটি তিনটি মাসও নিজের কাছে রাখতে পারেননি। ভালবাসার মানুষটির দুঃখে তিনিও এ সংসার ত্যাগ করেন।

এখন বিশ্বনাথের ভূমিষ্ঠ হবার পর ভুবনবাবু খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। অসামাজিক সম্পর্কের জের না রাখার জন্য তিনি বিশ্বনাথের পদবী বদল করে রাখেন দাস। এদিকে দলিল তৈরির সময় ঐ মহিলার নাম লেখা হয় সুভদ্রা পানিগ্রাহী।

শুরু হয়ে গেল মামলা। ভুবনবাবুর সামাজিক বিয়ের সন্তান রতিকান্ত প্রমাণ করতে চাইল, দাস কখনো পানিগ্রাহীর সন্তান হতে পারে না। বিশ্বনাথকে তার বাবা এবং ঐ মহিলা অসহায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে পালন করেছিলেন মাত্র। এখন ঐ বাগানের ন্যায়সংগত অধিকারী তিনি।

বিশ্বনাথের অর্থ ছিল না মামলা চালাবার। সে যে ভুবন পানিগ্রাহী আর সুভদ্রার সন্তান, এ পরিচয় দেবার মতো যথেষ্ট প্রমাণও তার হাতে ছিল না। অগত্যা তাকে চোখের জল ফেলে বাগ[illegible] চলে যেতে হয়েছিল। এই দুর্যোগের মুহূর্তে কাতর হয়ে পড়[illegible] ভুবনবাবুর [illegible]ক বিবাহের স্ত্রী অভয়াদেবী।

সঙ্গীতা সবিস্ময়ে বলল, সেকি! অভয়াদেবীর ক্ষত তো সবচেয়ে বেশী। তিনি কি করে বিশ্বনাথের ব্যাপারে কাতর হতে পারেন?

তাই হয়েছিলেন। স্বামী সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হলেও অভয়াদেবীকে মর্যাদা ও ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিলেন। অভয়াদেবী তাই সত্যের অপলাপ সইতে পারেননি। তিনি নিজের সন্তানকে ঐটুকু বাগান ছেড়ে দেবার জন্য অনেক বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে যখন কিছুতেই বুঝতে চাইল না, তখন বিশ্বনাথের পক্ষ নিয়ে তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করলেন যে তাঁর স্বামীর রক্তই বিশ্বনাথের দেহে প্রবাহিত।

কিভাবে প্রমাণ করলেন?

একটি চিঠির সাহায্যে।

কি চিঠি?

বিশ্বনাথের ভূমিষ্ঠ হবার খবর পেয়ে অভয়াদেবী রাগ করে পিত্রালয়ে চলে যান। তাঁর অভিমান ভাঙানোর জন্য ভুবনবাবু বিশ্বস্ত লোক মারফৎ একটি পত্র পাঠান। তাতেই সব কথা লেখা ছিল। তিনি এজন্য অভয়াদেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন।

এরপর কেসটি ঘুরে গেল। বাগানবাড়ি পেয়ে গেল বিশ্বনাথ। সে এফিডেভিট করে দাস থেকে পানিগ্রাহী হয়ে গেল।

কাহিনীটি বেশ আকর্ষণীয়, মন্তব্য করল সঙ্গীতা।

এর ছোট একটি সংযোজন পর্ব আছে।

কি রকম?

মায়ের এই ব্যবহারে রতিকান্ত এমনি ক্ষুব্ধ হলো যে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। শেষে রতিকান্ত আর তার স্ত্রী চরম নির্যাতন শুরু করে দিল অভয়াদেবীর ওপর। বিধবার বাজার-হাট করার লোক নেই, রান্নাবান্না তো নিজেকেই করতে হয়। একমুঠো চাল সংগ্রহের জন্য দ্বারস্থ হতে হয় পুত্রবধূর, দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দরজার বাইরে বহু সময়। ভিখিরীকে চাল দেবার মতো করে রান্নার চাল স্পর্শ বাঁচিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অভয়াদেবীর আঁচলে।

আবার কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালে অভয়াদেবী পেতে পারেন তাঁর হকের অধিকার, কিন্তু তিনি সে পথ মাড়ালেন না। অপমানে নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন।

এমন দিনে তাঁর অভাবিতভাবে দেখা হয়ে গেল বিশ্বনাথের সঙ্গে। বিশ্বনাথ বাগানবাড়িতে থাকলেও অভয়াদেবীর নির্যাতনের কাহিনী এ বাড়ির কাজের লোকেদের মুখ থেকে শুনতে পেত। তারই জন্য যে অভয়াদেবীর এ নির্যাতন, এ কথা ভেবে খুবই মর্মাহত হয়েছিল বিশ্বনাথ। সে একটা সুযোগ খুঁজছিল অভয়াদেবীর সঙ্গে দেখা করার।

হঠাৎ কোনো পরামর্শের দরকার পড়ায় রতিকান্ত চলল অ্যাডভোকেট শ্বশুরমশায়ের বাড়ি। সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নীটিও রইল।

এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করল না বিশ্বনাথ।

অভয়াদেবী বিশ্বনাথের মনের কথা জানতেন না। তিনি এ বাড়িতে হঠাৎ তাকে ঢুকতে দেখে একটু বিস্মিতই হলেন।

অভয়াদেবী বললেন, কি কাজে মায়ের কাছে আসা হয়েছে বাবা?

আপনাকে আমার কাছে নিয়ে যেতে এসেছি মা।

আমাকে নিয়ে যাবে তুমি!

আমি কি আপনার ছেলে নই?

অভয়াদেবীর চোখে জল। ধরা গলায় বললেন, আমার স্বামী যে তোমার বাবা, এ সত্য আমি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে এসেছি। সুতরাং তুমি যে আমার ছেলে, এতে আর সন্দেহ কি! কেবল গর্ভে ধরলেই কেউ সন্তান হয় না বিশ্বনাথ।

তবে আর দেরি কেন মা, এক ছেলের কাছে তো এতগুলো বছর রইলেন, এখন এই ছেলেটার কাছে বাকী দিনগুলো কাটাবেন চলুন।

অভয়াদেবী দেখলেন বিশ্বনাথ খাঁটি সোনা। তিনি নির্দ্বিধায় বাগান-বাড়িতে বিশ্বনাথের আশ্রয়ে চলে এলেন।

লোকে বলে, অভয়াদেবীর পরামর্শ আর আশীর্বাদেই আজ বিশ্বনাথের এত উন্নতি।

যজনযাজনের পথটি বেছে নিয়েছিল বিশ্বনাথ। কিন্তু কোনো বর্ণহিন্দু তাকে দিয়ে পুজো করাতে চাইল না। ভুবনেশ্বর ব্রাহ্মণ হলেও মা সুভদ্রা একজন পরিত্যক্তা নারী ছাড়া কিছু নয়। শেষে অভয়াদেবীর পরামর্শে সে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঘরে ঘরে পুরোহিতের কাজ করতে শুরু করল।

এখন বিশ্বনাথ দস্তুরমত বিত্তবান। শুনেছি অভয়াদেবী নাকি তাকে বলেছিলেন, দেবতা কারু একার সম্পত্তি নয়। সমস্ত মানুষের ঘরে ঘরে আর হৃদয়ে তাঁর আসন পাতা। সমুদ্রের ধারে বসে তাঁকে ডাকা যায়, আবার পর্বতের চূড়ায় বসেও ডাকা যায় তাঁকে। নীচু-উঁচু বলে কোনো মানুষ নেই। সব মানুষই এক, সবাই তাঁর সৃষ্টি।

মায়ের এসব কথা বিশ্বনাথই সবার কাছে বলে বেড়ায়।

সঙ্গীতা বলল, আজ সকালটা গল্পে গল্পে বেশ ভালই কেটে গেল।

দীনু মাঝি হাত তুলে দূরে একটা বটগাছ দেখিয়ে বলল, আমরা আসি গেছি ছোটবাবু। ঐ বটগাছটার কাছেই একতারপুরের ট্যাক। ঔখানে নামতে হবে আমাদের।

বললাম, কেন, নাশিখালে নৌকো নিয়ে যাওয়া যাবে না? তাহলে তো একেবারে কাছারিবাড়িতে পেঁাছে যাই।

ছোটবাবু, নদীতে ভাটার টানটা দেখুন। এর চাইতেও খর ভাটার টান হইছে খালের জলে। ঢুকবেন কি করি! আর যদি নৌকায় যাইতে চান তাহিলে বসি থাকতে হবে ফের জোয়ার অব্দি।

ঠিক কথা। মা আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছিল, ভাটা চললে বেশ

কিছু পথ কাদা পেরিয়ে যেতে হবে। অগত্যা মনে মনে তৈরি হয়ে নিলাম। সঙ্গীতাকে বললাম, নতুন অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি থাক। কাদায় পদস্খলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

সঙ্গীতা কোনো কিছুতেই হার মানার মেয়ে নয়। সে বলল, দেখাই যাক না।

বললাম, তুমি যদি একবার কাদায় পড় তাহলে যা চিত্তির হবে না! কাছারিবাড়িতে গেলে মনে হবে, একমেটে মা দুর্গার মূর্তি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

কালাচাঁদ কথা বলে উঠল, আমি গুণ টানব আর বাবা লগি ঠেলবে, এই এটুকু পথ ঠিক চলি যাইতে পারব।

দীনু অমনি বলল, চেষ্টা করি দেখব।

যদিও খালের মুখে এসে ভাটার বহর দেখে চক্ষুস্থির তবু দমল না কালাচাঁদ। সে লাফিয়ে নেমে বাগিয়ে ধরল কাছি। মহাবিক্রমে টানতে লাগল কালকেতু।

এই প্রবেশমুখেই বাধা প্রবল। নদীর উল্টো স্রোতের ওপর এসে পড়ছে জলরাশি। সে এক হৈ রৈ কাণ্ড। জলের তোড়ে লাফিয়ে উঠছে নৌকো। তবু একসময় ঐ খালের মুখের বাধা ঠেলে ঢুকে পড়ল আমাদের জলযানটি। কালাচাঁদের চেষ্টা সফল হলো।

একবার যেই ঢুকল অমনি লগির ঠেলায় আর কাছির টানে চলল এগিয়ে, যদিও শম্বুক গতিতে।

কাছারিবাড়িতে ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল। লোক মারফৎ আগেই মা খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। ছোট কাকা বেরিয়ে এসে বলল, কাল রাত ন'টা থেকে বারটা, খালের মুখে লোক বসে আছে তোদের জন্যে। কারু দেখা নেই। ঘুম, খাওয়া-দাওয়া লাটে উঠেছে। এদিকে কদিন আগে এক মহাজনের নৌকো থেকে ডাকাতরা কয়েক হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে গেছে। নতুন বউমা আসছেন, গয়নাগাঁটি সঙ্গে আছে, তাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে সকলে।

আমাদের প্রণামপর্ব শেষ হলো। পিসিমা এসেছে কল্যাণচক থেকে। সেখানে একটি স্কুলে কাজ করে। এই পিসিমা আমার সবকটি পিসির মধ্যে ছোট। যদিও আমার নিজের পিসি নয়, মেজ ঠাকুর্দার মেয়ে, তবু আমাদের সব থেকে প্রিয় পিসিমা। শরীরের প্রতি অণু-পরমাণু যেন স্নেহসুধা দিয়ে তৈরি। অবিবাহিতা, শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রাতে আমাকে একান্তে পেয়ে সঙ্গীতা বলল, হরিদ্বারের গঙ্গাকে ছুঁয়ে আমি যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম আজ পিসিমার কাছে সারাদিনটা থেকে সেই অনুভূতিটি লাভ করেছি।

বললাম, কিরকম?

সে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। ব্যবহারে অতিরিক্ত কোনো উচ্ছ্বাস নেই, সব কাজে, সব কথায় গভীর অন্তরের ছোঁয়াটি লেগে আছে।

বললাম, যত মিশবে ততই ধরা পড়বে ওঁর মনের ঐশ্বর্য।

সঙ্গীতা বলল, এমন একটি মানুষ যে ঘরে যেতেন সে ঘরের চেহারাই বদলে যেত। আচ্ছা, পিসিমা বিয়ে করলেন না কেন?

অনেক ছোটবেলায় মা মারা যান। বাবা ছিলেন মনেপ্রাণে শিল্পী মানুষ। তাঁর হাতে তৈরি আঁশের অশ্বারোহী শিবাজী-মূর্তি অথবা সিজিন ফ্লাওয়ার কিংবা পালকের রঙীন পুষ্পগুচ্ছ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারেননি। অন্যদিকে তিনি দক্ষ সেতার-শিল্পীও ছিলেন।

স্ত্রী যখন মারা গেলেন তখন ছোট মেয়েটির পরিচর্যা তাঁকেই করতে হলো। মায়ের স্নেহমমতা উজাড় করে তিনি বালিকা কন্যাটিকে বড় করে তুললেন।

পিসিমার যখন বিয়ের বয়স হলো, তখন নানা দিক থেকে এলো তার বিয়ের সম্বন্ধ। উপযুক্ত শিক্ষিত এক যুবক দেখতে এলেন। পছন্দ হয়ে গেল তাঁর। দুপক্ষের কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেল। হবু বরটি এগিয়ে এসে তাঁর হাতের একটি আংটি খুলে মেয়ের আঙুলে পরিয়ে দিলেন।

পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখে কথাবার্তা পাকা করে চলে গেলেন কিন্তু বিপত্তি এল অন্যদিক থেকে।

পিসিমার বাবা চকে এলেন কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য। আমাদের চাষবাড়ির সংলগ্ন সাজানো যে প্লট দেখেছ, ওখানেই থাকতেন পিসিমার বাবা। একাই এসেছিলেন নিজের পালকিতে। সে পালকির বেহারাদের পথ চলার গান বা ডাক তিনিই শিখিয়েছিলেন। তখন ঘোড়ায় চড়ে আগের মতো চলাফেরা করতে তাঁর অসুবিধে হতো। লোকে বলে, দীর্ঘদেহী সুপুরুষ মানুষটি যখন সাদা ঘোড়াকে নিজের পছন্দমত সাজ পরিয়ে তার ওপর সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াতেন তখন পথচারীরা তাঁকে দেখার জন্য থমকে দাঁড়াত।

এবার আসল কথায় আসি। টাকা সংগ্রহের জন্য মেজ ঠাকুর্দা বেশ কয়েক বিঘে জমি জলের দামে বেচে দিলেন। জমি বিক্রির পর কিন্তু মনের ভেতর অশান্তির একটা ঘূর্ণি চলতে লাগল। ঠাকুর্দা রামমোহন বাবা শিবপ্রসাদ জঙ্গল কাটিয়ে এত সব জমিজায়গার পত্তন করেছিলেন আর তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য সেই জমি বেচে দিলেন!

কয়েকদিন গ্লানিতে ভুগে প্রজাদের কাছে বলতে লাগলেন, তোদের মালিক বদল হলো এবার, সুখে থাকবি। আমি আমার মা লক্ষ্মীকে বেচে দিয়ে গেলাম।

রাতে একদিন স্বপ্নও দেখলেন জগতদুর্লভ। বাবা শিবপ্রসাদ বলছেন, যা নিজে করিসনি, কেবল উত্তরাধিকারী বলে পেয়েছিস, তার মূল্য তুই কি বুঝবি! চঞ্চলা লক্ষ্মীকে শ্রম আর শ্রদ্ধার দড়িতে বেঁধে রাখতে হয়। একবার বাঁধন আলগা হলে আর তাঁকে ধরে রাখা যায় না।

স্নেহের কন্যাটির আসন্ন বিদায়ের ব্যথার সঙ্গে মিশে গেল ভূমিলক্ষ্মীকে হারানোর দুঃখ। এত শোক সইতে পারলেন না জগতদুর্লভ। তিনি সন্ন্যাস রোগের শিকার হলেন।

সঙ্গীতা বলল, এতেই কি মারা যান পিসিমার বাবা ?

না। মারা গেলে হয়ত পিসিমার জীবনটা অন্য খাতে বইতে পারত, কিন্তু তিনি মারা না গিয়ে পক্ষাঘাতে জীবন্মৃত হয়ে রইলেন। বাবার সেবার ভার নিজের হাতে পুরোপুরি তুলে নিল পিসিমা। দশ দশটি বছর অক্লান্ত সেবা করে বাঁচিয়ে রেখেছিল বাবাকে। যখন বাবা মারা গেলেন তখন বিয়ের বয়স কিংবা প্রবৃত্তি, কোনোটাই ছিল না পিসিমার। পরে বৃত্তি হিসেবে শিক্ষকতাকেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

মা বলে, সেবা যে কি বস্তু তা সেদিনের পঙ্কজাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। প্রতিদিন রাত চারটেতে বাবার প্রয়োজনে তাকে উঠতে হতো। শীত গ্রীষ্ম কোনো ঋতুই বাদ নেই। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, কোনোদিন সেবার সময়ে তাকে মেজাজ হারাতে দেখিনি। অশান্ত শিশুটিকে মমতার ছায়ায় শীতল করে রেখেছিল ও।

পিসিমার কথা বহুক্ষণ বলে আমি থামলাম। ওর কথা বলে শেষ করা যায় না। শুধু একবার আমি পিসিমার কাছে বকুনি খেয়েছিলাম।

সঙ্গীতা অমনি জানতে চাইল, কেন ?

বললাম, তখন স্কুলে পড়ি, রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ হলো। আমাদের যিনি বাংলা পড়াতেন (এখন যিনি স্বামী অমলানন্দ নামে পরিচিত) তিনি সমস্ত কাজেই আমাদের উৎসাহ দিতেন। রেডিওতে সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সন্ধ্যায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আমাদের নিয়ে একটি শোকসভার আয়োজন করলেন।

পাঠ এবং আবৃত্তি হলো রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ থেকে। মাস্টারমশায়রা কিছু বললেন। আমি অতি দ্রুত একটি কবিতা লিখে ফেলেছিলাম। সেটি পাঠ করলাম। সকলে কবিতাটি শুনে বেশ প্রশংসা করলেন। বাংলার মাস্টারমশায় পরের দিন বললেন, এটি কলকাতায় 'কিশোর বাংলা' পত্রিকা অফিসে সম্পাদকের নামে পাঠিয়ে দাও। আমার কাছে ঠিকানা আছে।

ঠিকানা তো নিলাম, কিন্তু পাঠাতে ভরসা হয় না। এক বন্ধু বলল, শুনেছি মেয়েদের নাম দিয়ে পাঠালে লেখা ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আইডিয়াটা সকলের মনে ধরল। এখন কোন মেয়ের নাম দিয়ে পাঠান যায় ? পিসিমার নামটা প্রথমেই মনে এল। 'পঙ্কজা' নামটা সকলের মনেও ধরল। ছাপার জন্যে পাঠান এই আমার প্রথম লেখা, যা পিসিমার নামেই ছেপে বেরুল। 'কিশোর বাংলা'র বিশেষ রবীন্দ্র স্মরণসংখ্যায়। তারপর পিসিমার নামে চিঠি এল সম্পাদকের, আরও লেখা চাই।

ব্যস, এই একবার মাত্র পিসিমাকে দেখেছি আমার ওপর ফেটে পড়তে, কে বলেছিল আমার নামে লেখা পাঠাতে ? মিথ্যা দিয়ে লেখার জীবন শুরু করলি, অদ্ভুত ছেলে তো ! নিজের নামে পাঠানর সাহস নেই তো পাঠাতে যাস কেন ? ক্ষমা চেয়ে সত্যি কথাটা সম্পাদককে লিখে জানা।

তাই পাঠালাম সম্পাদকের নামে ক্ষমা প্রার্থনা করে একখানা চিঠি। সঙ্গে

নিজের নামে একটি কবিতা। সেটিও ছাপা হলো।

পিসিমা বলল, দেখলি তো, ভাল জিনিস নাম ভাঁড়িয়ে বিক্রি করার দরকার হয় না।

সংগীতা বলল, পিসিমার নামে রবীন্দ্রনাথের স্মরণ সংখ্যায় যে কবিতাটা পাঠিয়েছিলে, সেটা কি মনে আছে তোমার?

বললাম, দু-চার ছত্র মনে করে বলতে পারি, সবটা স্মৃতিতে নেই। কবিতাটির নাম ছিল 'তোমায় ছাড়া'।

সংগীতা অমনি বলল, রবীন্দ্রনাথকে হারিয়ে মানুষ আজ কত দুঃখে ভাসছে তাই বলেছ নিশ্চয়!

মোটেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তারা আজ তাদের স্রষ্টাকে হারিয়ে যে দুঃখ পাচ্ছে, সেই কথাই কবিতায় বলেছিলাম।

'আকাশে আজ মেঘের আনাগোনা
বাতাস কহে কার সে বারতা,
সজল পাতা করছে কানাকানি
চুপটি করে জড়িয়ে আছে লতা।
কেষ্টা যে আজ কষ্ট পাচ্ছে কত
দেখলে তোমার আসত চোখে জল,
এমন দিনে সান্ত্বনা না দিয়ে
রবি মোদের গেলে অস্তাচল।
দীঘির পাড়ে আসছে পড়ে বেলা
ভরতে কলস নাই যে বধূ চলে,
ঘরের কোণে একলা বসে হায়
গোপন ধারা ঝরে চোখের জলে।'

সংগীতা বলল, স্কুলের নিচু ক্লাশের একটি ছাত্রের পক্ষে এ ধরনের একটি কবিতার আইডিয়া সত্যি প্রশংসা পাবার মতো।

চুপ, কেউ শুনে ফেললে বলবে, নতুন বউ তার স্বামীরত্নকে সার্টিফিকেট দিচ্ছে।

সংগীতা বলল, তোমাকে কে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, আমি তো ইস্কুলের এক কিশোরের রচনার তারিফ করছি!

বললাম, ও প্রসঙ্গ থাক, আগে বল আমাদের এই মধুচন্দ্রিমার পথযাত্রাটি তোমার কেমন লাগল?

ও আমার একখানা হাত ওর হাতের ভেতর টেনে নিয়ে চেপে ধরল।

বুঝলাম, সংগীতা খুশি হয়েছে।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে ও গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠল সেই বিখ্যাত গানটি—

'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত গীতে।

পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে—
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি'।

গানটি শেষ করে বলল, এ তোমারই গলার গান। তবু গাইলাম, এর সঙ্গে আমারও প্রাণের যোগ আছে বলে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সঙ্গীতার হাতের ছোঁয়ায় জেগে উঠলাম।

শুনছ?

কি?

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

আমরা বৃষ্টি দেখব বলে দুজনেই বিছানায় উঠে বসলাম। গভীর অন্ধকার, মেঘ ডাকছে। হঠাৎ ঝিলিক মেরে বিদ্যুৎ চমকালো। ঝকঝক করে উঠল চরাচর। কয়েক মুহূর্তমাত্র। তারই ভেতর দেখলাম, সবুজ পাতায় ছাওয়া একসারি কদম গাছ। কটি ফুলও জেগে আছে। আন্দোলিত তালের জটায় দোল খাচ্ছে বাবুয়ের বাসা।

আমরা মাটির ঘরের দোতলায় আশ্রয় পেয়েছি। টিনের চালে তবলার লহরা। আবার আলোর ঝলক। সামনের নয়নজলিতে লাল সাদা শালুকের ফুল স্নান করছে নববর্ষার জলে। ঝাপটা মারছে বাতাস, এলোমেলো উড়ছে বৃষ্টির ঝালর। এক দঙ্গল ভেক পুকুরপাড়ে গলা সেধে চলেছে সমানে।

বললাম, কার আগমনীর আয়োজনে মেতেছে আজ এই ঝড়ের প্রকৃতি কে জানে?

সঙ্গীতা বলল, ঝড়ের রাতের অভিসারিকা যাবে তার বল্লভের সঙ্গে মিলনের জন্য, তাই তো স্বর্গমর্ত্য জুড়ে এত আয়োজন।

বললাম, আমরা দুজন আজ রাতে পান্হশালার গোপন গুহায় বসে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেব।

শুধু আমরা দুজন বলছ কেন, ভালবাসার বিদ্যুৎ যাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে তারাই আজ এই বর্ষা-রাতের উৎসুক দর্শক।

বললাম, বহু যুগ আগেও সে দর্শক ছিল দশার্ণ, বিদিশা, উজ্জয়িনীতে। আজ তারা বৃষ্টির মুক্তোঝরা চিকের অন্তরালে চলে গেছে। কিন্তু তারা ভিন্ন নামে ভিন্ন অবয়বে ফিরে এসেছে আমাদেরই ভেতর।

যতক্ষণ না বৃষ্টি থামল আমরা এমনি করে কথার পর কথার মালা গেঁথে চললাম। মাঝে মাঝে বাদল দিনের গান গাওয়া হলো, শুধু দুজনের শ্রবণ আর হৃদয় খুলে শোনার জন্য।

সঙ্গীতা বলল, কি ভাল যে লাগছে এখানে এসে! স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, সে এখানে, সে এখানে, সে এখানে।

ভোরবেলা সত্যিই স্বর্গ রচিত হয়ে গেল। কাঁচা সোনার মতো রোদ্দুর এসে পড়ল কদম্ববনের শ্যামল পত্রপুটে। আবার সে পেয়ালা থেকে উপচে

পড়ল সোনালী পানীয় কলমী ছাওয়া পুকুরের এক কোণায়। সেখানে শুরু হয়ে গেল হলুদ প্রজাপতির নাচ। কাশবনে সাতরঙা পাটখলসে বেনারসীর ঝিলিক মেরে রোদের সোনামাখা জলের ভেতর নাচ দেখাতে লাগল।

সংগীতার ভেতর ঘুমন্ত একটা বালিকা যেন কাল রাতে বর্ষার ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠেছে। সে একবার যাচ্ছে কদম গাছের তলায়, আবার চলে যাচ্ছে বাঁধা ঘাটের পাটে। জলে ঢেউ তুলে পা ধুচ্ছে। ভোরের হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে গতর ফুলিয়ে মাঝ-পুকুরে চলে গেল। সেখানে তারা একের পর এক ডুব দিয়ে স্নান সারছে। অবাক চোখে সেদিকে তাকিয়ে দেখছে সংগীতা।

সোনামুখি ডাব ফলেছে যে গাছে, সেখানে কালি গাইটাকে এনে বাঁধল বাগদী পাড়ার একটা ছেলে। তার কাছে এগিয়ে গেল সংগীতা। সে গাইটার গলায় হাতে বুলিয়ে দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটা কালির শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে আশ্বস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচর্যায় লেগে গেল সংগীতা। ছেলেটাকে দিয়ে একগোছা কলমী তুলে আনল। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল গরুটাকে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে কালি। চিকন গা থেকে পিছলে যাচ্ছে রোদ্দুর। মনে হলো বাচ্চার মা হতে বেশি দেরি নেই। আমি ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখছি, সংগীতা তার গায়ে গাল ঠেকিয়ে গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সংগীতার সঙ্গে একসময় আমার চোখাচোখি হলো। আমি ইশারায় ওকে কাছে ডাকলাম।

ও কাছে এসে বলল, কি সুন্দর গাইটা! এত শান্ত আমি কখনো দেখিনি।

বললাম, কালির কথা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

কিরকম?

আগে শুনে নাও, এ গাইটা মেজদার। থাকে আমাদের ও বাড়িতেই। দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় যখন তখনই এখানে শরীর ফেরানোর জন্য এনে রাখা হয়।

ও বলল, হাঁ, এখানে এলে সত্যি শরীর ফিরে যাবে। এমন সবুজ ঘাস-পাতা পাওয়া যাবে না বসত এলাকায়।

বললাম, খাওয়া-দাওয়ার এত অঢেল আয়োজন তবু মন বসে না কালির এখানে।

কেন?

একদিন মেজদার হাতের ছোঁয়া না পেলে ওর চোখে জল এসে যায়।

আশ্চর্য!

আরও আশ্চর্য আছে।

কি রকম?

বললাম, প্রথম যেবার এল, প্রায় পঁচিশ মাইল পথ পেরিয়ে আসতে হলো তাকে। আঁকাবাঁকা পথঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর পেরিয়ে এল। কোথাও বাঁশ বনের

পাশ কাটিয়ে, বাবলাবনে কাঁটার খোঁচা খেয়ে, কোনো গৃহস্থের উঠোনের ওপর দিয়ে পথ করে নিতে হলো। তারপর পথে পড়ল একটা ক্যানেল আর একটা নদী। নৌকোর সঙ্গে বাঁধা রইল ওর গলার দড়ি, ও পার হলো সাঁতার কেটে।

কালিকে এতদূরে পাঠিয়ে আমাদের সকলের মন খারাপ। প্রতিবেশীরা বলল, ওখানে এক পাল গরুর সঙ্গে ও মিলে মিশে ঠিকই থাকবে। তাছাড়া খাবার পাবে অঢেল। এখানে বেশির ভাগ সময় ভূষি আর শুকনো খড়।

তে রাত্তির পেরুল না। এক সন্ধ্যায় আমরা নিচের উঠোনে কালির হাঁক শুনলাম।

ওপরে বসেছিল মেজদা, ছিটকে নেমে গেল। আমরা গিয়ে দেখি মেজদা কালির গলা জড়িয়ে আদর করছে আর কালি মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

চাষবাড়িতে নিতাই সর্দার গরুর দেখাশোনা করে। সে-ই চকে নিয়ে গিয়েছিল কালিকে। সে আবার ফিরিয়ে আনল কেন? কোথা গেল নিতাই? এদিক ওদিক খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না।

আমরা বিস্ময়ে হতবাক, কালি কি একাই এল! একেবারে অচেনা পথ-ঘাট-মাঠ, একটা নদী আর একটা খাল, গোলকধাঁধার পথঘাট। যদিও একটিবার গেছে তবু অচেনাই বলব।

কালি কিন্তু সেই গোলকধাঁধার পথই পেরিয়ে এল। একা, দু-দুটো তরঙ্গিত জলপ্রবাহ পার হয়ে। প্রাণের টান একেই বলে। তবে কালির এই পথ চিনে আসাটা আজও আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে।

সঙ্গীতা বলল, সত্যিই আশ্চর্য।

বললাম, তার পরের দিনই নিতাই এসে পৌঁছল। কালির হারিয়ে যাবার খবর নিয়ে এসেছে সে। মাঠে ভোরবেলা অন্যসব গরুর সঙ্গে চরতে গিয়েছিল, সন্ধ্যের আগে সবাই ফিরল কিন্তু কালি নেই। ওরা সারারাত ওকে খুঁজেছে বনে-বাদাড়ে। ধবধবে জোছনা রাত, লুকোবে কোথায়? শেষে না পেয়ে মালিককে খবরটা দিতে এসেছে নিতাই।

সঙ্গীতা ছুটল সেই মহীয়সী কালিকে আর একবার ভাল করে আদর জানাতে।

আমার আপন ছোট পিসি এল নৌকো করে বউ দেখতে। বয়েস হয়েছে, ছেলেটি রিসার্চ করছে লন্ডনে, উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনো কথা নেই মুখে। সেই ছেলেবেলায় যেমনটি দেখেছি, অপার আনন্দময়ী। কথায় কথায় হাসি ছড়িয়ে চলেছে।

বললাম, পিসি, সব কটা দাঁতই কি তোমার আসল?

আকর্ণ হাসি। ঝকঝক করছে দাঁত। দাঁতের মাজনের এমন বিজ্ঞাপন সত্যিই দুর্লভ।

পিসি বলল, দাঁত নিয়ে নতুন বউয়ের কাছে পিসিটার হেনস্তা নাই বা করলি।

একটু থেমে বলল, সঙ্গীতা, ত্রেতাযুগে সীতাকে তার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আগুনের ভেতর ঢুকে। আস্ত বেরিয়েও এসেছিলেন মা জানকী। আজ আমিও আমার দাঁতের পরীক্ষা দেব সবার সামনে।

শৈল একটা ডুরে শাড়ি পরে হাঁ করে শুনছিল ছোট পিসির কথা।

পিসি বলল, শৈল, পানের বাটার পাশে কৌটোয় আস্ত সুপুরি আছে, দুটো আন তো।

শৈল ছুটে গিয়ে যথাস্থান থেকে দুটো আস্ত সুপুরি নিয়ে এল।

পিসি তার হাত থেকে সুপুরি নিয়ে টপ করে একটা মুখে পুরে দু-একবার দাঁতের চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলল। আর একটা মুখে ফেলতে যাচ্ছিল, ছোট কাকা বললে, থাক্ থাক্, আর প্রমাণ দিতে হবে না। তুই তো তবু দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে এগিয়ে এলি, কিন্তু সীতা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে রাজী হননি। একশ নম্বর পেয়ে তুই শুধু পাশ নয়, প্রথম হয়ে গেলি।

বললাম, ছোটবেলায় এই পিসি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়।

ছোট কাকা বলল, সারাদিন ও বাঁদরছানার মতো ঝুলে থাকত ওর ছোট পিসির কোলে-পিঠে। রাতেও শুয়ে থাকত পিসির গলা জড়িয়ে। ছোটন বিয়ের পর চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। অমনি ছেলের খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে কান্নাকাটি, তারপর কেমন যেন গুম মেরে গেল। এতটুকু বাচ্চার শরীর শুকিয়ে যায় আর কি! শেষে অষ্টমঙ্গলাতে ছোটন এসে ওর অবস্থা দেখে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বাঁদরছানাটি চলল ছোট পিসির গলা জড়িয়ে তার শ্বশুরবাড়ীতে।

ছোট পিসি অমনি বলে উঠল, মজা শোন, আমি এখানে আসব বলে ওকে নিয়ে পালকিতে উঠেছি। শ্বশুরমশায় আমাকে বড় ভালবাসতেন। পালকি চলতে শুরু করলে উনি বললেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো বৌমা। বুড়ো ছেলেকে একা ফেলে রেখে বেশিদিন থেকো না যেন।

পালকির ভেতর তখন রাগে গরগর করছে এই বিচ্ছুটা। বলছে কি, খবরদার এখানে তুমি আর আসবে না পিসি। আমার ছুরি, বায়স্কোপ, মোটরগাড়ি সব তোমাকে দেব।

সঙ্গীতা হাসছে দেখে পিসি বলল, এখনও শেষ হয়নি ওর লীলা। আমার পালকি ক্রোশ খানিক পথ পেরিয়ে এসেছে। ওখানে গঞ্জের একধারে আমাদের একটা কাপড়ের দোকান ছিল। ওর পিসেমশাই আগে থেকেই এসে বসেছিল ওখানে। বাবার সামনে বউয়ের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে একটা নিরালা জায়গায় দেখা করার মতলবে ছিল।

আমার পালকি দোকানটা পেরিয়ে আসার পর আমি হঠাৎ দেখলাম, হাবুলবাবু পালকির বাইরে মুখ বের করে বলছে, জলদি চল, জলদি চল।

আমি বললাম, হাঁরে হাবুল, কি বলছিস তুই?

হাবুল অমনি বলল, ওদের জলদি যেতে বলছি।

কেন?

ঐ দেখছ না, লোকটা পালকির পেছনে তাড়া করে আসছে।

আমি তাকিয়ে দেখি ওর পিসেমশাই আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে হনহন করে এগিয়ে আসছে।

বলেই ছোট পিসির সে কি হাসি!

কয়েকটা দিন আমাদের কাটল হৈ-হুল্লোড়ে। আমরা সকাল সন্ধ্যে চকের চারদিকে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম।

একদিন লোকাল বোর্ডের বাঁধের ওপর দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। সঙ্গে ছোট পিসি আর সঙ্গীতা। একটি প্রায় বৃদ্ধ মানুষ এগিয়ে এসে ছোট পিসিকে নত হয়ে নমস্কার করল।

ছোট পিসি প্রতি-নমস্কার করে বলল, কেমন আছেন গোমস্তাবাবু?

এই মা, আপনারা যেমন রেখেছেন।

ও বাড়ির সব ভাল?

সে তো আপনাদেরই ভাল করে জানার কথা মা। ওঁরা বাবুদেরই তো জ্ঞাতিগোত্তর।

ছোট পিসি বলল, একে চিনতে পারছেন?

মানুষটি হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করতে লাগল।

পিসি বেশিক্ষণ বৃদ্ধটিকে ধাঁধার মধ্যে না রেখে বলল, এটি আমার বড়দার ছোট ছেলে, কলকাতায় থাকে, কলেজে কাজ করে। এটি আমাদের নতুন বউমা।

বৃদ্ধ নমস্কারের জন্য হাত তোলার আগেই আমরা দুজনে ওঁকে নমস্কার জানালাম।

বৃদ্ধ বলল, আপনি নলিনীবাবুর ছেলে। কত ছোট বয়সে তিনটি ভাই বাবাকে হারিয়েছিলেন। সে সময়ে কর্তাদের কড়া হুকুম ছিল, বাবুর বাড়ির ছেলেরা যেন প্রজাপাটক, বক্সী গোমস্তাদের বাড়ির ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে না মেশে। নলিনীবাবু ছিলেন ভিন্ন ধাতের মানুষ। ঘোড়াটিতে চড়ে সোজা আমাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। কোথাও নেমে বলতেন, খুড়িমা, নলেন গুড়ের সঙ্গে মুড়ি মেখে খেতে ইচ্ছে করছে।

অমনি মুড়ি এসে গেল।

আবার কাছারিতে যখন আমাদের পাত পড়ত তখন নলিনীবাবু নিজে ঘুরে ঘুরে আমাদের পাতে ঠিকমত পরিবেশন হচ্ছে কিনা তদারকি করতেন।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, মনে হয়, এসব যেন এই সেদিনের কথা।

আবার বললেন, আপনাদের পরিবারের অনেক কথাই বাবা-জ্যাঠার মুখ থেকে শুনেছি। সে সব শুনলে অদ্ভুত মনে হয়। জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে মুখ দেখা-দেখি নেই, এমন শত্রুতা। হঠাৎ দেখা গেল দুজন দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন।

ছোট পিসি বলল, জগতদুর্লভবাবুর সেই দাঙ্গার গল্পটা আমার এই ছোট ভাইপোটিকে একবার শুনিয়ে দিন।

আমি বললাম, ঐ বটগাছটার কাছে চলুন। ওর দুটো শেকড়ই মোটা বেঞ্চের মতো হয়ে আছে, দিব্যি বসা যাবে।

আমরা সকলে এসে সেই মোটা শেকড়ের ওপর আরাম করে বসলাম। সামনে একটা বড় পুষ্করিণী। এককালে বাঁধাঘাট ছিল, এখন ইঁট খসে ভেঙে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

গোমস্তাবাবু হাত তুলে দেখালেন, বিবাদ ঐ পুষ্করিণীটি নিয়ে। দেখুন, এই রাস্তাটা ঐ পুষ্করিণীর মাঝ বরাবর এগিয়ে গেছে। তারপর পুষ্করিণীর চারদিকে তৈরি হয়েছে উঁচু বাঁধ। আবার ওপারেও পুষ্করিণীর মাঝ বরাবর পাড়ের গা থেকে লোকাল বোর্ডের রাস্তাটা পশ্চিমে চলে গেছে। রাস্তার এপারে আপনাদের চক, ওপারে বড় তরফের। আপনার থেকে পাঁচ পুরুষ আগে জঙ্গল কাটিয়ে এ চকের পত্তন হয়েছিল। তখন এখানকার বাগ্দীরা বাবুদের টাকায় চলাচলের রাস্তাটাও তৈরি করে। পরে ঐ রাস্তাটাই সরকারী অর্থে উঁচু করে বাঁধান হয়।

এখন আদিতে পুষ্করিণীটি ছিল দু-তরফের এজমাল সম্পত্তি। গ্রাম পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছিল চণ্ডীমার থান। দু-তরফের প্রজারাই মিলেমিশে চণ্ডীর পুজা করে। পুজা শেষ হলে সারা গ্রামে একদিন ভোজ হয়। সেই ভোজের মাছ ধরা হয় এই এজমাল পুষ্করিণী থেকে। বাবুরাই অগ্রণী হয়ে প্রজাদের মাছ ধরার এই অধিকারটুকু দিয়েছিলেন।

কিন্তু কালে এই পুষ্করিণীটি যে কোনো কারণেই হোক বড় তরফের রেকর্ডভুক্ত হয়ে যায়। ছোট তরফ সে সময় দেশের জমিজায়গার ব্যাপারে এমনই বিরত হয়ে পড়েছিলেন যে এদিকে আদপেই নজর দিতে পারেননি।

এমনিভাবে এক পুরুষ কেটে গেল।

ব্যাপারটা ছোট তরফের নজরে পড়ল অন্য একটি কারণে। কেলেঘাই নদীর বন্যা যখন আসে তখন আপনাদের চকের দিকটাই ডোবে। জল এসে বাঁধের উত্তর দিকেই আটকা পড়ে। আপনাদের চকের প্রজাদের তখন অশেষ দুঃখ। বাঁধ কাটিয়ে বড় তরফের খাল দিয়ে বন্যার জলকে নদীর দিকে বের করে দেবার একটা চেষ্টাও হয়েছে ছোট তরফ থেকে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। এইসব কারণে দু-তরফের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়।

বন্যার সময় এপারের পুকুরঘাট যখন ডুবে যায় তখন পানের জল সবাই নিয়ে যায় ঐ পুষ্করিণী থেকে। একবার বড় তরফের নায়েবমশায় লোক মোতায়েন করলেন পুষ্করিণীর পাড়ে। যারা বন্যার জল বের করবে বলে বাঁধ কাটাতে চেয়েছিল তাদের একফোঁটাও জল দেওয়া হবে না।

খবরটা চলে গেল আপনাদের দেশের বাড়িতে। তখন ছোট তরফ নানা বিপর্যয়ের মুখে। এসময় অল্পেতেই মানুষের সম্মানে বড় আঘাত লাগে।

জগতদুর্লভবাবু ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন চকে। এক নৌকোবোঝাই টাঙি, হাঁসুয়া, লাঠিসোটা, চৌকিশর এনে তুললেন তাঁর চকের বাড়িতে। পিতামহের আমলের ভারী তলোয়ারখানায় নিজেই শান দিয়ে রাখলেন।

প্রজাদের ডেকে বললেন, ও পুকুরের জলে তোদের সমান অধিকার আছে।

প্রজাদের মোড়ল বলল, মেজকত্তা, ওদের নাইব আমাদের সরকারী ছাপ-মারা কাগজ দেখায়ে বলিছে, পুষ্করিণীর ষোল আনি অংশই বড় তরফের। তোরা বাঁধ কাটাইতে চাইছিলি, তোরা একফোঁটা জল পাবিনি।

আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন মেজকর্তা। বললেন, দুদিন অপেক্ষা কর।

গোমস্তাকে ছোটালেন সেটেলমেণ্ট অফিসে। পাকা খবর এল, পুকুর এক পুরুষ আগেই বড় তরফের নামে রেকর্ড হয়ে গেছে।

মেজকর্তার রক্তে আগুন ধরে গেল। বললেন, এইসব হাতিয়ার হাতে তুলে নে। বাধা দিতে এলেই হাতিয়ার চালাবি। একটাকেও আস্ত রাখবি না।

কানাঘুষোতে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় তরফের নায়েব মহম্মদপুর থেকে লেঠেল যোগাড় করে আনল রাতারাতি।

মেজকর্তা দাঙ্গার দিন ঘোড়ার ওপর চড়ে, সেই ভারী তলোয়ার উঁচিয়ে এই পুষ্করিণীর দিকে এগোতে লাগলেন। পেছনে হাতিয়ার উঁচিয়ে হৈ হৈ করে আসতে লাগল ছোট তরফের প্রজারা। মেয়েরা এগিয়ে আসতে লাগল শাঁখ বাজাতে বাজাতে। একদল মেয়ের মাথায় কলসী। সে এক দৃশ্য ছোটবাবু।

পুষ্করিণীর কাছে এসে ঘোড়ার ওপর বসে এমন হুঙ্কার ছাড়লেন মেজ-কর্তা যে পিলে ফেটে যাবার যোগাড়।

দু-পক্ষই পরস্পরের দিকে ছুটতে লাগল রৈ রৈ শব্দ করে।

হঠাৎ মেজকর্তা দেখলেন, সাদা থান-পরা এক মহিলা বড় তরফের কাছারি-বাড়ি থেকে ছুটে আসছেন। আকাশের দিকে এক হাত তোলা। কি বলছেন শোনা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন বিশাল মানুষটি। তারপর লাফ দিয়ে পড়লেন মাটিতে। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন হাতের তলোয়ার। ছুটছেন আর চেঁচাচ্ছেন—থাম্, থাম্।

দু-পক্ষই তখন থেমে গেছে। ওঝা যেন মন্ত্র পড়ে সাপের মুখ বন্ধন করে দিয়েছে।

জগতদুর্লভবাবু দৌড়ে গিয়ে সেই মহিলার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, তুমি এখানে জ্যেঠাইমা!

কর্তামা জগতবাবুকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, তুই তো আমাকে এখানে টেনে আনলি বাবা। দাঙ্গার খবর পেয়ে কাল রাতে আমি ভাউলিয়াতে করে বেরিয়ে পড়েছি। সারারাত চারটে দাঁড়ি প্রাণপণ টেনে এইমাত্র কাছারিতে পৌঁছে দিলে। কি চাই তোর বল না?

জগতবাবু প্রজাদের দেখিয়ে বললেন, বন্যায় বেচারীদের খাবার সংস্থান নেই, তার ওপর খাবার জলের অভাব। এদিকে নায়েব পুকুরে পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে, জল নিতে দেবে না একফোঁটা।

নায়েবকে ডেকে কর্তামা সবার সামনে তিরস্কার করলেন।

প্রজাদের ডেকে বললেন, এ পুকুর তোমাদেরও। দরকারমত এখান থেকে জল নিয়ে যাবে। কাল আমার কাছারিতে তোমরা সবাই এসো।

পরের দিন কর্তামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছোট তরফের প্রজাদের ঘরপিছু দু-মণ করে ধান সাহায্য দিলেন।

পরে চণ্ডী মায়ের পুজোয় মাছ ধরা হলো। দু-তরফের প্রজাদের একত্রে পাত পড়ল। ঠিক সেই দিনই কর্তামা জগতবাবুকে নিজের কাছারিতে নেমন্তন্ন করে আনলেন।

একটু থামলেন গোমস্তাবাবু। বৃদ্ধ হয়েছেন, আবেগ এসে গিয়েছিল, সামলে নিলেন।

আমার জ্যেঠা সেদিন বড় তরফের কাছারি-বাড়িতে হাজির ছিলেন। তেনার ওপর ভার ছিল দই, মিষ্টি, মাছ-মাংস যোগাড়যন্তরর।

জ্যেঠার মুখেই শুনেছি, রাত থেকে কর্তামা রান্না চাপিয়েছিলেন। ঝিদের কাউকেই রান্নার-কাজে হাত লাগাতে দেননি। কত যে রাঁধলেন তার লেখাজোখা নেই।

শেষে দামী আসন বিছিয়ে খাবার সাজিয়ে বাইরের বৈঠক থেকে নিজে ডেকে আনলেন জগতবাবুকে।

তারপর সে এক দৃশ্য! মা যেমন তার ছোট ছেলেটির মুখে গ্রাস তুলে দেয় তেমনি করে প্রথম গ্রাসটি জগতবাবুর মুখে তুলে দিলেন কর্তামা। জগত-বাবুর চোখ জলে ভরে উঠল।

কর্তামা বললেন, ছোটবেলা তুই ভারী দুষ্টু ছিলি জগৎ। বিজয়া দশমীর দিন জ্ঞাতির ছেলেরা সব প্রণাম করতে আসত। লুচি মিষ্টি খেয়ে চলে যেত তারা। তুই শুধু বলতিস, জ্যেঠাইমা নিজের হাতে না খাইয়ে দিলে আমি খাবই না।

জগতবাবু খেতে খেতে বললেন, তোমার হাতে যে অমৃত আছে জ্যেঠাইমা।

কথাগুলো বলে বৃদ্ধ চোখ মুছলেন।

আমি বললাম, সে অন্যদিন ছিল গোমস্তাবাবু। মনও ছিল ভিন্নরকম।

আর একটুখানি বাকী আছে ছোটবাবু।

বলুন, বলুন।

খাওয়া শেষ হলে কর্তামা অন্দরে নিয়ে গেলেন জগতবাবুকে। হাতে একখানা নতুন দলিল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, বড় তরফ যে অন্যায় করেছিল আমি তা সংশোধন করে দিলাম। ছেলেদের দিয়ে সইও করিয়ে নিয়েছি। আজ থেকে চণ্ডীপুকুর ছোট তরফের। কেবল জলস্বত্বটুকু রইল বড় তরফেরও।

ঝিলের মতো বড় বড় জলার ধারে কত রকমের জলজ উদ্ভিদ জেগে আছে। নল, শর, হোগলায় ছাওয়া তীরভূমি। ছোটবড় কত রঙের শালুক ফুটে আছে। পাতার ওপর মুক্তোর দানার মতো জল ছড়ানো। ফুলের কাছে

এসে কখনো প্রজাপতির ঝাঁক দর্শন দিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো মুথা ঘাসের ডগায় বসে পাখা কাঁপাচ্ছে গঙ্গা ফড়িং।

ঝিলের ধারে ধারে বহু পুরাতন বট-অশ্বত্থের গাছ। মোটা মোটা লতায়-পাতায় তাদের সারা গা ঢাকা। সেখানে হাজার হাজার পাখির বাসা। এক-দিকে বক, অন্যদিকে গোখুঁটেরা ওখানে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে আসছে। ঝিল তাদের খাদ্য আর পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। পরম নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করছে ওরা। তবে পাশাপাশি থাকলে ঠোকাঠুকি হয়। মাঝে মাঝে ওদের ভেতর কলহ তুঙ্গে উঠে পড়ে।

তখন ঘোরতর কলকোলাহলে বাতাস তরঙ্গিত হতে থাকে। সে সময় কাক, শালিকেরাও জুটে যায়। প্রথমে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় থাকে, তারপর একসময় জড়িয়ে পড়ে বিবাদে। ঠোকাঠুকি শুরু হলেই আকাশ জুড়ে চলতে থাকে ওড়াউড়ি। মনে হয় নীল আকাশের জলে যেন শত শত শ্বেত-শাপলার ফুল ফুটে আছে।

গোলমাল সইতে পারে না মাছরাঙা। জলটুঙির সামনে পোঁতা একটা বাঁশের ডগায় বসে জলের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে সে, কিন্তু এত গোলমালে কি মনঃসংযোগ করা যায় কাজে!

শরতের রোদমাখা চিকন আকাশে পাখা দোলাতে দোলাতে উড়ে আসে বালিহাঁসের দল। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে জলায়। কয়েক মাস সুখের আবাস গড়ে তোলে এখানে।

ঐ দেখ কি চমৎকার দুটো পাখি পাশাপাশি বসে।

সঙ্গীতার তর্জনীকে অনুসরণ করে দেখলাম, ঝিলের মাঝখানে ঘাসে ছাওয়া দ্বীপের মতো একটুকরো ভূমি। ওখানে জলার ধারে উচ্চবর্ণের সুদৃশ্য দুটো সারস বসে আছে। লাল-সাদা আর মেঘ-ধূসর রঙের দেহবর্ণে পাখিদের ভেতর বড় অভিজাত বলে মনে হচ্ছে ওদের।

বললাম, ও দুটি সারস পক্ষী। সারসদের ভেতরে কুলীন।

এক দঙ্গল গরুকে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে চলেছে বাগালরা। ছোট রাস্তায় গুঁতোগুঁতি জড়াজড়ি করে ছুটেছে। দামড়া গরুগুলো একবার কুর্দন শুরু করলে ছুটে গিয়ে অনেক দূরে থামবে। বকনাগুলো মায়েদের কাছাকাছি চলেছে। তাদের ভেতর একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। তরুণী, কিশোরী মেয়েদের কি অত তড়পানো শোভা পায়? যে একটু লাগামছাড়া হবার চেষ্টা করছে তাকে শিংয়ের গুঁতোয় শায়েস্তা করছে গো-জননী।

হো গবিন্দ কাই গেলু রে……।

শাঁখ ধরার মতো দুটো হাত মুখের সামনে গোল করে ধরে একটা লোক হাঁক পাড়ছে। সে নাশি খালে একটা নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অনেক-গুলো লোক দাঁড়িয়ে আর বসে নৌকোখানা বোঝাই করে ফেলেছে।

সঙ্গীতা বলল, লোকটি কি ভাষায় কথা বলছে?

কেন, বাংলারই একটা উপভাষায়।

কি বলছে ও ?

লোকটি ঐ নৌকোর মাঝি। সম্ভবতঃ নৌকো নিয়ে একতারপুর বাজারে যাবে। এ অঞ্চলের যাত্রীরা বাজার যাবার জন্য উঠে পড়েছে, কিন্তু দাঁড়ী গোবিন্দচন্দ্রের দেখা নেই। তাই হাঁক পাড়ছে মাঝি, গোবিন্দ, কোথা গেলি রে— ।

গোবিন্দ নামক যুবকটি একটি বাঁশের লগি কাঁধে তুলে নিয়ে নৌকোর দিকে ছুটে আসছে। পরনে একফালি গামছা।

নৌকোয় উঠে গোবিন্দ মহাবিক্রমে ঠেলা মারতেই সর্‌সর্‌ করে নৌকো এগিয়ে চলল।

সঙ্গীতা সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, ঐ দেখ একটা দ্বীপের মতো জায়গায় কতকগুলো খড়ো ঘরের জটলা !

বললাম, নিচু জমি তাই, একটু বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। ঐ দেখ লোকাল বোর্ডের রাস্তা থেকে সরু একটা বাঁধ মাঠের ভেতর দিয়ে পাড়ায় ঢুকে গেছে। ঐ বাঁধের ওপর দিয়েই ওরা যাতায়াত করে।

ভেজা খড়ের চালগুলো ফুঁড়ে বুলবুলিয়ে ধোঁয়া উঠছে। পাতলা নীলাভ ধোঁয়া ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। রান্না চড়িয়েছে চাষীপাড়ার মেয়েরা।

সঙ্গীতা উৎসাহী হয়ে উঠল, যাবে ওখানে ?

ওখানেই তো শৈলদের বাড়ি।

তাহলে চল চল একবার দেখে আসি।

আমরা চাষীপাড়ার রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। বড় রাস্তার উত্তরেই চাষী আর বাগ্‌দীপাড়া। মাঝখানে আমাদের কাছারিবাড়ি দু-পাড়াকেই তফাতে রেখেছে।

রাস্তায় কাদা। হড়কে যাচ্ছিল পা। আমি শক্ত করে ধরে রেখেছি সঙ্গীতার একখানা হাত। রাস্তার ধারে টবুনা (ছোট্ট পুকুর), তাতে পালা (বাঁশ, কঞ্চি, গাছপালা ইত্যাদি) ফেলে রেখেছে। লুকিয়ে রাতের বেলা মাছ ধরতে গেলেই জাল জড়িয়ে যাবে পালায়। যার পুকুর সে দিনের বেলা পালা তুলে জাল দেবে।

একটা স্রোত ঢুকছে মাঠ থেকে পুকুরে। ঐ স্রোতের পথ ধরে পুকুর থেকে উজানি মাছ বাইরে বেরিয়ে যাবার তাল করছে। তাই বাঁকি বসান হয়েছে স্রোতের মুখে। একটা বছর দশেকের মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। আমাদের দেখে মেয়েটা ফিরে দাঁড়াল। সভ্যতা এখনো এখানকার আদিম সৌন্দর্যকে মুছে দিতে পারেনি। মেয়েটার মুখ-চোখের দিকে তাকালে আশ্চর্য এক সরলতার ছবি দেখতে পাওয়া যায়। নয়নজলিতে ফুটে-ওঠা শাপলা ফুলটির মতো। এখানকার ছেলেরাও কচি তালগাছের মতো ঋজু আর মনোরম। এদের গায়ে, পোশাকে সারাক্ষণ আদিম মাটির দাগ লেগে আছে।

হাঁরে, শৈলদের বাড়ি কোথায় ?

ও সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে একটা বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

কি নাম তোমার? সংগীতা জিজ্ঞেস করল।

ও আস্তে ভয়ে ভয়ে বলল, কুনি।

বাঃ, সুন্দর নাম তোমার!—বলেই ওর গালে আলতো একটা টোকা দিল সংগীতা।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভালবাসার তাপটুকু ওর মনে ছোঁয়া দিল। ও শৈলর বাড়ি দেখাবার জন্য আমাদের আগে আগে চলতে লাগল।

শৈলদি, শৈলদি, তুমার ঘরে কুটুম আসসে গো।

শৈল ঘরের দাওয়ায় বেরিয়ে উঁকি দিল।

ও মা, কে আসসে দেখ গো।

কুন্তীদি বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

আমার কি ভাগ্যি, ছোটদা লতুন বউ লিয়ে গরিবের দরে (দুয়ারে) আসসে গো। শৈল ছুটি যা, তোর বাপকে ডাকিলি আয়। আইস, আইস বউদি, আমার সনা দিদি।

কুন্তীদি সংগীতাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল ভেতরে।

তুমার পায়ের ধুলা পড়বে আমার ঘরে সে কি কুনদিন ভাবি পারি!

সংগীতা বলল, একথা কেন বলছ কুন্তীদি। আমি নিজে খোঁজ করে এসেছি। তুমি কাছারিবাড়িতে গিয়েছ কিন্তু আমাকে তোমার বাড়িতে ডাকনি।

সে সাহস কি আমার আছে ভাই!

তুমি তো আমার ননদিনী গো, তোমার আবার ভয়টা কিসের!

মা আমাকে তার মেয়ের মতন লালনপালন করছে বটে। ওউ ছোটদাটা কি আমাকে কম জ্বালাইছে।

সংগীতা বলল, কেন গো?

তরকারিতে নুন লংকা বেশি কমটি হবার জো নেই। শুক্‌না ভাত খাবে তবু তরকারি মুখে দিবেনি। ভাই সনাটা, ভুল হৈছে, খাই লও, আর হবেনি। কিন্তু খালি ভাত খাই উঠি যাবে ছোটদা, কুন কথা কইবেনি। আমি কাঁদি মরি, এক গরাস ভাত সেদিন আমার মুখে উঠবেনি।

সংগীতা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যি তুমি এমন করে কুন্তীদির মনে দঃুখ দিয়েছ?

হেসে বললাম, তিন ভাই ওকে জ্বালিয়েই তো আনন্দ পেয়েছি, তাই কুন্তীদি আজও আমাদের কাছে এত প্রিয়।

গোষ্ঠদাকে শৈল ক্ষেত থেকে ডেকে নিয়ে এল। উঠোনে উবু হয়ে বসে হাত জোড় করে প্রণামের সে কি ঘটা!

এ কি রকম হলো গোষ্ঠদা? তুমি হলে কুন্তীদির বর, তোমার তো প্রণাম করার কথা নয়।

গোষ্ঠদা জিভ কেটে বলল, সে কি হয় ভাই! শিবদুর্গা আসসেন বাড়িতে,

পেন্নাম করব না ! এ তো পূণ্যি গো, গেরস্তের কল্যেণ।

বললাম, গোষ্ঠদা, তোমার কাঁধে চেপে কত ঘুরেছি। তুমি কত বাতাসা আর গজা কিনে খাইয়েছ।

গোষ্ঠদা দুঃখ করে বলল, আর মায়ের চরণদর্শন করতে যেতে পারিনি, সে কি কম দুঃখু গো ! মাজায় বেদনা, হাঁটি পারব কেনি।

তুমি ক্ষেতের কাজ কর কি করে ?

মিছা কাজ ভাই। জন খাটে, আমি বুসি রই।

মার কাছে একবারটি তো তোমাকে যেতে হবে গোষ্ঠদা। শৈলর বিয়েটা সেরে একেবারে ফিরবে।

কুন্তীর মুখে সব শুনিছি দাদা। তুমাদের মেয়ে তুমরা যা ভাল বুঝব কর।

তবু বিয়ের সময় তোমার আর কুন্তীদির থাকা দরকার।

দেখব দাদা, যদি বুসি বুসি চলতে পারি।

শৈল হাওয়া। বিয়ের কথা কানে যেতেই সে ভেগেছে।

কুন্তীদি বলল, তুমার কাছে বিয়ের সম্বন্ধটা শুনি আমি শৈলকে কই। সে ত দাদা কাঁদিকাটি সারা। তার ঠাকুমাকে ছাড়ি সে কুন জায়গায় যাবেনি। শেষকালে কালাচাঁদের কথা কইতে একটু নরম হিছে।

সংগীতা হেসে বলল, কালাচাঁদকে ওর অপছন্দ নয়। তাছাড়া কালাচাঁদের ঘরের বউ হলে ওর ঠাকুমার সংগে তো প্রায়ই দেখা হতে পারে।

ইতিমধ্যে শৈল ফিরেছে। সংগীতাকে ও ঘরের ভেতর ধরে নিয়ে গেল। এক পলকে দেখতে পেলাম গণ্ডা কয়েক ঘোমটা দেওয়া বউ খিড়কী দিয়ে ঢুকে পড়েছে কুন্তীদির ঘরে। শহরের বউ দেখবে তাই হুড়োহুড়ি।

কিছুক্ষণের ভেতর আমার জন্যে মুড়ি এল। সঙ্গে ডিমের ভাজা।

কুন্তীদি একসময় ঘরের ভেতর থেকে এসে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, নতুন বউ ডিমভাজা খেতে চাইলনি। গুড়-মুড়ি, দুধকলা মাখি ফলার করছে। আমি ত জানি, ছোটদা আমার দুধের ভক্ত নয়। হাঁ গো দাদা, টবুনায় জাল ফেলি কটা মুরাল মাছ ধরা হিছে, ভাজি দি খাও, মনে বড় শান্তি পাব।

মৌরলা মাছের লোভ দেখাচ্ছ, তাহলে তো খেতে হয় কুন্তীদি।

অবশেষে প্রায় আধবাটি মুচমুচে ভাজা মৌরলা মাছ খাওয়া হলো। ডিমভরা মৌরলা মাছ।

কাছারিবাড়িতে ফেরার সময় সে এক কাণ্ড। চাষীপাড়ার মেয়েরা যে যার বাড়ি থেকে পেঁপে, সপেদা, কলা, ডিম এনে একটা প্যালা সাজাল। তারপর আমাদের যে পথ দেখিয়ে এনেছিল, সেই কুনিকে দিয়ে আমাদের সঙ্গে কাছারিবাড়িতে পাঠিয়ে দিলে।

পুরুষরা প্রায় সকলেই মাঠের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা ঘোমটায় মুখ ঢেকে আমাদের এগিয়ে দিতে এল বড় রাস্তা অব্দি। এইসব ঘরের অনেক

মেয়ে-পুরুষই আমাদের দেশের বাড়িতে একসময় কাজ করে এসেছে। পুরুষানুক্রমে কাজকর্ম করেছে। পারিশ্রমিক হিসেবে এখানকার জমিজায়গা পেয়েছে। তাদের ভেতর কজন বুড়োবুড়ির সঙ্গে আলাপ করে ভারী ভাল লাগল। ঠাকুর্দা, ঠাকুরমাদের আমলের অনেক আচার-আচরণের কথাই জানা গেল।

মায়ের কাছে একসময় কাজ করতে গিয়েছিল দুটি মেয়ে। মা তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলে। বাস, তাদের জীবনে হিল্লে হয়ে গেল। এখন পাশটাস করে চাকুরে বর পেয়ে জমিয়ে সংসার করছে।

কেবল শৈলর কাছে হার মেনে গেছে আমার মা। স্লেট ভেঙেছে পাঁচখানা, বিদ্যাসাগরের কতগুলো বর্ণ-পরিচয়ের যে দফারফা করেছে তার হিসেব নেই।

এদিকে বঁড়শী নিয়ে পাকা মেছুনির মতো বসে যাবে মাছ ধরতে। কোন কাঁটায় ট্যাংরা-পুঁটি উঠবে, কোন কাঁটায় কই-ল্যাঠা, তা ওর নখদর্পণে। পুকুরের ধারে বঁড়শী পুঁতে ঘুরঘুরে পোকা গেঁথে দেবে কাঁটায়। জলের ওপর সে পোকা ঘুরতে থাকবে, অমনি লোভী শোলশাল কপ করে কাঁটাসমেত গিলে ফেলবে তাকে। জলের ঘাই শুনেই বুঝবে শৈল, মাছ গেঁথেছে বঁড়শীতে। অমনি কাজ ফেলে ছুটবে সেখানে।

কোথায় রামধনু রঙের টিকপোকা পাওয়া যায়, সে সন্ধান তার নখদর্পণে। পোকার পাখায় তৈরি হবে টিপ। কোঠাবাড়ির কোন খোঁদলে পায়রা কটা ডিম পেড়েছে, তাও তার গুনে দেখা হয়ে গেছে জানালার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে।

নিচ থেকে কখনো বা চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে আসবে, ঠাকুমা, সব্বোনাশ হই যাইছে।

কি সর্বনাশ রে ?—মা আতঙ্কিত।

আমি নিজের চোখে কাল তিনটা কাঁঠাল গাছে ঝুলতে দেখছি, আজ মোটে একটা ঝুলছে।

কাঁঠাল চুরির ব্যাপারে মা হয়ত দুঃখিত হলো, কিন্তু গভীর স্বস্তি লাভ করল কোনোরকমের সর্বনাশ হয়নি বলে।

মা যখন শৈলর পড়াশোনার ব্যাপারে খুব তাড়া লাগাচ্ছিল আর সে মাঠে-ঘাটে বনবাদাড়ে আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন আমি একদিন মাকে বললাম, ছেড়ে দাও মা ওকে, সবার তো আর লেখাপড়ার মাথা থাকে না।

মা ক্ষেপে উঠল, তুই বলছিস ? অন্য দিকে তো দিব্যি মাথা খেলছে।

যেখানে ওর খেলা সেখানেই ওর মাথা খেলে মা। ঐ ইকড়ি মিকড়ি অক্ষরের গোলকধাঁধায় ও একেবারেই মাথা ঢোকাতে পারে না।

মা আর দাদা দুজনের স্বভাবই এক। পড়তে পড়তে কেউ পড়া বন্ধ করলেই তার পেছনে লেগে গেল। বই দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাইনে যুগিয়ে।

যাক্, অবশেষে শৈল পড়ার ভীতি থেকে মুক্তি পেল। মা তাকে রোজ বিকেলে গল্প শোনাতে লাগল। এতে তার অসীম আগ্রহ।

আমার বিজ্ঞানসাধক ও প্রচারক বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী আমার মাকে মা বলে ডাকেন। মায়ের নামে একটি বইও তিনি উৎসর্গ করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহাকাশ সম্বন্ধে মায়ের কাছে তিনি নানা তথ্য পরিবেশন করেন। তাঁর মতে মা নাকি এক দুর্লভ শ্রোতা। তাঁর প্রতিটি প্রশ্নই বিজ্ঞানমনস্ক।

আমার সেই মায়ের সঙ্গে কলকাতার বাসায় এসেছে শৈল। সে লক্ষ্য করেছে, কাকুর মতো একটি মানুষ ক্রমাগত তার ঠাকুরমাকে কি সব বলে যাচ্ছে। আর তার ঠাকুমার মতো এমন রাশভারী একজন লোক হাঁ করে গিলছে সে সব কথা।

একদিন মায়ের সঙ্গে ভোরবেলা ছাদে উঠেছে শৈল। প্রভাতসূর্য, একজনের বাড়ির ছাদের আড়াল থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল।

সেদিকে শৈল চেয়ে আছে দেখে মা বলল, ঐ যে দেখিস সূর্যটা সকালে পূব দিকে উঠেছে, আর মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যায় উল্টোদিকে ডুবছে, ওটা ঠিক নয়।

উত্তেজিত হলো শৈল, কিরকম ? আমি নিজের চোখে প্রত্যেক দিন দেখি, সুয্যিঠাকুর আকাশ দিয়া চলছেন।

মা শান্ত গলায় হেসে বলল, নারে, এসব আমাদের ভুল ধারণা। আমরা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারদিকে ঘুরছি, তাই এরকম মনে হয়। সূর্য কিন্তু ওরকম হেঁটে বেড়াচ্ছে না।

লেখাপড়ার বিষয়ে ঠাকুমার কথা শুনুক আর না শুনুক, তার বুদ্ধির ওপর গভীর একটা বিশ্বাস ছিল শৈলর। এক নিমেষে সে বিশ্বাস ভেঙে গেল। সে অত্যন্ত ক্ষোভের সুরে বলল, ঐ লোকটি তুমার মাথা এক্কেবারে খারাপ করি দিছে। তুমি ত কুনদিন এরকম বোকা ছিলনি।

গ্রামের লোকদের একদিন ভোজ দেওয়া হলো। সামনের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সারি সারি পাতা পড়ছে প্রশস্ত উঠোনে।

আমি কাকাকে বললাম, এখানে গান্ধীজীর আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল। চাষী, বাগ্দী মেয়ে-পুরুষ সকলেই নাকি যোগ দিয়েছিল সে আন্দোলনে। যারা একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, তারা গায়ে গা লাগিয়ে এক পঙ্ক্তিতে খাক না।

ছোট কাকা বলল, জাতের ব্যাপারে অদের্শের কথা কেউ শুনবে বলে মনে হয় না। তবে তুই চেষ্টা করে দেখতে পারিস।

পাতা একসঙ্গেই পড়ল কিছু কার্যকালে ফল দাঁড়াল বিপরীত। ধোপা নাপিত দু-ঘর আলাদা দাঁড়িয়ে গেল। জেলে কৈবর্ত আর হেলে কৈবর্ত নিজেদের দল নিয়ে তফাতে দাঁড়াল। তেঁতুলে বাগ্দীরা স্বতন্ত্র হয়ে গেল অন্য বাগ্দীদের থেকে। পুরোহিতমশায় বললেন, শুনেছি বৌমা কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে। উনি যদি নিজের হাতে কখানা লুচি আর বেগুন ভেজে দেন তাহলে এই কাছারির দাওয়ায় বসেই আমি সানন্দে মধ্যাহ্নভোজটা সেরে নিতে পারি।

জাতপাতের ওপর স্বামীজীর কশাঘাত, গান্ধীজীর আজীবন সংগ্রাম, রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী, সবই সেই মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে গেল। মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেও আমি নিমন্ত্রিত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে ভোজ-সভাটা ভণ্ডুল করে দিতে পারলাম না। বরং সবিনয়ে বললাম, ভুল হয়ে গেছে ভাই, তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা কর, আমরা এখুনি পাকা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ভোজের আসরের এখান ওখান থেকে কয়েকখানা করে পাতা সরিয়ে নিলাম। ঐ একটু তফাত, তাতেই কাজ হয়ে গেল। রক্ষা পেল সনাতন হিন্দুধর্মের তথাকথিত জাত-মাহাত্ম্য।

চাষী জেলে বাগ্‌দী একই নৌকোয় বেরিয়ে গাঙ থেকে মাছ তুলে আনে। একই সঙ্গে সব জাতের লোক ফসল ফলিয়ে মাঠ থেকে তা খামারে তোলে। কিন্তু এক পাতে নয়, এক পঙ্‌ক্তিতে আসর পাতলে ভোজের আসরে বসবে না।

মনে মনে ভাবলাম, দমলে চলবে না, নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে ভাঙতে হবে এই প্রস্তরকঠিন অচলায়তন।

পুরোহিতমশায় পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছিলেন। ময়রার তৈরি মেঠাই আর গোয়ালার তৈরি দধিগ্রহণে তিনি বিন্দুমাত্র আপত্তির কারণ দেখাননি।

আমাদের মিলনমেলা ভাঙার সময়টি আসন্ন হলো। প্রথমেই পিসিমা চলে গেল তার স্কুলে। দু-দিন পরেই ছোট পিসির শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে পত্র এল, মা, তুমি চলে যাওয়াতে চারদিক একেবারে অগোছাল হয়ে পড়েছে। তোমার বুড়ো ছেলেটা কোনোদিক সামলাতে পারছে না। পত্রবাহকের মারফৎ চিরকুট দিও, কবে আমার মাকে আনতে নৌকো যাবে।

ছোট পিসির অনাবিল স্বভাবের ভেতর একটা প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে। প্রথম বউ হয়ে যাবার পরেই শ্বশুরবাড়ির সকলের মনোহরণ করেছিল। আজও সেই মহিমা তার অটুট রয়েছে।

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছোট পিসির এই শ্বশুরমশায়টি। অতি সামান্য অবস্থা থেকে তিনি আপন অধ্যবসায় ও শ্রমে বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েছেন। গঞ্জে তাঁর একাধিক বস্ত্র ও বাসন-কোসনের দোকান। ধানের বিরাট আড়তদার। চারখানা মহাজনী নৌকো মাল বোঝাই নিয়ে নদী আর বাহার গাঙ চষে বেড়াচ্ছে। একটা দূরপাল্লার বাস সার্ভিস কোম্পানীতে রয়েছে তাঁর অনেকগুলি শেয়ার। তাছাড়া আছে সুদের কারবার। মা লক্ষ্মীর চঞ্চলা নামটি পাল্‌টে তিনি তাঁর নতুন নামকরণ করেছেন, অচলা।

টাকাপয়সার ব্যাপারে মানুষটি একেবারে নির্দয়। সুদের পাই-পয়সা গলায় গামছা দিয়ে আদায় করতে তিনি ওস্তাদ। মানুষের অভাবের সময় তিনি ধান দাদন দেন কিন্তু ফসল উঠলেই আদায় করে নেন দ্বিগুণ দেড়েমুশে। অসহায় চাষী হাতে-পায়ে ধরলেও ছাড় নেই।

পাষণ্ড, কিপ্‌টে, নানা বিশেষণে লোকে তাঁকে ভূষিত করে কিন্তু সে সব কথায় তাঁর ভ্রূক্ষেপই নেই। কোনোদিন তাঁকে কেউ দশ হাত ধুতি পরতে

দেখেনি। দুটি মাত্র ফতুয়া সম্বল করে অবলীলায় তিনি দু-বছরের বেশী কাটিয়ে দেন। অনেকগুলি পুকুর, রোহিত মৎস্যের বেশ ভালই চাষ হয়েছে কিন্তু একটিও ধরে খাবার উপায় নেই। ধরা হলেই চালান যাবে মহকুমা অথবা জেলা শহরের বাজারগুলোতে।

একবার একমাত্র পুত্র পিতার অগোচরে রাত্রিকালে একটি মৎস্য শিকার করে বন্ধুবান্ধবসহ ভক্ষণ করেছিল। কথাটি অপ্রকাশিত থাকেনি। পিতা পুত্রকে এজন্য কঠিন সাজা না দিয়ে দ্বাদশ দিবস মাত্র নিরামিষ ভক্ষণে বাধ্য করেছিলেন।

এ হেন মানুষ আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন একদিন।

একটি অনাথ কিশোরী কাজ করত ছোট পিসিদের গোয়ালে। মেয়েটি ছোট হলে কি হবে, কাজকর্ম তার ভারী নিখুঁত। গোয়ালটিকে সে ঝকঝকে তকতকে করে রেখে দিত। বালতি বালতি জল এনে ঘষে-মেজে গা ধুইয়ে দিত গরুগুলোর। একটি লোক রোজ আসত গরু দোয়াতে। গরু দোয়ানো শেষ হলে মেয়েটি দুধের বালতিটি নিয়ে সোজা চলে যেত কাছারিঘরে, যেখানে কর্তা বসে বসে টাকার হিসাব করতেন।

ভোরবেলা বক্সীরা কেউ আসত না, একাই বসে বসে কাজ করতেন কর্তা। মেয়েটি একগাল হাসি হেসে দুধের পাত্রটি উঁচু করে ধরত আর কর্তা-মশায় চশমাটা কপালে তুলে দেখতেন সেদিনের দুধের পরিমাণ। শেষে তিনিও মুচকি হেসে মাথা দোলাতেন। মেয়েটির গুছনো কাজের জন্য তার ওপর ধীরে ধীরে একটা মমতা পড়ে গিয়েছিল কর্তার।

কোনোদিন কাজে বেরিয়ে যাবার সময় হয়ত কর্তামশায়ের চোখে পড়ত, মেয়েটি কোনো একটি গাভীর গলা জড়িয়ে আদর করছে। আপনমনে তার সঙ্গে বকবক করছে। অমনি দাঁড়িয়ে যেতেন। ভারী ভাল লাগত তাঁর দৃশ্যটি।

ধীরে ধীরে মেয়েটি বড় হলো। পিসিমার চেষ্টায় পাশের গাঁয়ে বিয়েও হয়ে গেল তার। কিন্তু মেয়েটি ভুলতে পারল না গোয়ালে তার গরুগুলোর কথা। সে প্রতিদিন এসে গোয়ালের কাজটা সেরে দিয়ে যেত।

একটা গরু গাভীন হয়েছিল, আর তার সঙ্গেই আজকাল মেয়েটা কথা বলত বেশি। পিসিমা জানতে পেরেছিল মেয়েটাও মা হতে চলেছে।

পিসিমার শ্বশুরমশায়কে রোজই কিন্তু আগের মতো দুধের বালতি দেখিয়ে যেত মেয়েটা। সেই আগের মতো একমুখ হাসত। কর্তামশায়ও মাথা ঝুঁকে ঝুঁকে মুচকি মুচকি হাসতেন।

যে গরুটা গাভীন ছিল তার একটা ফুটফুটে বাছুর হলো। পাটল রঙের বাছুরটি। কপালে চাঁদের টিপ।

কাজ যেন একদিনেই বেড়ে গেল মেয়েটার। প্রসূতি গরুটার সেবাযত্ন তো আছেই, তার ওপর বাছুরটাকে ঘিরে আদর যেন আর থামতেই চায় না।

কর্তামশায় বেরিয়ে যাবার পথে এ দৃশ্য দেখেন আর মাথা নেড়ে নেড়ে তেমনি মুচকি মুচকি হাসেন।

মাস দুয়েক পরে এক সন্ধ্যায় কাছারিবাড়িতে হেরিকেন জেবলে কর্তা হিসেব কষছিলেন, এমন সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক মাথা চাপড়ে কর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কর্তামশায় তাকিয়ে যুবকটিকে চিনতে পারলেন।

কি ব্যাপার, এমন করছ কেন ?

আজ্ঞা বাবুমশায়, সুশীলা সেই সকাল থেকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে, বাচ্চা হচ্ছে না।

ধাই আসেনি ?

আজ্ঞা সে কিছু করতে পারতিছে না।

ছোট পিসির কানে গেছে কথাটা। ছুটে এসেছে কাছারিতে।

বাবা; আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে।

অন্য কারু ব্যাপার হলে বাধা দিতেন কর্তা কিন্তু অসহায় মেয়েটার যন্ত্রণার কথা ভেবে কোনোরকম বাধা দিলেন না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

ছোট পিসি বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ পেছন থেকে কর্তা বলে উঠলেন, যদি তেমন দরকার পড়ে তাহলে ওরা যেন মেয়েটাকে আমার পান্‌সীতে করে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পিসি বলল, সে কি এখানে বাবা। সারারাত চলবে, তার পরের দিন দশটার আগে পৌছবে না। ততক্ষণ মেয়েটাকে কি যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচান যাবে!

তুমি যেমন বুঝবে তেমন কর মা।

ছোট পিসি যথাস্থানে পেঁছে মেয়েটির কষ্ট দেখতে পারল না। গ্রামের লোকজনের সঙ্গে তাকে নৌকো করে সদর হাসপাতালের পথে রওনা করিয়ে দিয়ে এল।

ভোরবেলা খবর এল, নৌকো প্রসূতিকে নিয়ে ফিরে এসেছে। মাঝরাতে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি চিরতরে চোখ বুজেছে।

একটা শোকের প্রবাহ বয়ে গেল সারা বাড়িতে। কর্তামশায় কাছারির জরুরী সব কাজ ফেলে উঠে গেলেন ঘরের মধ্যে। নিজের ছোট্ট কুঠরীতে ঢুকে বসে রইলেন মাথা নিচু করে। মনে হলো, এ অপরাধ যেন তাঁরই। তিনি হয়ত কিছু করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।

একসময় মাথা সোজা করে ডাকলেন, মা, একবার শুনে যাও তো এখানে।

বড় করুণ শোনাল সে ডাক। ছোট পিসি ছুটে এল।

পিসির দিকে তাকিয়ে কর্তামশায় বললেন, আমাদের বাড়ির এই কটি প্রাণীর সারাবছর খাওয়া-পরা আর আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা বাবদ যা লাগে তা মরাইয়ের ধান থেকেই তো উঠে আসে ?

হ্যাঁ বাবা, বরং কিছু উদ্বৃত্ত হয়।

মা, সারাজীবন আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে টাকা জমিয়েছি তা যদি তোমাদের জন্য না রেখে যাই তাহলে কি কিছু মনে করবে তোমরা ?

এ কথা কেন বলছেন বাবা ? সবকিছুই তো আপনি নিজের পরিশ্রমে করেছেন। আপনার ইচ্ছের ওপরে কার কি বলার থাকতে পারে !

সামান্য সময় মাথা নিচু করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, আমি আমার সারা জীবনের সঞ্চিত টাকায় এই গ্রামে একটা প্রসূতি সদন করে দিতে চাই।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধের বুক থেকে। বললেন, মেয়েটা চলে গেল কিন্তু সে-ই খুলে দিয়ে গেল আমার বন্ধ দুটো চোখ।

সুন্দর একটি প্রসূতি সদন তৈরি হয়েছে পিসিদের পুকুরের পাড়ে। পাশ-করা ধাত্রী আর নার্স পরিচ্ছন্ন পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। একজন ডাক্তার রয়েছেন সেখানে। দূর-দূরান্তের সন্তানসম্ভবারা আসছে সেখানে। সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুদের চীৎকারে ভরে উঠছে প্রাঙ্গণ। নতুন জেগে-ওঠা গাছপালায়, ফুলেফলে একটা আনন্দ-ভবন যেন। ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম মেম্বার করে রাখা হয়েছে ছোট পিসিকে। বৃদ্ধ শ্বশুরমশায় সাতাশি বছর বয়সে এখনো সুস্থ, তবে আজকাল আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন ছোট পিসির ওপর।

শ্বশুরমশায়ের চিঠি পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল ছোট পিসি। সংগীতার মুখখানা নিজের দুটি হাতের পাতায় তুলে ধরে বলল, খুব সুন্দর পছন্দ আছে আমাদের হাবলুবাবুর। তোমরা কদিন পরেই চলে যাচ্ছ, নইলে এই নৌকোতেই তুলে নিয়ে যেতাম তোমাদের। মন ভরে দেখা হলো না, কথা বলা হলো না। তবু ভারী আনন্দ হলো তোমাকে দেখে মা।

ছোট পিসি আর চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের জন্য অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়ল দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। আমি আর সংগীতা তার সংগে সংগে চললাম খেয়াঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

খেয়াঘাটের একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। তার তলায় একটা ছোট্ট পালাঘর। দুটো বাঁশ পুঁতে দড়ি টাঙানো হয়েছে সামনের চরে। দড়িতে শুকতে দেওয়া হয়েছে একটা শাড়ি।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথমত কোনো আস্তানার চিহ্নমাত্র ছিল না তেঁতুল গাছের তলায়। হঠাৎ অস্থানে গজিয়ে উঠল কি কারণে! তার ওপর দড়িতে যে শাড়িটা ঝুলছে সেটা চোখে পড়ার মতো।

ছোট পিসিকে বললাম, অনেক দিন পরে এ জায়গাটাতে এলাম। ও পালাঘরটা কার ?

হেসে বলল ছোট পিসি, তোর বউয়ের।

আমি সংগে সংগে তার মুখের দিকে তাকালাম। ও ছোট পিসির কথায় কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে।

বললাম, না না, ওটা তোমার বাড়ি নয়। আমার ছোটবেলার এক সঙ্গিনীর বাড়ি। ওকে বউ বলে ডাকতাম। ছোট পিসিকে নৌকোয় তুলে দিয়ে একবার যাব ওখানে।

হাঁ হাঁ করে উঠল ছোট পিসি, তুই বউমাকে নিয়ে ওখানে যাবি! জানিস

মেয়েটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

বললাম, তাই বুঝি?

পিসি বলল, ও একাই তো ওখানে থাকে।

চালডালের ব্যবস্থা কি করে হয়?

ওর মতো মেয়ের ওসব জিনিসের অভাব হবার কথা নয়।

মনটা মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে ছোট পিসিকে নৌকোয় তুলে দিলাম। বিদায় পর্বে ছোট পিসির চোখ ছলছল করে উঠল। নদীর বাঁকে নৌকোটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ছোট পিসি আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

এখন নদীতীরে আমরা দুজন। বড় একটা মাঠের ওপারে সবুজ গাছ-পালার ভেতর দিয়ে আমাদের কাছারিবাড়িটা দেখা যাচ্ছিল।

বললাম, চল বাড়ি ফেরা যাক।

ও কৌতুকের হাসিতে মুখখানা ভরে তুলে বলল, বউয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?

আমি বললাম, এ অবস্থায় ওর সঙ্গে দেখা না করাই ভাল।

সঙ্গীতা ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবেই নিল, কি হয়েছে তাতে, একটি মেয়ে যেমনি হোক, তার সঙ্গে দেখা করতে বাধাটা কোথায়? তোমার আমার অন্তত কোনোরকম সংস্কার থাকার কথা নয়।

তবে চল যাই।

আমরা তেঁতুলতলার ঐ পালাঘরের দিকে এগিয়ে চললাম।

অলি বোধহয় আগেই তার পালাঘরের ঝোরকা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু একেবারেই আমাকে চিনতে পারেনি। সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে আমাদের দেখতে লাগল। সেই প্রথম কৈশোরে দুজনের দেখা। তারপর এক যুগেরও বেশী আমাদের ছাড়াছাড়ি। এই দেহের ওপর দিয়ে বিশ্বকর্মার কত গড়নপেটনই না হয়ে গেছে। হঠাৎ করে চিনতে পারাটাই বরং অস্বাভাবিক। পিসি বলে না দিলে আমিও কি চিনতে পারতাম অলিকে।

আমরা দুজন ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। ও ঘাড়টা কাৎ করে থুতনিতে বাঁ হাতের ঠেকো দিয়ে দাঁড়াল।

সেই ঋজু গড়ন, শ্যামলা রঙের দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি। এখন সামনে বয়ে-চলা বরোজ নদীর মতো যৌবনের স্রোত বইছে ওর সারা অঙ্গে।

বললাম, চিনতে পার আমাকে?

ওর চোখ যেন আরও সন্ধানী হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিষ্প্রভ চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, সে আমাকে একেবারেই চিনতে পারছে না।

বললাম, কাছারিবাড়ির একটা ছেলে তোমাকে ছোটবেলায় 'বউ' বলে ডাকত, তাকে মনে পড়ে?

ওর চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ও কোনো কথা না বলে ছুটল ঐ পালাঘরের ভেতর। নারকেল পাতার দুখানা চাটাই এনে বিছিয়ে দিল তেঁতুল

গাছের তলায়।

হেসে বলল, বর বউ দুজনে এসেছ, বস এখানে, তোমাদের ভাল করে দেখি।

ওর চোখ দুটো এখন আবেগে কাঁপছে।

তুমি কি করে আমার এ ডেরাটুকুর হদিস পেলে ছোটবাবু?

আমার নতুন বউকে নিয়ে ছোট পিসিকে নৌকোয় তুলতে এসেছিলাম নদীর ঘাটে। পিসির মুখেই শুনলাম, তুমি এখানেই থাক।

ওর মুখখানার ওপর হঠাৎ মেঘের একটা ছায়া এসে পড়ল। পরক্ষণেই মেঘ সরে গিয়ে ফুটে উঠল ম্লান আলোর একটা ঝলক।

অনেক কথাও নিশ্চয়ই শুনেছ ছোট পিসির মুখে?

আমি কি উত্তর দেব ওর কথার! বললাম, এখানে কোনো ঝোপড়ি ছিল না আগে, তাই এটা কার ঘর জিজ্ঞেস করতেই পিসি তোমার নাম করল। আর সময় ছিল না বলে মাঝি জোয়ারে ঠেলে দিল নৌকো। পিসিও চলে গেল।

ভাগ্যিস আর কোনো কথা হয়নি, নইলে নতুন বউকে নিয়ে এ পালাঘরে আসতে না আমার খোঁজে!

সংগীতা বলল, সে কথা কেন বলছ ভাই! তুমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। ছোটবেলার খেলার সাথীকে কেউ কি কখনো ভোলে!

অলি সংগীতার হাতখানা ধরে ফেলল, তুমি বলছ বউদি!

সত্যি কথাই বলছি ভাই।

ছলছল করে উঠল অলির চোখ, মুখে একটুকরো হাসি, বৃষ্টিভেজা নরম আলোর মতো।

আমি বললাম, ছেলেবেলায় অলি কিন্তু ভীষণ ডানপিটে ছিল।

কিরকম?—অলি যেন জানতে চাইল তার ছেলেবেলার দস্যুবৃত্তির কথা।

বললাম, ছেলেবেলায় তুমি গরু চরাতে যেতে আর সারা দিনভর ডাং-গুলি খেলতে ছেলেদের সঙ্গে।

অলি প্রতিবাদের সুরে বলল, তাতে কি হয়েছে বউদি? মেয়েরা কি ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পারে না?

সংগীতা বলল, নিশ্চয়ই পারে। যার মনের জোর আছে সে পারে, যার নেই সে পারে না।

বলল, এই টো টো করে ঘোরা আর খেলার জন্য তোমাকে তোমার জ্যেঠার হাতে মার খেতে হয়নি?

অলি হাসতে হাসতে বলল, বড্ড রাগী ছিল আমার জ্যেঠা। একদিন গরু চরাতে এসে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ছেলেদের সঙ্গে সন্ধ্যে অব্দি ডাং-গুলি খেলেছিলাম। জ্যেঠা ঘরে ফিরে আসতেই জ্যেঠি কথাটা তার কানে তুলে দিল। রাগে ক্ষেপে গিয়ে অমনি জ্যেঠা গরু চরানোর মাঠ থেকে আমাকে খুঁজে বের করল। চুলের মুঠি ধরে সেই যে শূন্যে তুলল, তারপর একেবারে আছড়ে

ফেলে দিল উঠোনে।

সংগীতা বলল, তোমার মা-বাবা নেই?

ছোটবেলায় কবে মা মরেছে আমি জানিই না। বাবা গিরিবাবুদের নৌকোয় চড়ে সোঁদরবনে মাটি কাটতে যেত। মাঝে মধ্যে এসে দশ-বিশ টাকা গুঁজে দিয়ে যেত জ্যেঠার হাতে। আমার সঙ্গে বাবার এইটুকু সম্পর্ক, ব্যস।

সংগীতা বলল, এখন তোমার বাবা কোথায় আছে?

সে বেত্তান্ত জানিনে বউদি। কেউ কেউ বলে বেঁচে আছে। মনসাদ্বীপে না কোথায় যেন আর এক মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘর করছে।

ও প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, জান তো সংগীতা, ভারী জেদি এই মেয়েটা।

অলি অমনি বলল, কি জেদ আমি দেখিয়েছি তোমাদের ওপর তাই বল ছোটবাবু?

সেই আম পাড়ার কথাটা তাহলে শোনাই অলি।

আমি একটুও মনে আনতে পারছি না ছোটবাবু। তোমার মুখে শুনলে হয়ত মনে পড়ে যাবে।

আমি আর অলি এক দুপুরে বড় পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পুকুরের পুব পাড়ে আমের বাগান। গরমের দিন, আম ফলেছে গাছে। কিন্তু আমার লক্ষ্য আমের দিকে ছিল না। আমবাগানের শীতল ছায়ায় যে ঘুঘু পাখি দুটি বসে বসে আলাপ করছিল তাদের অন্তত একটিকে আমার গুলতির আওতায় আনার চেষ্টা করছিলাম। যখন গুলতিতে মাটির শুকনো মার্বেল পুরে তাক্ করবার জন্য তুলেছি তখন হঠাৎ অলি হাততালি দিয়ে ওদের উড়িয়ে দিলে।

মনে আছে ছোটবাবু, সেদিন ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে তুমি আমার মাথায় একটি চাঁটি মেরেছিলে।

তুমি কিন্তু চাঁটি খেয়েও কাঁদনি অলি।

আমাকে কেউ কোনোদিন মার খেয়ে কাঁদতে দেখেনি।

সংগীতা বলল, খুব সহ্যশক্তি তোমার।

না, বৌদি, একে তো মার খাবার লজ্জা, তার ওপর কাঁদার লজ্জা, তাই দাঁত চেপে সহ্য করে যেতাম।

বললাম, শোন তাহলে ওর কীর্তি। আমার চাঁটি খেয়ে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পাড়তে পারবে একটা আম তোমার গুলতি ছুঁড়ে? তাহলেই বুঝব তুমি কত দরের শিকারী!

আমি বললাম, পেড়ে দেব গুলতি ছুঁড়ে তবে যেখানে পড়বে সেখান থেকে তুলে আনতে হবে।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই তুলে আনব।

পুকুরের ধারে ঝুঁকেছিল আমগাছের একটা ফলভরা ডাল। আমি হলদে রঙধরা একটা আমের বোঁটা লক্ষ্য করে গুলতি চালালাম। টুপ করে আমটা

খসে পড়ল জলে। বললাম, তোল এবার আম।

ও চুপচাপ সেদিকে তাকিয়ে বসে রইল দেখে আমি বললাম, দেব আর একটা রামগাঁট্টা।

কথাটা বলেই আমি চলে গেলাম বাড়ির ভেতর। ও কিন্তু ঠায় জলের দিকে তাকিয়ে সেখানেই বসে রইল।

আমি ঘরে ঢুকে শুনলাম, ঠাকুমা সুর করে বিনন্দ রাখালের কাহিনী পড়ছে। আমি ঠাকুমার পাশে মাদুরে শুয়ে পড়লাম। বালিশে বুক চেপে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম উত্তরের ধু ধু মাঠ, মাঠের শেষে এই নদীটাকে।

গরমের দিনে মিহি শুকনো একরকমের ধুলো উড়তে থাকে। তার ওপর সূর্যকিরণ পড়লে মনে হয়, ঠিক কাচের মতো স্বচ্ছ আলোর ঘোড়ায় চেপে হু হু করে ঘোড়সওয়ারেরা ছুটে চলেছে। আমার মনে হলো, যেন বর্গী দস্যুরা মাঠ পেরিয়ে আমার কাছারি বাড়িতে এখুনি ঢুকে পড়বে।

আমি তাড়াতাড়ি উত্তরের জানালাটা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়াতেই দেখি, দরজার চৌকাঠের তলায় একটা হলদে পাকা আম পড়ে আছে। আমি ছুটে গিয়ে আমটা কুড়িয়ে নিলাম কিন্তু যে চুপি চুপি আমটি রেখে পালিয়েছে, তার দেখা পেলাম না।

সঙ্গীতা বলে উঠল, সেদিন কিন্তু তোমার বউ তোমাকে হারিয়ে দিয়েছিল।

সে কি হাসি অলির। হেসে গড়িয়ে পড়ে আরকি, তুমিও বউদি আমাকে ঐ নামে ডাকছ?

বললাম, ঐ ছোট পিসিই আমাকে খুব ছোটবেলায় ওকে বউ ডাকতে শিখিয়েছিল। ওর ছোট একটা খেলনার হাঁড়ি আর একটা কড়া ছিল। একদিন ও ওটাতেই মাটি আর ঘাস পাতার ভাত তরকারি রান্না করল। আমি বাঁশের লাঠির ঘোড়ায় চড়ে কঞ্চির চাবুক দিয়ে তাকে পিটিয়ে পিটিয়ে সারা পুকুর দুবার চক্কর মেরে ঘুরে আসতেই ও গিন্নির মতো কোমরে হাত ঠেকিয়ে বলল, সারাদিন ঘোড়া ছোটালেই চলবে, খেতেটেতে হবে না?

আমি ঘোড়া থেকে নেমে গায়ের ঘাম মুছে, হাত ধুয়ে ওর বিছানো বট পাতার পিঁড়িতে বসলাম। ও পাতায় ভাত বেড়ে আনল।

আমি মুখে ওর রান্না তরকারি তুলে বললাম, নুন কম হয়েছে, নুন দে অলি।

অমনি ছোট পিসি সোনামুখি ডাব গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বলল, 'অলি' কি রে, 'বউ' বলে ডাকবি। আমি সেদিন ছোট পিসির কথাটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলাম। সেই থেকে ওকে বউ বলে ডাকতাম। কিন্তু তখন বুঝিনি, পিসি সেদিন গম্ভীর গলায় বললেও, মস্ত একটা কৌতুকের হাসি লুকিয়ে রেখেছিল বুকের মধ্যে।

সঙ্গীতা অলির দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যিই তুমি জেদি ছিলে। কিন্তু পুকুরের ভেতর থেকে সেদিন আমটিকে খুঁজে আনলে কি করে গো?

ছোটবাবু যেই কাছারিতে ঢুকল অমনি আমি নেমে পড়লাম জলে। ছোট-

বাবুকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে তোমাদের ঐ সামনের পুকুরটা কত গভীর। আমি পাঁচ সাতবার ডুব দেবার পর আমটা পেয়ে গেলাম।

সংগীতা বলল, সত্যি, শুধু তোমার জেদ নয়, সাহসও আছে বলতে হয়।

বললাম, ওর সাহসের একটা খবর তাহলে বলি, সে ওর ঐ কিশোরী বয়সেরই কথা। আমি তখন আমার গুলতি ছুঁড়ে বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছি। ঝিলের ধারে যে বড় বটগাছটা তোমাকে সেদিন দেখিয়েছিলাম, তার তলায় যাবার সাধ্য কারু ছিল না। কয়েকশ' বছর ধরে তার তলায় শেকড়ে-বাকড়ে, লতায় পরগাছায় এমন জঙ্গল গজিয়ে উঠেছিল যে তা ছিল একেবারে দুর্ভেদ্য। তাছাড়া ওখানে ছিল বিষাক্ত সাপের আড্ডা। আবার ঐ গাছে হাজারো পাখি বাসা বেঁধে থাকতো। দিনের বেলা সব বসে যেত ঝিলের ধারে ধারে। বক, গোখুঁটে, শামুকখোল, আরও কত পাখি। ওরা মাছ সংগ্রহ করত ঝিল থেকে। কোনো রকম আওয়াজ হলেই পাখা টেনে প্রবল চীৎকারে আকাশ ভরে ফেলত। কেউবা বসত গিয়ে বটগাছের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। আবার সুযোগ বুঝে জলায় নামত খাবারের খোঁজে।

এক বিকেলে পাখি শিকারের আশায় আমি ঝিলের ধারে হাজির হলাম। সঙ্গে রয়েছে অলি। সে তার বাড়ির জন্যে হিঞে, কলমী, শুশনী যোগাড়ে ব্যস্ত।

বটগাছের ডালে একটা বক বসেছিল। তার পাশেই একটা বাসা। ঐ বাসায় মুখ উঁচিয়ে বসেছিল দুটো ছানা। মনে হচ্ছিল ওদের ডানা গজিয়েছে। আমি গুলতি তাক করে মাটির গুলিটা ছুঁড়লাম। বকটাকে লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু লাগল ছানাটার গায়। সে ছিটকে আকাশে উড়ে দু'একটা পাক খেয়ে পড়ে গেল ঝিলের জলে। তখনও জ্যান্ত আছে পাখিটা। সে পাখা টেনে জল কেটে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। মুহূর্তে দেখলাম, অলি নলবন চিরে জলে নেমে পড়েছে। আমি হৈ হৈ করে বারণ করতে গেলাম, কিন্তু ততক্ষণে ও তীরের মতো সাঁতার কেটে পাখিটার কাছাকাছি গিয়ে পেঁৗছেছে।

এ তল্লাটে এমন কোনো সাহসী লোক নেই সংগীতা, যে ঐ ঝিলে সাঁতার কাটতে পারে। তালের ডোঙায়, কলার ভেলায় ভেসে জাল ফেলতে আসে অনেকে, কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না কেউ। এ অঞ্চলে সকলের ধারণা যক্ষীটক্ষি কিছু রয়েছে ঐ কালো জলের ভেতর। কিন্তু ঐ ডাকাত মেয়েটা সেদিন জল থেকে তুলে এনেছিল পাখির ছানাটাকে।

শুধু কি তাই···।

অলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, অনেক প্রশংসা করলে ছোটবাবু, এখন আমাকে দুটো কথা বলতে দাও। শোন বউদি, দাদা সেদিন আমার হাত থেকে পাখিটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, আমি শেষে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে ওর হাতের আঙুল কামড়ে দিয়েছিলাম। দাগ পড়ে

গিয়েছিল আঙুলে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল কাছারিবাড়িতে।

আমি হেসে বললাম, আঙুল কামড়ে দিয়েছিল বলে মারতে পারিনি।

অলি অমনি মাথাটা নিচু করে বলল, সেই মারটা আজ মেরে নিতে পার ছোটবাবু।

সংগীতা আর আমি ওর ব্যাপার দেখে হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, তার পরের ঘটনা খুব ছোট। পাখিটার পায়ের ওপর লেগেছিল, ছড়ে গিয়ে একটুখানি রক্তও বেরিয়েছিল। অলি চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিয়েছিল ওর পায়ে। পরের দিন একটি অসাধ্য কাজও ও করেছিল। সবার অলক্ষ্যে জঙ্গল ফুঁড়ে, গাছে উঠে ও পাখির ছানাটা গাছে রেখে এসেছিল। এ কথা আমি পরে ওর মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

সংগীতা বলল, তাজ্জব তোমার ছোটবেলার কাহিনী ভাই।

অলি বলল, ছোটবাবুর হাত কামড়ে দেবার পর ভয়ে আমি কতদিন কাছারিবাড়িমুখো হইনি। কেবল একদিন চাঁদের আলোয় ঝিলের ধারে চুপি চুপি গিয়ে আমি পাখিটাকে গাছে তুলে দিয়ে এসেছিলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তুমি যে রাতে ঝিলের ধারে গিয়েছিলে সে কথা তো আমাকে বলনি!

অলি বলল, তুমি যেদিন দেশের বাড়ি যাবে তার আগের দিন বিকেলে জ্যেঠার বাড়ি এসেছিলে আমার খোঁজে। সেদিন কতটুকুই বা কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম ছোটবাবু! তোমার আঙুলের দাগ তখনো রয়েছে দেখে কান্না পেয়ে গিয়েছিল। জান বউদি, আমি কামড়ে দিয়েছি বলে দাদা কিন্তু কাউকেই বলেনি। একটা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কাঁকড়ার দাঁড়ার কামড়ে আঙুল কেটে রক্ত পড়েছে বলেছিল। সে কাঁকড়াটাকে নাকি দাদা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল জলে।

বললাম, কাছারিবাড়ি থেকে ঐ যে চলে গেলাম, তারপর এমুখো হইনি এতগুলো বছর।

সংগীতা বলল, আমার জন্যেই কিন্তু ছেলেবেলার খেলার সাথীর সংগে তোমার দেখা হয়ে গেল।

হঠাৎ অলি সংগীতাকে গড় হয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, তোমাদের দুজনকে দেখে ধন্য হয়ে গেলাম বউদি।

সংগীতা ওর নমস্কারের সময় হাত দুটো জোড় করে বসেছিল। সে বলল, আজ এখানে না এলে হয়ত তোমাদের এই কিশোর জীবনের কথাগুলো তেমন করে জানার সুযোগ হতো না। তোমার ভেতর যে এত বড় একটা প্রাণ আর শক্তি লুকিয়ে আছে তাও জানতে পারতাম না।

অলি অমনি বলল, ছি ছি বউদি, তুমি আমার মতো একটা মেয়ের প্রশংসা করছ! আর আমি তাই শুনে হজম করব। আমার এই পোড়া জীবনটার সব কথা শুনলে···।

শেষের কথা কটি বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল অলি।

সংগীতা ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, এত আনন্দের পর এমন কান্না ভাল লাগছে না ভাই। তুমি যেমনই হও না কেন, যখন আমরা তোমার কাছে এসেছি তখন তুমি আমাদেরই লোক। ভালমন্দ সব মিশিয়ে তুমি আমার বোন।

দেখলাম, সেই মুহূর্তে সংগীতা বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে। আমি কোনো কথা না বলে ওদের পরস্পরকে অনুভব করার সুযোগ দিলাম।

অপরাহ্নবেলায় হঠাৎ চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামল।

অলি সংকোচে বলল, তোমরা কি আমার চালার ভেতর মাথা গোঁজার ঠাঁই নেবে বউদি, একরত্তি পালাঘর, হাঁড়িকুড়ি বিছানা-বালিশ সবই ওর মধ্যে।

সংগীতা নিজেই অলির হাত ধরে টানতে টানতে বলল, কতক্ষণ বৃষ্টিতে ভেজাবে ভাই, চল ঘরে ঢোকা যাক্।

আমরা অলির চালাঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

মেঘলা আকাশ, বেলাশেষের ক্ষীণ আলো চালাঘরের ভেতরটাকে খানিকটা রহস্যময় আবছায়ায় ভরে রেখেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমার মনকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করল। একটুখানি স্যাঁতসেঁতে ভাব কিংবা ভ্যাপসা গন্ধ নেই ঘরের মধ্যে কোথাও। যতটুকু দেখা যাচ্ছিল, অলি ঘরের একটা দেয়াল বরাবর টাঙানো দড়িতে তার দু-চারখানা জামা-কাপড় বেশ গুছিয়ে রেখেছে। কলসীতে জল, থালাগ্লাস হাঁড়িকুড়ি ঘরের একটি কোণায় রাখা হয়েছে। মেঝেতে বিছানা পাতা ছিল, ও তার ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিলে।

বিছানা থেকে মাথার বালিশটা উঁচু করে একদিকে সরিয়ে নেবার সময় ঠক করে কি একটা যেন মাটির মেঝেতে পড়ল।

সংগীতা বলল, ওটা কি?

অলি হেসে বলল, পাগলা শেয়াল-কুকুর শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে এটা দিয়ে তাদের শায়েস্তা করি। এটা একটা হাঁসুয়া।

সংগীতা অমনি সহজ বিশ্বাসে বলল, এখানে এনেক পাগলা শেয়াল-কুকুর ঘোরাঘুরি করে বুঝি?

অলি ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে লাগল।

আমি কিন্তু কথার অর্থটা আগেই বুঝেছিলাম, সংগীতা ওর হাসি দেখে বুঝে নিল। নিজেও সে হাসিতে যোগ দিল।

অলি বলল, ডাইনে দেয়াল বরাবর যে লাঠিটা শোয়ান আছে দেখছ, ওটা দিয়ে শেয়াল কুকুর তাড়াই। আর এই অস্তরটা ভালমানুষের পো-দের জন্য।

সংগীতা বলল, তুমি একা, তাই ওরা এই সাহসটা পায়।

ওরা যে দলে দলে আসে সে কথা বলব না। তবে বাবুভায়ারা নৌকো করে যাবার সময় তেঁতুল গাছের তলায় নোঙর করলেই অলির সঙ্গে একবার ভাব জমাতে চলে আসে। পান খেয়ে আসর জমাতে চায়। সেই দুঃখে, হাটবারে একটা পানের দোকান দিতাম বাইরে, সেটা তুলে দিয়েছি।

দোকান তুলে দিলে, তোমার চলে কি করে ভাই?

অলি বলল, হাটবারে অনেক ধান বোঝাই নৌকো আসে এখানে। নদীর

ওপারে হাট। তার পোয়াখানেক দূরে ধানের গোলা। আড়তদার ধান কিনে বস্তাবন্দী করে। আমরা ঐ বস্তা গোলায় বয়ে নিয়ে যাই, তার বদলে পয়সা পাই। তেঁতুল গাছের পাশ দিয়ে যে খালটা গেছে তাতে জেলেরা পাটা ঘিরে বড় বড় বাঁকি বসিয়ে মাছ ধরে। আমি অনেক সময় ওদের মাছ কুড়িয়ে দি বউদি। ওরা আমাকে মাছ খেতে দেয়। পশ্চিমে লাউয়ের একটা ছোট মাচা দেখেছ হয়ত, এইসব থেকেই চালিয়ে নি একটা পেট। আমার নিজের নুন নিজেই তৈরি করি। লোনা মাটি ঝিনুক দিয়ে চেঁচে কলসীতে ভরে তুলি। ঐ জল বাঁশের চোঙের ভেতর দিয়ে আর একটা কলসীতে ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলতে হয়। নতুন কলসীর জলে কাদাটা থাকে না। ঐ ফল্‌তি জলটা ফোটালেই নুন তৈরি হয়ে গেল।

সংগীতা বলল, অনেক জিনিস জানা গেল তোমার মুখ থেকে।

হাঁ, আর একটি কথা বলতে ভুলে গেছি।

কি কথা ভাই?

আমি মা লক্ষ্মীকে গান শুনিয়ে ঘরে আনি।

অলির এই কথাটার তাৎপর্য আমার পক্ষেও বোঝা সম্ভব হলো না।

সংগীতা বলল, বুঝিয়ে বল ভাই, সে ব্যাপারটা কিরকম?

এই যে বছর কয়েক আগে ভোট নিয়ে খুব মাতামাতি হলো গো, বাবুদের সভায় যেতাম সারি বেঁধে। চার আনা, আট আনা পয়সাও পেতাম।

ঐ সময় একদিন একটা বটগাছের তলায় হাটের মাঝে একদল বাবুকে গান গাইতে শুনলাম। মেয়ে-পুরুষ মিলে গাইছিল। অনেক গান। কি যে ভাল লেগে গেল কানে, মজে গেলাম। ওরা যেখানে যেখানে যেত, আমিও ছুটতাম সেখানে। ওদের গান আমার গলায়ও এসে গেল। এখন এতগুলো বছর কেটে যাবার পরেও আমি ধানকাটার সময় ভিন গাঁয়ের চাষী ভাইদের ঐসব গান শুনিয়ে বেড়াই। ওরা এখনো মেতে ওঠে। হাতের কাজ ফেলে আমার গান শোনে আর আমাকে খাবার জন্য ধান দেয়। তাই বলছিলাম, গান গেয়ে মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনি।

সংগীতা অমনি বলল, একটা গান শোনাবে ভাই?

আমি বললাম, তাহলে অলিকে কিন্তু ধান দিতে হবে।

সংগীতা বলল, কাছারি থেকে তুমি তোমার বোনের জন্য এক বস্তা চাল এনে দিতে পারবে না?

কি যে বল বউদি, একটা গান শোনাব একবস্তা চাল নিয়ে! এমন গাইয়ে আমি নই।

অলি কিন্তু গান গাইতে বললে লজ্জা পায় না।

ও গান ধরল। অলির গলায় এত সুর, আমি অবাক হয়ে গেলাম। সংগীতা মুখ নিচু করে মগ্ন হয়ে শুনতে লাগল।

'হেই সামালো, হেই সামালো,
হেই সামালো ধান হো…

কাস্তেটা দাও শান হো…
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবো না আর দেবো না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো ।'

ও গেয়েই চলল, একটার পর একটা গান । কি উদ্দীপনা সে গানের কথায় সুরে, যে গাইছে তার কণ্ঠের জোয়ারে ! মনেপ্রাণে ইন্‌স্‌পায়ার্ড না হলে কেউ কি এমন করে গান গাইতে পারে । আমার মনে হলো, যতদূর ওর কণ্ঠ ভেসে যাচ্ছে, ততদূর পর্যন্ত সারা মাঠের ফসল দিয়েও ওর গানের ঋণ শোধ করা যাবে না । একেই বলে ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ ।

একটা প্রেরণা এতক্ষণ ওকে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, এখন গান থামলে ও চুপচাপ বসে রইল ।

নিজের গভীর ভাললাগার কথাটুকু বোঝাতে গিয়ে সংগীতা ওকে জড়িয়ে ধরল ।

আমি বললাম, অলি, আজ তোমার ঘরে না এলে তোমার এত বড় একটা গুণ আমার অজানা থেকে যেত ।

ও হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার পা-টা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাল । মুখে বলল, তোমাদের দুজনকে যে আজ আমার গান শোনাতে পেরেছি, এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর কিছুতে নেই ছোটবাবু ।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে উঠল । উঠে পড়তে হলো আমাদের । অলি অনেকখানি পথ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল । কেবল বলতে লাগল, নতুন বউদি এল, দু-একটা ফলপাকড়ও হাতে তুলে দিতে পারলাম না, এমন পোড়া কপাল আমার ।

সংগীতার হাতখানা মুঠোর ভেতর ধরে নিয়ে ও পথ চলছিল ।

সংগীতা বলছিল, তোমার গান শুনলাম, এর চেয়ে কি তোমার ফলপাকড় মুখে মিষ্টি লাগবে গো !

বউদি, তোমরা চলে গেলে আমি নদীর ধারে ঐ তেঁতুলতলায় বসে ভাবব, আমি একটা স্বপন দেখেছি ।

আমি বললাম, কাল দিনটা শুধু রয়েছি চকে, পরশু চলে যাচ্ছি, পারি তো কাল দুপুরে খাবার পর একবার চলে আসব দুজনে তোমার কাছে ।

অলি ভারী খুশি হয়ে সংগীতার হাত দোলাতে লাগল । তোমার আসা চাই কিন্তু বৌদি ।

সংগীতা বলল, খুব চেষ্টা করব । তবে কাল আর ছোটবেলার গল্প নয়, তোমার মুখে এখনকার জীবনের গল্প শুনব । রাজী তো ?

বেশ, তাই শোনাব । তবে 'যদি পারিটারি নয়', কথা দিয়ে যাও আসবেই ।

সংগীতা বলল, আসব, আসব ।

পরের দিন দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই সংগীতা আমার কাছে এসে বলল, বৃষ্টি নামতে পারে, চল আগেভাগে পালাই ।

এখন সবার চোখ নতুন দুটি মানুষের দিকে। পথে বেরুলেই চাষী আর বাগ্‌দীপাড়ার কৌতূহলী মানুষ-জনের নজর আমাদের দুজনের ওপর এসে পড়ে। তাই বললাম, কাল পিসিকে নৌকোয় তুলতে গিয়েছিলাম বলে সকলে জানে, আজ আবার ও-পথে গেলে কাছারির সকলেই অবাক হবে। ওদিকে দেখার তো কিছু নেই। বরং উল্টো রাস্তায় বরোজ নদীর দিকে বেড়াতে যাই চল। পথে পড়বে বাবলাবনে ঘেরা একটা ছোট্ট ঢিবি, ওখানে আমার তিরিশ বছরের বাবাকে আমার পাঁচ বছরের দাদা মুখাগ্নি করেছিল। বাবার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে আমরা আলপথ ধরে নেমে যাব একেবারে অলির চালা-ঘরের দিকে।

উল্টো পথে নেমে পরিকল্পনামত আমরা হাঁটতে লাগলাম।

সঙ্গীতা বলল, গাঁয়ের এইসব মানুষের কাছে অলি এমন কি দোষ করেছে, যেজন্যে গাঁয়ের ভেতর তার এতটুকু ঠাঁই মিলল না?

দীর্ঘ এক যুগ পরে দুদিনের জন্যে আমি এসেছি এখানে। গাঁয়ের মানুষ কি ভেবে ওকে এমনভাবে ত্যাগ করেছে তা তো আমি জানি না সঙ্গীতা। যেখানে আমি আর হয়ত কোনোদিনও আসব না, সেখানে একটি মুহূর্তের জন্য শ্যাওলাভরা ডোবায় ঢেউ দিয়ে লাভ কি! ও শ্যাওলা পরমুহূর্তে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে অলির তেঁতুলতলার পালাঘরে পৌঁছে গেলাম একসময়।

অলি হাসিতে মুখখানা ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল। ওকে দেখলেই মনে হবে, আদিম প্রকৃতি তার এই কন্যাটিকে যত অকৃত্রিম করে সাজানো সম্ভব তাই সাজিয়েছেন।

তোমাদের আসার পথ চেয়ে বসেছিলাম গো বউদি। তোমরা এলে পেছনের পথ দিয়ে।

বললাম, তোমাকে চমকে দেব বলে।

অলি বলল, জান বউদি, ছোটবেলায় পেছন থেকে ভীষণ জোরে শব্দ করে আমাকে চমকে দিত ছোটবাবু।

সঙ্গীতা বলল, তুমি যে রকম সাহসী মেয়ে তোমাকে ভয় দেখায় কার সাধ্যি! আমি তো ভাবতেই পারি না দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে রাতের বেলা সাপের কামড়ের ভয় না করে গাছে উঠে পাখির ছানাটাকে তার মায়ের কাছে রেখে এসেছে!

অলি নিজের প্রশংসার কথায় ভারী লজ্জা পেল। সে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তেঁতুলতলায় চাটাই পাতি বউদি?

তোমার গল্প শুনতেই তো এলাম ভাই।

চাটাই পাতা হলো। আমরা তার ওপর বসলাম। সঙ্গীতা চাটাইতে বসবার জন্য অলিকে হাত ধরে টানল, কিন্তু সে কিছুতেই বসল না। সঙ্গীতার কাছ ঘেঁষে মাটিতেই বসে পড়ল।

আচ্ছা ভাই, তুমি তো এই জলজঙ্গলের দেশের মেয়ে, তুমি কোথা থেকে এমন সুন্দর ভাষায় কথা বলতে শিখলে ? এখানকার লোকেরা তো এমন সুন্দর উচ্চারণে কথা বলে না।

অলি হাতখানা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, সব ঠাকুমা আর মায়ের দয়ায় হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, দাদার ঠাকুমা চকবাড়িতেই থাকত। মা-ও দেশের বাড়ি থেকে আসত মাঝে মাঝে। আমি তো ওদের কাছেই থাকতাম গো। ওরা যেমনটি করে বলত, আমি তেমনটি শিখে নিতাম।

সঙ্গীতা এবার কথা ঘোরাল, এখন তোমার জীবনের গল্প শুনব। সত্যি কথা বলতে কি, এ তল্লাটে তোমার মতো সুন্দরী একটিও আমার চোখে পড়েনি।

অলি অস্থির হয়ে বলল, আবার বউদি !

সঙ্গীতা বলল, সত্যি কথাগুলো বারবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আচ্ছা ও-কথা থাক, সোজাসুজি বলতো ভাই, তুমি এতদিনও ঘর বাঁধনি কেন ?

অলি অসংকোচে বলল, আমার জাতে মনের মতো একটা মানুষকে পাইনি বলে।

সঙ্গীতা বলল, ওরা তোমার মতো সুন্দর নয় বলেই কি একথা বলছ ?

না বউদি, তা কেন হবে ! ওরা বউয়ের ওপর মারধোর আর জুলুম চালায়। আমার ধাতে ওটা সইবে না। আর তাছাড়া···।

ও চুপ করে গেল দেখে সঙ্গীতা খোঁচাল, তাছাড়া কি ভাই ?

অলি বলল, আমার এ স্বভাবটার সঙ্গে বউদি মিলবে না কারুর। তাই ঘর বেঁধে অশান্তি বাড়াতে চাইনি। আমি জানি এটা আমার স্বভাবের দোষ, তবু যেখানে সেখানে পালিয়ে বেড়াতে আমি ভালবাসি। এক জায়গায় বেশি-দিন টিকে থাকতে পারি না।

কিন্তু ভাই অজানা জায়গায় একা একটি মেয়ে দিনের পর দিন কি করে ঘুরে বেড়াতে পারে ?

হাটচালায় কিংবা পথের ধারের গাছতলায় পড়ে থাকতে আমার একটুও ভয় করে না।

বদলোক সব জায়গাতেই আছে, তাদের হাত থেকে পার পাবে কি করে ?

অলি তার ঘর থেকে কালকের সেই হাঁসুয়াখানা বের করে আনল। ভারী চমৎকার শান দেওয়া হাঁসুয়া। রোদ লেগে চক্‌চক্ করে উঠল। ঐ হাঁসুয়াখানা আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরে অলি বলল, হাঘরেদের সর্দার এটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, ইটা তুর হাতে দিচ্ছি বটেক, তবে ইটাকে তু হাতছাড়া করবি নাই। ইটা তুর হাতে থাকিলে ভূত-পিরেত, মনিষ, জানবার তুর কাছে ভিড়বে নাই।

হাঘরেদের সর্দারকে পেলে কোথায় গো ?

ওদের তো ঘরবাড়ি নেই, তাই ঘুরতে ঘুরতে কোনো পোড়ো জায়গা দেখলেই ওরা কদিনের জন্য সেখানে ডেরা গাড়ে। এমনি একটা দল একদিন

নদীর ওপারে এল। ঐ যে দূরে দেখছ সবুজ গাছপালায় ছাওয়া একটা জায়গা, ওটা মহাদেব জানাবাবুদের পোড়ো একটা ঢিবি ছিল। ওরা ঐখানটাতে এসে উঠেছিল। আমি যখন তখন নদী পেরিয়ে ওখানে পালিয়ে যেতাম। বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম ওদের কাজকম্ম। কে বলবে, ওরা হাঘরে, বউদি। মেয়েমানুষদের কি কাজের গোছ! ভোরবেলা হলেই আমাদের ঘরের মতো ঝাঁটপাট দিচ্ছে। পরের জায়গা, তবু কি মম্‌তো গো। ছেলে সামলাচ্ছে, রান্না-বাড়ি করছে। ছাগলের দুধ দোয়াচ্ছে। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, জোয়ান-মরদদের খেতে দিচ্ছে।

বেলা হলে মেয়েরা গাঁয়ের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। ঢোলক বাজাত, গান গাইত আর তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচত ওদের ছোট ছোট মেয়েগুলো। যে পারত পয়সাকড়ি দিত, আবার চাল-মুলো-কলা দিয়েও ওদের বিদেয় করা হতো।

মরদরা গাছ বেচত, ভাল ভাল সব ফলের গাছ। বুড়োরা শেকড়-বাকড় বেচত, বলে দিত কোন রোগের কোন দাওয়াই।

ওদের একটা মেয়ে ছিল বউদি, ওর নাম কুশলা। আমারই বয়সী হবে। আমি কি দেখতে গো, বাবুদের পিরতিমের মতো ওর মুখ।

সংগীতা বলল, তাই বুঝি?

সত্যি বলছি বউদি, ওর দিকে একবার চাইলে সহজে চোখ ফেরাতে পারা যাবে না।

বললাম, খুব ভাব-ভালবাসা হয়ে গেল বুঝি মেয়েটার সঙ্গে?

ঠিক ধরেছ ছোটবাবু। ভারী একটা ভাবসাব হয়ে গেল ওর সঙ্গে। রোজ বিকেলে কাঁকই চালিয়ে ও আঁচড়ে বেঁধে দিত আমার চুল। আমিও ওর চুল বেঁধে দিতাম।

সংগীতা আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে সবুজ গাছ-গাছালিতে ভরা জায়গাটা, ওটাই আগে পোড়ো ঢিবি ছিল বলছ তো?

হাঁ বউদি, ওটাই।

তাহলে ঢিবিটা হঠাৎ সবুজ হয়ে উঠল কি করে?

অলি বলল, ওরাই তো সেটা করেছে গো। দু-মাস ছিল—শিরিষ, পলাশ, মাদার, অশথ, অর্জুন, কত রকমের গাছই না লাগাল। গাঁয়ের লোকদের একদিন ডেকে বলল, এই সকল বড় বড় গাছের পাশে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ও তৈরি করি দিলাম। এসব গাছের শেকড়-বাকড় ব্যথা-বেদনায় কাজে লাইগবে বটেক। যতন করিও, রতন মিলবেক।

ওরা কোন গাছের পাতা কিরকম, ফুল কখন আসে, কি রঙ সবই বুঝিয়ে বলে দিল। কোন অসুখে কোনটা লাগবে তাও বলতে ভুলল না। কেবল গাছগুলো রক্ষে করার ভার গাঁয়ের মানুষদের দিয়ে গেল।

ওরা চলে যাচ্ছে দেখে আমিও চলে গেলাম ওদের সঙ্গে।

সংগীতা বলল, তোমার বাড়ির লোকে কিছু বলল না?

আমার ঘরবাড়ি কিছু ছিল না বউদি। শুনেছি, বাপের এক টিক্‌রে যে জায়গা ছিল, সেটা নিজের নামে করে নিয়েছে জ্যেঠা। এখন আমি বিদেয় হলে তার লাভ।

সঙ্গীতা বলল, তুমি এ নিয়ে গাঁয়ের মানুষদের কাছে বিচার ফেলনি ?

বিচার ফেলব কিগো, বেঁচে গেছি বৌদি, জন্মের মতো বেঁচে গেছি।

বললাম, এ কথা বলছ কেন অলি ?

ছোটবাবু, জমি থাকলে বন্ধন। ঐ বাপের ভিটেটুকু ছেড়ে কোথাও নড়তে পারতাম না। এখন কোনো বাঁধন নেই, জগত দেখে বেড়াচ্ছি। নতুন দেশ, নতুন সব মুখ, সে সব দেখা কি কম ভাগ্যি গো !

সঙ্গীতা বলল, তোমার আসল গল্পটা বল। ঐ হাঘরেদের সঙ্গে তুমি চলে গেলে ?

গেলাম বউদি, কাটালাম চার চারটে বছর। কত জায়গায় যে গাছ পোঁতা হলো তার ঠিক-ঠিকেনা নেই। আমি ওদেরই একজন হয়ে গিয়েছিলাম। বুড়ো সর্দার আমাকে তার নাত্‌নী কুশলার মতো ভাল বাসত। সেই তো একদিন আমার হাতে হাঁসুয়াটা তুলে দিয়েছিল।

সঙ্গীতা বলল, তুমি তাহলে ওদের দলটা ছেড়ে দিলে কেন ?

একদিন কুশলার বে হয়ে গেল বৌদি। ওদের মতো আর এক হাঘরে দলের একটি ছেলের সঙ্গে।

ওরাও কুশলাদের দলের মতো গাছপালা লাগিয়ে বেড়ায় নাকি ?

না বউদি। ওরা বাঁদরনাচ দেখায়। ওদের ছেলেমেয়েরা দেখায় মাদারীর খেল। বুড়োরা বেচে বাতের তেল। আমার মন ভেঙে গিয়েছিল বউদি।

কেন ?

চোখে জল এসে গেল অলির। আমাদের থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছল।

একসময় আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, দুটো কষ্ট বউদি একসঙ্গে চাপল মনের ওপর। কুশলা চলে যাচ্ছে, সে কষ্ট, তারপর সে যে ধরনের মানুষদের কাছে যাচ্ছে, সে কষ্ট।

কেন, কুশলা কি তার নতুন শ্বশুরবাড়ির কথা তোমাকে কিছু বলেছিল ?

রাতে একসঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে শুতাম বউদি। ও নতুন শ্বশুরবাড়ির কথা শুনে, তাদের ঐসব কাজকম্মের কথা শুনে কেঁদে আমার বুকখানা ভাসিয়ে দিল। আমিও ওর সঙ্গে সে রাতে কেঁদে আর কূল পাই না।

বললাম, তোমরা দুজনে মিলে সর্দারকে কথাটা বললেই পারতে।

বলেছিলাম ছোটবাবু। মেয়েটার কষ্ট দেখতে না পেরে আমি একা গিয়েই বলেছিলাম।

কি বলল সর্দার ?

বলল, তার জেতের একটা ছেলে খুঁজে পাওয়া নাকি ভারী শক্ত। এ ছেলেটা জোয়ান মদ্দ। বাচ্চাদের মাদারীর খেলু শিখলায়। নিজে একসাথ দু-দুটো

বাঁদর নিয়ে সীতারামের খেল্ দেখায়। এমন ছেলে সারা তল্লাট ঢুঁড়ে মিলবেক নাই।

সঙ্গীতা বলল, বিয়ে হয়ে গেল ?

হয়ে গেল বউদি।

তুমি কবে ওদের দল ছাড়লে ?

কদিন পরেই। থাকতে আর মন চাইল না একেবারে। তাছাড়া কয়েক দিন ধরে আমার মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জাগছিল।

কি ইচ্ছে গো ?

আমার মনে হচ্ছিল, এবার আমি পিছু হাঁটি। যে সব গাছপালা এতদিন ধরে পুঁতে এলাম মাটিতে, মা ধরিত্রী তাদের কেমন রেখেছেন দেখি একবার।

মনের কথাটা বললাম সর্দারকে।

সর্দার বলল, তোকে আর ধরে রাখা যাবে না বেটী। যেতে চাইছিস যা, তবে একা যাবি এইটা ভাবনা আছে বটেক।

আমি বললাম, তোমার হাঁসুয়া থাকবে আমার হাতে, ওটাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

সর্দার বলল, হুঁ, ঠিক বলিছিস বটে। বিশোয়াস রাখিস, ফল মিলবেক।

আমি এক ভোরে একটা চটের থলেতে ওদের দেওয়া খানকতক রুটি আর গুড় ভরে নিলাম। ঐ থলেতেই রইল আমার হাঁসুয়া। সবাই আমার জন্য বড় দুঃখ করতে লাগল। আমার মনটাও ভারী হয়ে উঠেছিল, তবু মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম বউদি।

অলি থামল। আমার মনে হলো, ও একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসও ফেলল।

বেশ কিছু সময় নীরবতার পর অলি বলল, অনেকগুলো পোড়ো জমিতে আমরা গাছ লাগিয়েছিলাম। তার ভেতর চারটে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। সবুজে সবুজে ছেয়ে গেছে জায়গাগুলো। কোথাও কোথাও ফুলও ফুটেছে। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছিল! আমার মনে হলো বউদি, পাতাগুলো আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে। কাছে যেতেই ফুলগুলো হঠাৎ আমাকে দেখে আনন্দে হেসে উঠল। আমি প্রতিটি গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। বউদি, ওরা ঠিক যেন আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ে গো।

আমাকে দেখে গেরামের লোক সব চিনতে পারছিল। তারা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের ঘরে। কত খাওয়াল, খাও খাও বলে। কত ভাল ভাল ঘরের বউড়ীরা আমাকে কত ভাল ভাল রঙীন শাড়ি দিল। দেখাচ্ছি বউদি।

বলতে বলতে অলি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নিয়ে এল তার প্যাটরা। ডালা খুলল। বের করল একটি একটি করে শাড়ি। নতুন পুরনো মিলিয়ে খান সাতেক শাড়ি। তিন-চারখানা তো বেশ দামী আর দেখতে ভাল বলে মনে হলো।

সঙ্গীতা শাড়িগুলোর খুব প্রশংসা করল। অলি প্যাটরা গুছিয়ে রাখতে গেল ঘরের ভেতর। সঙ্গীতাকে আমি বললাম, অলি যে মাটিতে তৈরি, সে

মাটির গায়ে কোনো ময়লা লাগে না সংগীতা। যারা ওর খাওয়া-পরা, চলাফেরার ধরন দেখে ওকে ভ্রষ্টা বলে অপবাদ দেয় তারা কি করে বুঝবে, পুকুরভরা পাঁকে ও একটি মাত্র পদ্মফুল।

সংগীতা বলল, এমন বনবাদাড়ে অলির মতো এরকম একটি মেয়ে আছে ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সত্যি, আমার জীবনে ওর মতো দ্বিতীয় আর একটি মেয়ে আমি দেখিনি।

অলি ফিরে এসে বলল, বউদি, ডিমভাজা খাবে?

ডিম কোথায় ছিল গো?

আমার হাঁসের ডিম।

হাঁস পুষেছ বুঝি?

দুটো আছে। ওরা এখন গইরা (গভীর) ঢালের জলা জমিতে গেঁড়ি ঠুকরে খাচ্ছে।

খাব, তবে তার আগে তোমাকে এই তেঁতুলতলায় এসে পৌছতে হবে।

অলি অবাক হয়ে তার বৌদির দিকে চেয়ে আছে দেখে আমি বললাম, ও তোমার হেঁয়ালিটা ঠিক ধরতে পারছে না, একটু সহজ করে বল।

সংগীতা বলল, এখানে এসে তেঁতুলতলায় ঘর বাঁধার আগে পর্যন্ত তোমার পথচলার গল্পটা শুনে নিতে চাই।

অলি বলল, তাই বল। আমার শেষ গল্পটা তুমি শুনতে চাও। আচ্ছা, বলছি শোন।

অলি একটুখানি থেমে বলতে শুরু করল, চার-পাঁচখানা হাঘরেদের হাতে তৈরি বাগান খুঁজে পেলাম। ভারী আনন্দে পথে পথে কাটল আমার দিন। এরপর আমি আমার পুরাতন পথটা হারিয়ে নতুন একটা পথ ধরে চলতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, ওটা আমার একেবারেই চেনা পথ নয়। তবু চলতে লাগলাম, নতুন একটা দেশ দেখার আনন্দে বউদি। শেষে আমি একদিন মস্তবড় একটা নদীর ধারে এসে পেঁৗছে গেলাম।

নদীর ধারে একটা গাছ ডালপালা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার তলায় বসলাম। হাওয়া দিচ্ছিল। অনেকটা পথ হেঁটে বড় কষ্ট হচ্ছিল, একসময় ওখানে শুয়ে পড়লাম। কখন বউদি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

একটা ঠেলা খেয়ে চমকে উঠে বসলাম। চেয়ে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা আধবয়সী লোক। লোকটার মুখে হাসি। খুব বিরক্ত হলাম।

কোথা থেইকে আসছ মেয়ে?

বললাম, তোমার কি দরকার সে কথা বল।

কাজ করবে?

কি কাজ?

নদীর দিকে হাতখানা বাড়িয়ে লোকটা বলল, ঐটা আমাদের নৌকা। আমরা সোঁদরবনের লাটে চলেছি কাঠ কাটতে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে

মেয়ে ? ভাত রাঁধার কাজ করবে। খাওয়া-পরা ছাড়া মাসে পনর টাকা। তিন মাস কাজ, তারপর যেমন যাওয়া তেমন আসা।

আমি নদীর দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা বড় বোট ধারে এসে ভিড়েছে, সঙ্গে আরও একখানা বোট। বোটের ওপর কাঠ কাটার লোক আর মাঝিমাল্লা করে জনা বারো দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবনের জঙ্গল যেন আমায় টানল। আমি বোটের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে লোকটাকে বললাম, যাব।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আমাকে ইশারা করে নদীর ঢালে নামতে লাগল। আমি রাস্তার উল্টোদিকে একটা চিঁড়ে-মুড়ির দোকান দেখেছিলাম। সেখানে এক মাসি বসেছিল। আমি তার কাছ থেকে কিছু মুড়ি কিনলাম। মাসিকে দেখে আমার ভারী ভাল লোক বলে মনে হলো। আমি আমার কাপড়ের পোঁটলা থেকে দু-একখানা আটপৌরে শাড়ি বের করে নিয়ে মাসিকে বললাম, এই পোঁটলাখানা তোমার কাছে রেখে দাও, ফেরার পথে নিয়ে যাব।

মাসি হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, তুমি মানুষটি খুব ভাল, তাই তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম। আমি সোঁদরবনে মাস তিনেকের মতো রান্নার কাজে যাচ্ছি। আমার তো কেউ নেই, তোমাকে দেখে আমার আপনার জন বলে মনে হলো মাসি। আচ্ছা মাসি, তুমি ওই লৌকার লোকদের চেনো ? ওরা কেমন মানুষ গো ? একা মেয়েমানুষ ওদের সঙ্গে যাব, তাই জিজ্ঞেস করছি।

মাসি বলল, ওই লৌকায় ভুবন আছে। তোমার কোনো ভাবনা নেই। সব বিপদে ভুবন পাশে দাঁড়াইবে মা।

আমি লৌকায় উঠতেই আগের মানুষটা বলল, ঐ মুড়ি দোকানের মাসি কি তোমার জানাশোনা ?

বললাম, ও আমার মায়ের নিজের খুড়োর মেয়ে গো। আমাকে বড় ভালবাসে। এদিকে এলে আমি মাসির সঙ্গে দেখা করে যাই। মিথ্যা বানিয়ে বললাম বউদি।

লোকটা বলল, তা বেশ। আমরাও এ ঘাটে এলে কখনো-সখনো তোমার মাসির কাছে মুড়ি-চিঁড়ে কিনে খাই।

কিন্তু বউদি, সবদিক বেঁধেছেঁদেও ভাগ্যের পাকে পড়ে গেলাম।

সংগীতা উৎসুক হয়ে বলল, কিরকম ?

একদিন দুপুরবেলা আমাদের লৌকাটা বড় নদী ছেড়ে ঢুকল একটা খালে। দুদিকে ঘন জঙ্গল। লৌকার দুদিকে দুজন লগি ঠেলছিল। ভাটা ঠেলে যাচ্ছিল লৌকা। ভুবনদাকে খুব ভাল লেগেছিল আমার। এই ছোট-বাবুর উমর হবে। যেমন অসুরের মতো গায়ের জোর, তেমনি হাসিটি ছেলেমানুষের মতন।

খাবার সময় হয়ত বসে গেছে সবাই। আমি ব্যঞ্জন দিচ্ছি। হঠাৎ ভুবনদা বলে উঠবে, আমি মাছ ধরলাম আর ভাগের বেলা সবচেয়ে ছোটটা।

আমি জানতাম, এটা ভুবনদার মনের কথা নয়, ছেলেমানুষী ঝগড়া।

আমি বলতাম, যার যেমন ভাগ্য। হাতা চালিয়ে যেমন যেমন উঠে আসে তেমন তেমন দিয়ে যাই।

আমার খাবার সময় ভুবনদার নজর আছে। উঁকি দিয়ে দেখবে আর বলবে, আমাদের সব ব্যঞ্জন দিয়ে দিলে, শুকনো ভাত খাবে কি দিয়ে?

বলতাম, পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই ভুবনদা, কোনোদিন জোটে, কোনোদিন জোটে না, আমার আবার বাঞ্জন! বেশি বাঞ্জন খেলে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, তখন সাদা ভাত মুখে রুচবে না।

এমনি কত কথা বলত, কত খোঁজখবর নিত মানুষটা।

বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল অলি।

এতক্ষণ আমরা দুজনে অলির অভিজ্ঞতার গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ মেয়েটার এরকম ভাবান্তরে আমরা হতবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

একটু সামলে নিয়ে অলি বলল, আমাদের লৌকা খানিকটা এসে খালের ভেতর এক জায়গায় নোঙর করল। পেছনের লৌকাটাও থামল।

আমি নেমে দেখলাম, একটু দূরে আরও দুখানা লৌকা বাঁধা আছে। আমি ঐসব লৌকাকে আমাদের সঙ্গে আসতে দেখিনি বউদি। ভুবনদাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ও দুটো ঠিকাদারের লোকা। দুদিন আগে এসেছে। সোঁদরবনকে যারা চেনে জানে তারা এসেছে ঠিকাদারের সঙ্গে। বনবাবুর আপিসে কাগজপত্র পেশ করতে হবে। সেখান থেকে অনুমতিপত্তর নিয়ে দেখা করতে হবে জল পুলিশের সঙ্গে। তারপর আছে লগন দেখে বনপুজা। মন্তর পড়ে গণ্ডী কেটে বাঘের পথ-বন্ধন।

সঙ্গীতা বলল, এত সব তুমি জানলে কি করে?

সব আমাকে ঐ ভুবনদা বলেছিল গো। কিন্তু বউদি আমাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে 'সেদো' হাঁকড়ে উঠল, মেয়েমানুষকে কোন শালা বনের মধ্যি এনেছে র‍্যা।

আমাকে যে লোকটা লৌকায় তুলেছিল তাকে কি জুতাটাই না পিটল সেদোর কথায় ঠিকাদার।

সঙ্গীতা বলল, সেদো লোকটা কে?

ঐ তো বাঘতাড়ানি মন্তর ঝাড়ে গো। দলে ওর ভারী পেরতাপ। ঐ লোকটাই তো বনের গুরুঠাকুর।

যে লোকটা তোমাকে নৌকোয় তুলেছিল সে কি জানত না বনের আইন-কানুন?

অলি বলল, সে ঠিকাদারের পুরাতন লোক। তার উপর ভার ছিল লতুন লোক যোগাড় করে নিয়ে যাবার। সঙ্গে যেন অবিশ্যি অবিশ্যি একটা রান্নার লোক থাকে। কিন্তু অত অল্প সময়ের ভিতর যোগাড় করতে পারা যায়নি রান্নার লোক। এদিকে ঠিক সময়ে লোকজন নিয়ে লৌকা ভাসাতে না পারলে ঠিকাদারের অনেক ক্ষেতি হয়ে যাবে। তাই রান্নার লোক ছাড়াই ও চলছিল।

ঠিকাদারের সঙ্গে একটা বাচ্চা চাকর আছে, সে কোনোরকমে দু-চার দিন চালিয়ে নেবে। কিন্তু এত লোক গিয়ে পড়লে একা তার ক্ষমতায় সামলান দায় হবে। তাই আমাকে গাছতলায় ঘুমাতে দেখে ও ছুটেছিল আমার কাছে। আমাকে পেয়ে ও হাতে চাঁদ পেয়েছিল, তাই আইন-কানুনের কথা তখন আর তার মনে পড়েনি। নৌকার মাঝি একবার ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিল মেয়ে-ছেলের কথা, আমি তখন ঠিক ঠিক ব্যাপারগুলো ধরতে পারিনি। ও কিন্তু আমল দেয়নি কিছুতে।

লোকটা দমাদ্দম জুতো খেল, কিন্তু রা কাড়ল না বউদি। আমি তো ভয়ে কেঁপে মরি। ভুবনদা আমার কাছে এসে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠি বুসি রও।

আমি তাই করলাম বউদি।

কতক্ষণ পরে সেই লোকটা আমার কাছে এসে বলল, তুমি একটু দূরে নৌকায় রইব তাহিলে দোষ কাটি যাবে। ঠিকাদারবাবুর সীমার বাইরে রইলে আর কুন দোষ লাগবেনি।

আমার নৌকা লগি ঠেলে নিয়ে গেল একটুখানি দূরে। এবার খালের ওপারে একটা গামা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো ঐ নৌকাটা। সব খাবার-দাবার, রান্নার সরঞ্জাম, পাতাপত্র রইল আমার এখানে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে সাহায্য করার জন্য রইল ভুবনদা আর নৌকার মাঝি। ভুবনদা মাঝে মাঝে আসত আর মাঝি থাকত প্রায় সারাক্ষণ।

নৌকার সামনে এক চিলতে ফাঁকা জায়গা। তারপর একটা ছিরছিরে জলা। কেটে নেওয়া সুঁদুরী গাছের গোড়াগুলো মাথা উঁচিয়ে আছে। তারই ভেতর বউদি মাছের কি খেলা! ঐ জলার ওপারে জঙ্গল। ঘন গাছ-গাছালির গভীর বন। শয়ে শয়ে পাখি উড়ে আসছে মাছের লোভে। গাঙশালিক, শামুকখোল, বক, মানিকজোড়, আরও কত পাখি।

সঙ্গীতা বলল, দারুণ জায়গা তো?

অলি বলল, দিনের আলোয় সুন্দর, সাঁঝ নামতে না নামতেই গা ছম্‌ছম্‌। আর রাতের বেলা বউদি ভয়ে কেঁপে মরি।

কেন গো?

নৌকার লোকজন সকালে ন-ঘড়ি বাজলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজে বেরিয়ে যায়। তখন চোখে-কানে কিছুই দেখি না, শুনি না বউদি। তারপর সব ঝলখলি মিটলে আমি নৌকার গলুইয়ে বসে মুড়ি চিবুতে চিবুতে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার সামনে তেকাঠির সারি। গাঁটে গাঁটে লাল হলুদ নাকের ফুলের মতো ফুল ফুটে আছে। ফণিমনসা, বাজবরণ, বনঝামার ঝোপঝাড়। কাঁটায় ভরা বৈঁচি, শিয়াকুলের গাছ থেকে আমি কুল পাড়তাম। পাকা বৈঁচি কালচে লাল। একসঙ্গে অনেকগুলো মুখে পুরে চিবিয়ে খেলে খুব ভাল লাগে। শিয়াকুলের আঠা একটু দুধের মতো, ভারী টক। নুন দিয়ে খেতে খুব মজা লাগত।

বলতাম, খাবো নাকি মাঝিদাদা ?

মাঝিদা বলত, আমি কি তোর মতো জোয়ান আছিরে ভাই। তিনটা দাঁত নাই, টক খাইলে দাঁত শির্-শির্ করে।

ভুবনদা খেতে ভালবাসে, সে এলে তাকে খাওয়াতাম।

একদিন বৈঁচি খেতে খেতে ভুবনদা বলল, তোমাকে সোঁদরবনের খাঁটি মধু খাওয়াইব অলি। রোজ রোজ যে ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছিকে উড়ি যাইতে দেখ, তারা ঐ বনের মধ্যি চাক বানায়। মানুষের পা থিকে মাথা, এত বড় চাক।

আমার খুব আনন্দ হতো বউদি। কবে খাব তাই ভাবতাম।

মাথার উপর সূয্যি গেলে আমি খালের জল বালতিতে তুলে মাথায় ঢেলে স্নান করতাম। তারপর খাবার পাট চুকিয়ে আবার রান্নার কাজে লেগে যেতাম। রোদ মুছে যাবার আগেই কাজ থেকে ফিরে আবার সকলে খেতে আসত। খাওয়া চুকিয়ে ওরা ফিরে যেত সাঁঝের আগেই। ভুবনদা লৌকায় থেকে যেত। দুজনে মিলে সাফসুফ করে পরের দিনের জন্য কুটনো কুটে বাটনা বেটে রাখতাম। বউদি, গাছের মাথা থেকে রোদ নেমে গেলেই শয়ে শয়ে পাখি শব্দ করতে করতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত। ছায়ায় ঢেকে যেত চারদিক। মনে হতো অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে যে যার ঠিকানায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অমনি গাটা ছম্‌ছম্ করত।

রাত যত বাড়ত বনের চেহারা বউদি তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এখানে ওখানে জোনাকি আলো জেবলে কি যেন সব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাঁ কাঁ শব্দে কোনো গাছের ডালে বসে থাকা কাক্ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। বুঝতে হবে বনবেড়াল অথবা সাপে ধরেছে ওকে। শেষে ওর ঝটাপটি আর আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে আসত। একটা ভারী করুণ সুর উঠে শেষমেশ থেমে যেত। বাঘের ডাক শুনলে বুকের রক্ত জমে যেত বউদি। কখনো-সখনো ঐ অন্ধকার জঙ্গলে হুড়দাঙ্গার আওয়াজ শুনতাম। কোন জন্তু কাকে তাড়া করছে বুঝতে পারতাম না। সবকিছু মিলে তোমাকে কেউ যেন শান্তিতে ঘুমুতে দেবে না।

রাতে কখনো-সখনো ঘুম ভেঙে উঠে বসতাম। ভয়ে ভয়ে ডাকতাম, ভুবনদা, ভুবনদা, কে লৌকা নাড়ছে! বাঘের ভয়ে বউদি আমি তখন আধমরা। ভুবনদা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে টাঙিখানা হাতে টেনে নিত।

ধুস, বাঘ না হাতি। জুয়ার ঢুকছে খালে তাই লৌকা নড়ছে বোকা।

ভয়ের ভিতরেও হেসে মরি বউদি।

কিন্তু দু-হপ্তাও পার হলো না, আমার মুখের হাসি ভগবান কেড়ে নিল।

আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অলি।

সঙ্গীতা ওকে জড়িয়ে ধরল।

আমি বললাম, কি এমন ঘটল অলি যেজন্যে তুমি এমন করে কেঁদে ভাসাচ্ছ?

অলি কান্না থামিয়ে চোখ মুছল। বলল, বউদি, কি পোড়া মুখ দিয়ে সেদিন আমার বেরিয়ে গেল কটা কথা, ভুবনদা, তুমি রোজ বল সোঁদরবনের

মধু খাওয়াব, আমি কি মরে গেলে খাওয়াবে ?

ভুবনদা তখন আমাকে ভোরবেলার রান্নায় সাহায্য করছিল। সে বলল, আজ ঠিক খাওয়াব।

সবার সঙ্গে সকালের কাজে বেরিয়ে গেল, কিন্তু একা ফিরল দুপুরবেলা। এসেই বলল, আমি ওদের বলে এসেছি, আজ তোমাকে মৌচাক ভেঙে মধু খাওয়াব। আর বেশি পেলে ওদেরও দেব।

একটা মোটা খড়ের নুটি বানিয়ে আমার কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হলো ভুবনদা।

আমি বললাম, তুমি জানলে কি করে যে সামনের জঙ্গলে মৌচাক আছে ?

আমি একবার 'মউলে'দের লৌকায় মধু সংগ্রহের জন্যি এসেছিলাম সোঁদরবনে। আমি মৌমাছিদের উড়ন দেখলেই বুঝতে পারি কাছেপিঠে কোথায় মৌচাক আছে। তুমি বস, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি যাব আর আসব।

চাকে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি ওড়াবার জন্যে খড়ের নুটি হাতে নিয়ে জলা পেরিয়ে ছপছপ করে চলে গেল ভুবনদা। জঙ্গলে ঢোকার আগে পর্যন্ত আমি তাকে শেষবারের মতো দেখে নিলাম।

বউদি, বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল ও আর ফিরে আসছে না দেখে আমি কেঁদে পড়ে বললাম, মাঝিদাদা, আমি কোথায় যাই গো, ভুবনদা যে আর ফেরে না।

মাঝিদাদা বলল, তাই তো রে, ভারী চিন্তায় ফেলি দিল ভুবনটা। তুই ডাঙায় দাঁড়া, আমি লৌকায় গিয়ে ওদের খবর দি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টাঙি বল্লম নিয়ে এপারে এসে জুটল সবাই। তারা জলা পেরিয়ে হৈ হৈ করে ছুটল জঙ্গলের দিকে। ঠিকাদারও চলল হাতে বন্দুক নিয়ে। সবার শেষে 'সেদো'। আমার দিকে ভাঁটার মতো চোখ তুলে বলল, ডাইনি, তোর নাকি মধু খাবার নোলা হয়েছে ? যদি ভুবন বাঘের পেটে যায় তাহলে তোকে জ্যান্ত পাঁকে পুঁতে দেব। অলক্ষুণে অপয়া মেয়েমানুষ।

আমি কাঠের গুঁড়ির মতো থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বেশ খানিক অন্ধকার নামল। একা আছি বলে মনে একটুও ভয় নেই। খালি ভুবনদাকে ফিরে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছি। আর সেই কঠিন সময়ের প্রতিটা মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল ভুবনদাকে আমি আমার প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। ভুবনদাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

এমন সময় মাঝিদা এসে খবর দিল, ভুবনদা একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করে জখম হয়ে বনের মধ্যে পড়ে আছে। সবাই মিলে তাকে ওষুধ দিচ্ছে, ব্যান্ডেজ করছে।

খবরটা শোনামাত্র আমি নৌকার ওপরই অচৈতন্য হয়ে পড়লাম।

একদিন পরে আমার পুরো জ্ঞান ফিরেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হবার জন্যই যেন ভুবনদা তখনো বেঁচেছিল। তখন তার শরীরটা বাঘের নখের আঁচড়ে পুরো বিষিয়ে উঠেছে। আমার কোলে মাথা রেখে সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

এর পর আমি পুরোপুরি পাগল হলাম। সেদোকে বললাম, ভুবনদার চিতায় আমাকেও পুড়িয়ে মারো। কিন্তু ওরা তা করল না। তার বদলে আমার বুকে চিরদিনের মতো চিতা জ্বলতে শুরু করল। অলি দম নিয়ে এবারে হাসতে লাগল। বলল, ছোটবাবু, সারাটা জীবন আমি অভাগী। ছোটবেলা মাকে পেলাম না। বাবাও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তোমার সঙ্গে খেলতাম, তুমিও খেলা ভেঙে লেখাপড়া করতে চলে গেলে দেশে। তারপর সেই হাঘরে মেয়েটার সঙ্গী হলাম, সেও মায়া কাটিয়ে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি।

এবারে সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠে অলির গলার থেকে চাপা আর্তনাদের মতো কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এল, ভুবনদাও চলে গেল।

হঠাৎ সে এসে আমার হাতটা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল, ছোটবাবু, আমি তোমাদের মিছে কথা বলেছি যে আমি আমার মনের মানুষ পাইনি। আমি তাকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু আমার মন্দভাগ্য আমার কাছ থেকে তাকেও কেড়ে নিল।

মধুযামিনীতে সঙ্গীতার মনে কতটা মাধুর্য ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম তা জানিনা, তবে অতীতের অন্তরঙ্গ হৃদয়গুলির সুখ দুঃখের দোলায় দুলে আমার স্মৃতির প্রাঙ্গণ ঝরা বকুলের গন্ধে আকুল হয়ে রইল।

আপনি রঞ্জনদা ?

একটি সুদর্শন যুবক আমার মুখোমুখি এসে প্রশ্ন করল।

মাথা নেড়ে জানালাম, আমিই রঞ্জন। কিন্তু বিস্ময় আমার চোখে, তোমাকে তো চিনলাম না ভাই।

আমি অমৃতকান্তি। কলমদানের ষড়ঙ্গীদের আপনি চেনেন ?

চিনি বইকি। ঐ গ্রামে আমাদের আত্মীয় সুকুমারবাবুর ডাকে দু'তিন বছর আমরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছি। ষড়ঙ্গীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও ওঁরা বিশিষ্ট পরিবার। অনুষ্ঠানেও আন্তরিকভাবে যোগ দিয়েছিলেন।

অমৃতকান্তি বলল, ওটা আমার মামার বাড়ি। আমি ঐ জয়ন্তী উৎসবেই আপনাকে প্রথম দেখেছি। স্টেজের ওপরে বসে সুত্রধারের কাজ করছিলেন। তখন আলাপ হয়নি। ইচ্ছে ছিল আলাপ করি। আজ মুখোমুখি পেয়ে গেলাম। গত বছর বউদিকেও দেখেছি স্টেজের ওপর গানের দলে।

অমৃত মিষ্টি হেসে দু'হাত জোড় করে সঙ্গীতার দিকে তাকাল।

সঙ্গীতার হাতে সদ্য কেনা বর্ষার কেয়া। সে হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানাতে পারল না। অমৃতকান্তির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, একদিন আমাদের বাসায় আসুন না।

পরিচয় যখন হলো তখন আপনাদের বাসায় আমাকে মাঝে মাঝে উদয় হতে দেখবেন। কিন্তু আজ তো আপনাদের মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বো না।

বললাম, সেকি ! তুমি আমার চেয়ে ছোট, প্রথম মিষ্টি আমিই খাওয়াবো।

অমৃতকান্তি তেমনি হাতজোড় করে মাথা নাড়তে লাগল। আজ আমাকে খাওয়াতে দিন, আজ আমার দিকের একটি শুভ সংবাদ আছে।

শুভ সংবাদটি শোনার জন্যে আমি আর সংগীতা অমৃতকান্তির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকালাম।

অমৃতকান্তি বলল, আজই আমার পি. এইচ. ডি-র ভাইভা সেরে এসে পথে প্রথম আপনাদের মুখোমুখি হলাম।

আমি সঙ্গে সঙ্গে অমৃতকান্তিকে জড়িয়ে ধরলাম।

সংগীতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আজ আপনার দেওয়া মিষ্টি অবশ্যই খাব কিন্তু আগামী রোববার আমার বাসায় আপনার নিমন্ত্রণ। নতুন পি. এইচ. ডি-র সম্মানে ভোজের আয়োজন।

অমৃতকান্তির চোখ ততক্ষণে কেয়াফুলের ওপর পড়েছে।

কেয়াফুল কিনলেন বুঝি ?

সংগীতা বলল, আর বলবেন না ভাই, আপনার দাদার শখ। সন্তোষপুরের বাসায় বসে বর্ষার মেঘ দেখছিল, হঠাৎ ফরমাস হলো বর্ষার গানের। গীতবিতান থেকে কয়েকটি বর্ষার গান হলো। আশা আর মেটে না, বলল, 'ঐ আসে ঐ অতি···'। বললাম, ও তো সম্মেলক গান। কে শোনে কার কথা। গান তখন ওর প্রাণে চেপে বসেছে। বলল, তা হোক, গান গান, যে পথ দিয়ে হোক প্রাণে পৌঁছলে হলো। যেই শুরু হলো, 'কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি'—অমনি বলে উঠল, চল কেয়াফুল কিনে আনি।

বললাম, কেয়া পাবে কোথা ?

ওসব ঘাঁটি আমার চেনা আছে। চিৎপুরের ফুলের দোকানে বর্ষায় কেয়া পাওয়া যায়। ভাগ্য ভাল থাকলে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটেও ও ফুল মিলে যেতে পারে।

ব্যস্, অমনি যাদবপুরে ট্রেন ধরে শেয়ালদায় নামা, তারপরে এই ফুল কিনে ফিরছি।

অমৃতকান্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দারুণ রোমাণ্টিক ব্যাপার। বৌদি, আপনার রোববারের আমন্ত্রণ শিরোধার্য। ভোজনের আহ্বান যে বিপ্র প্রত্যাখ্যান করে সে কলিযুগে ব্রাহ্মণ পদবাচ্যই নয়।

আমি সন্তোষপুরে আমার বাসার হদিস ওকে দিয়ে দিলাম।

রোববার সংগীতা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে রইল। কয়েক পা দূরেই বাজার। ভোরবেলাতেই আমি বাজারের কাজ সেরে ফেলেছি সংগীতার বিশেষ ফর্দ অনুযায়ী।

হঠাৎ পেছন থেকে শব্দ উঠল, ব্রাহ্মণ হাজির।

আমি ফিরে দেখি কখন নিঃশব্দে অমৃতকান্তি আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হেসে বললাম, ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন পুরোদমে চলেছে। ঘরের ভেতর

বসবে, না বাইরে এই বারান্দাতেই বসে আড্ডা দেওয়া যাবে ?

খোলা বারান্দাই তো ভাল।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, অতিথির জন্যে একটু চা হবে কি ?

সংগীতা ভেতর থেকে বলল, সে আমি বুঝবো, তবে তুমি আর পাচ্ছো না। সকাল থেকে দু-কাপ হয়ে গেছে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, দু-কাপ আমি খেয়েছি ? তোমার বাজার সরকার এক কাপ খেয়েছে আর এক কাপ খেয়েছে তোমার এই অধম জীবন-বল্লভ।

অমৃতকান্তি চেঁচিয়ে বলল, বৌদি, 'একাকী গায়কের নহে ত গান'—ঠিক তেমনি মুখোমুখি বসে একজন অমৃত পান করবে আর অন্যজন উপনিষদের পাখির মত তার দিকে চেয়ে থাকবে, চায়ের নীতিশাস্ত্র একথা বলে না।

সংগীতার সুরেলা গলা ভেসে এল, রামায়ণের পরে এই দ্বিতীয়বার লক্ষ্মণ ভাইটিকে দেখলাম।

কিছু পরেই ট্রে-তে চা আর নকশা বড়ির ভাজা এল।

এই শিল্পকর্মটি কার ?

আমি বললাম, আর যার হোক যিনি পরিবেশন করছেন তাঁর হাতের সৃষ্টি যে নয় এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

সংগীতা বলল, এই নকশা বড়িটি আমর শাশুড়ী মায়ের তৈরী।

বললাম, একসময় অবনীন্দ্রনাথের হাতে এই শিল্প বস্তুটি আমাদের কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়া দিয়ে বলেছিলেন, এটি গরম তেলে ছেঁকে নিয়ে খেলে খুব ভাল লাগে।

অবনীন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে বলেছিলেন, একে তেলে ভেজে খাব কি ! এ তো সাজিয়ে রাখার জিনিস।

মুখে যাই বলুক, সংগীতা বেরসিক নয়। দুটি পূর্ণকাপই নিয়ে এসেছে।

আমরা গল্প করতে করতে চায়ে চুমুক আর মুচমুচে গয়না বড়ির সদ্ব্যবহার করতে লাগলাম।

কথার মাঝে জানতে চাইলাম, এখন কি করছো অমৃত ?

বিশ্বাস করুন দাদা, এক ডজন অ্যাপলিকেশন বিভিন্ন কলেজে পাঠিয়েছি, উত্তর পেয়েছি দুটি মাত্র। অত্যন্ত দুঃখের সংগে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, 'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই'।

তাহলে এখন কি করবে ভেবেছ ?

পুরনো মেসে বন্ধুদের ঘাড়ে চেপে আছি। অনেকদিনের বন্ধুত্ব তাই ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। এদিকে দেশ থেকে ঘন ঘন চিঠি আসছে ; একটা কিছু কর, নাহলে দেশে চলে এসো, নিদেনপক্ষে একটা মাস্টারি জুটে যাবে। রঞ্জনদা, একবার কলকাতা ছাড়লে আর এ মহানগরীতে ফিরে আসা যাবে না।

কিন্তু চাকরি ছাড়া চালাবে কি করে ?

অমৃতকান্তি চুপচাপ বসে কি ভাবল। একসময় বলল, বিভিন্ন কলেজে

আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু রয়েছে। ওরা আমাকে বলছিল, কলেজ লাইব্রেরীতে অনেক টাকার বই কেনা হয়, আমি যদি সাপ্লাই করতে রাজী থাকি, তাহলে অর্ডারগুলো ওরা পাইয়ে দিতে পারে।

আমি গুরুত্ব দিয়ে বললাম, এ তো বেশ ভাল পরামর্শ।

অমৃত বলল, পরামর্শ ভাল, কিন্তু দাদা যে সাপ্লাই করবে তার রেস্ত কই? তাছাড়া কলেজ স্ট্রীটে একটা ডেরার ঠিকানা তো দিতে হবে।

বললাম, দুটো সমস্যা। একটা পুঁথিঘরের ঠিকানা আর অন্যটা অর্থের সংস্থান। তা মিনিমাম কতটুকু টাকা হলে সাপ্লায়ের কাজটা ধীরে ধীরে চালাতে পারবে?

কমপক্ষে হাজার দশেক, যদিও টাকাটা লাভসমেত মাসখানেকের মধ্যে অবশ্যই হাতে ফিরে আসবে।

কলেজ স্ট্রীটে কোনো আস্তানার হদিস পেয়েছো কি?

এক পরিচিতের মুখে শুনেছি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে নীলামের মাধ্যমে কয়েকটা ছোট ছোট স্টল বিলি করবে কর্পোরেশন।

বললাম, কাল আমার কলেজে এসো কথা হবে।

অমৃতকান্তি অভাবেও রসিক চূড়ামণি। বলল, দাদা আপনাদের তো মহিলা কলেজ। এ অধম ঢুকতে গিয়ে গেট থেকে দরোয়ানের তাড়া খাবে না তো?

বললাম, রঞ্জনদার নাম জপ করতে করতে উঠে এসো চারতলার ওপরে। সকাল ন'টা কুড়ির পর কিন্তু।

রাতে সঙ্গীতার সঙ্গে পরামর্শ হলো। সঙ্গীতা আশ্বাস দিল, দশ হাজার টাকার সংস্থান হয়ে যাবে। তবে পুঁথিঘরের স্পেসের জন্য নীলামে কর্পোরেশনকে কত দিতে হবে তা না জানলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সঙ্গীতা মাস কয়েক হলো একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজে ঢুকেছে। আমি যেখান থেকে যা কুড়িয়ে আনি সবই তুলে দি ওর হাতে। অঙ্কশাস্ত্র আমার আয়ত্তের বাইরে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একবার অঙ্কে রসগোল্লা পেয়েছিলাম। সঙ্গীতা কিন্তু এ বিষয়ে আমার শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

পরের একটি মাস আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নীলামের ডাকে স্পেসটাও হাতে এসে গেল। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ভেতর 'বিদিশা' নাম দিয়ে দোতলা একটি কাঠামো তৈরী করা হলো। কাজ পাই আর না পাই অন্ততঃ নিজেদের আড্ডা দেওয়ার একটা আস্তানা হলো ভেবে আমরা দারুণ খুশী। পুজোর ছুটির আগে কিন্তু কোনোরকম অর্ডার সংগ্রহ করতে পারা গেল না। সেটা লাইব্রেরীর জন্য বই কেনার মরশুম ছিল না।

অমৃতকান্তি কিন্তু এখন আমার পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। এক রোববার ও আমার বাসায় এল। সবে পুজোর ছুটি পড়েছে। এসময় বাইরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে মন। সঙ্গীতার সঙ্গে এ নিয়ে কয়েকদিন আলোচনা চলছে।

অমৃতকান্তিকে বললাম, ভাই পুজোর ছুটিতে ব্যবসা পত্তর সিকেয় তোলা থাক। একটু ঘুরে আসি কোথাও থেকে। কলকাতায় মন একেবারে টিঁকছে না।

কোথায় যাচ্ছেন?

কিছুই এখনও ঠিক করতে পারিনি, তবে যেতে যে হবে এটা ঠিক করে ফেলেছি।

সঙ্গীতা চা আনল। সে আমাদের টুকরো কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিল। হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলল, ব্যাঙ্কের অবস্থা সুবিধের নয়, তাই একেবারে কাছেপিঠে ছাড়া দূরের স্বপ্ন দেখার উপায় নেই।

অমৃতকান্তি হঠাৎ বলল, অরণ্য-দর্শনে আপত্তি আছে?

সঙ্গীতা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কিরকম?

সিংভূমের সারান্দা ফরেস্টের নাম শুনেছেন?

বললাম, পাহাড়ের কোলে গভীর অরণ্য। একেবারে নামকরা ফরেস্ট। বাঘ, হাতি, বাইসন, হরিণ, কোনোকিছুরই অভাব নেই।

সঙ্গীতা বলল, দারুণ ব্যাপার। কিন্তু ওখানে যাওয়া যাবে কি করে ভাই?

অমৃতকান্তি বলল, সে ব্যবস্থা আমার। থাকা, খাওয়া, ঘোরার সব ভার আমি নেব। দিন পনেরোর প্রোগ্রাম, কেবল টিকিটের খরচ আপনাদের। এ অধমের টিকিটটাও কিন্তু।

সঙ্গীতা বলল, সত্যি! এ যে আশাতীত সুযোগ।

বললাম, অরণ্যের গাছে তুলে দিয়ে মইটা টেনে নেবে না তো ভাই?

অমৃতকান্তি হাসতে হাসতে বলল, টাকা না থাকলেও অনেক কিছুই করা যায়, শুধু জনসংযোগ থাকলেই হলো।

সঙ্গীতা বলল, খুলে বলুন ভাই, কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীলের 'আয়রন ওর' সারান্দার গায়ে গুয়ার পাহাড় ফাটিয়ে আনা হচ্ছে। ওখানে যে টাউনটি গড়ে উঠেছে, সেখানকার হাসপাতালের ডাক্তার আমার মামা। তাঁর ওখানে একবার গিয়ে পড়তে পারলে পনের দিনের আগে আর ছাড়া পাওয়া যাবে না।

বললাম, তুমি না হয় ভাগ্নে জগন্নাথ, আমরা দুজন উটকো পনের দিন তোমার মামার অন্ন ধ্বংস করে যাব, এ কিরকম?

অমৃতকান্তি বলল, আপনি তো মামাকে চেনেন না। দেশওয়ালী কোনো লোক গেলে মামা তাকে অক্টোপাসের মতন জড়িয়ে ধরেন। সহজে ছাড়া পাওয়া দুষ্কর।

সঙ্গীতা বলল, তাহলে আজই চিঠি লিখে দিন।

চিঠি-টিঠি কিছু লেখার দরকার নেই। হঠাৎ গিয়ে চমকে দেওয়া যাবে।

বললাম, আজই টাকা নিয়ে যাও, টিকিট কাটার ভার তোমার।

গুয়া স্টেশানে নেমে মনে হলো, একটা স্বপ্নের জগতে এসে পড়েছি। ঝকঝকে

নীল আকাশ, এদিকে ওদিকে দু'এক টুকরো সাদা মেঘ ছড়িয়ে আছে। সামনে পেছনে সবুজ তরঙ্গিত শালবন। আমরা উঁচুনীচু পথ ধরে মামার কোয়ার্টারের দিকে চলেছি। হঠাৎ রিম্‌ঝিম্‌ করে শেষ শরতের বৃষ্টি জুঁই ফুলের মতো আমাদের ওপর ঝরে পড়ল।

মামার কোয়ার্টারে মামীমা-ই আদর করে আমাদের ডেকে নিলেন। মামা তখন ডিউটিতে।

অমৃতকান্তি বলল, তুমি তো এঁদের পরিচয় জানতে চাইলে না মামীমা ?

মামীমা বললেন, তোমার সঙ্গে যখন এসেছে তখন অপরিচয়ের তো কিছু নেই।

একটু থেমে বললেন, আগে মুখ হাত ধুয়ে এসো তারপর পরিচয় নেওয়া যাবে।

আমরা মুখ হাত ধুয়ে বারান্দায় বসে গল্প করতে লাগলাম। মামীমা একসময় আলুর পরটা ভেজে আনলেন, সঙ্গে পেল্লাই সাইজের কয়েকটা লাড্ডু।

পরটা খেতে খেতেই মামীমার সঙ্গে পরিচয় পর্ব হয়ে গেল। মামীমা অমনি নাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন, দারুণ পছন্দ তো তোমার। সঙ্গীতাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

অমৃতকান্তি বলল, এখুনি ভাল লাগার কি হয়েছে, ওঁর গলার গান আগে শোন, তারপর মন্তব্য করবে।

কথা বলছি, ডাক্তার মামার উদয়। আমাদের দেখে দারুণ হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন।

ভাগ্নেরা খুব শুভদিনে এসে পড়েছো দেখছি।

আমি হেসে বললাম, কিরকম ?

আর বল কেন, কিছুদিন ধরে হস্‌পিটালের সি. এম. ও. ডাক্তার সর্দানা আমাকে এখান থেকে সরাবার ধান্দায় ছিল, আজ হস্‌পিটালের সমস্ত স্টাফ সর্দানার ঘরে ঢুকে বলে এসেছে, ডাঃ ষড়ঙ্গীকে এখান থেকে সরাবার চেষ্টা করলে ডাঃ সর্দানার গর্দানটি এই গুয়াতেই রেখে যেতে হবে।

ডাঃ সর্দানা এ অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকবে বলে কথা দিয়েছে। তাই বলছিলাম, ভাগ্নের ভাগ্যে মামার জয়।

বললাম, আপনাকে সরাবার জন্যে সর্দানা এমন উঠে পড়ে লাগলেন কেন ?

প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সময় একজনের চেম্বারে যদি রোগীর জোয়ার বয় আর অন্যজনের চেম্বারে যদি ভাটার টান থাকে তাহলে বসের মেজাজ কি করে ঠিক থাকে বল ?

আমি হেসে বললাম, বুঝেছি, মোক্ষম জায়গায় ঘাটি পড়ায় সর্দানা সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এরপর মামার নেতৃত্বে আমাদের পনেরো দিনের ভ্রমণের একটা ছক তৈরী হলো।

ঠিক দু'দিন পরেই মামার কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা জীপ।

মামা বললেন, আজ রাতের খাওয়া-দাওয়া তোমরা ফরেস্ট বাংলোতেই সারবে। আজ তোমাদের সারা রাতের প্রোগ্রাম। জীপ তোমাদের নিয়ে রাতের বন ঘুরে দেখাবে।

আমি বললাম, রাতে কি বন দেখা যাবে?

আজ শুক্লা একাদশী। বেশ কিছু সময় চাঁদের আলো পাবে, কিন্তু এটা বড় কথা নয়। রাতে জঙ্গলে যে সব জানোয়ার থাকে তাদের পুরোপুরি দেখতে না পেলেও কিছুটা পরিচয় নিশ্চয় পাবে।

আমি বললাম, দিনের বেলা আমরা ফরেস্টের অন্ধিসন্ধি ঘুরে ফিরে দেখতে পাব না?

মামাবাবু বললেন, তার জন্যে অনেকগুলো দিন রাখা আছে। মাঝে মাঝে তোমরা রাতের বনটাকে ভাল করে দেখে নেবে। পূর্ণিমা সামনে, কিন্তু পর পর রাত জেগে বনে ঘোরা সম্ভব হবে না। তাই কয়েকদিন অন্তর অন্তর রাতের প্রোগ্রাম ছ'কে রেখেছি।

সঙ্গীতা বলল, মামাবাবু আমরা পূর্ণিমাতে সারারাত বনে ঘুরবো।

মামাবাবু তাঁর টেবিলের ড্রয়ার টেনে প্রোগ্রামের ছককাটা কাগজখানা বের করলেন।

এই দ্যাখো, পূর্ণিমায় সারারাত ভ্রমণের প্রোগ্রাম করা আছে। কুমুডি, থসকোবাদ ইত্যাদি বাংলোতে দরকার মতো দিনে রাতে ঘুরে ঘুরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এখন থেকে মামার বাড়ীতে রাত-দিনে থাকার পাট উঠে গেল। কোনোদিন রাতে কোনোদিন দিনে মামীমার রসুইখানায় তোমাদের পাত পড়বে। এখন কথা না বলে ঝটপট তৈরী হয়ে নাও জীপে ওঠার জন্যে।

বললাম, আমরা কি তিন জন জীপে যাব?

মামাবাবু বললেন, না, আর একজন তোমাদের সঙ্গী হবে, তাকে হস্‌পিটাল থেকেই জীপ তুলে নেবে।

অমৃতকান্তি বলল, ছোটমামা আমাদের সঙ্গে যিনি যাবেন তিনি স্ত্রীং না পুং?

ব্যাটা তুমি খুব ওস্তাদ আছো, আগাম জানতে চাও। সে সঙ্গীতার পাশে বসবে।

অমৃতকান্তি বলল, বুঝেছি।

যে যাচ্ছে, তোমার পাশে বসতেও তার কোনো অসুবিধে নেই। বাঘের আঁচড়-কামড় খেলে সে-ই তোমাদের ভাল করে স্টিচ্‌-টিচ্‌ গুলো করে দিতে পারবে।

মামীমা বললেন, এত হেঁয়ালী করছো কেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে? বলই না, ডাক্তার উর্মিলা তলোয়ার ওদের সঙ্গী হচ্ছে।

সঙ্গীতা বলল, বেশ আনন্দের খবর। স্বজাতীয়া একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

মামাবাবু বললেন, তরুণী, সদ্য এম. এস. ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভাগ্নে সুন্দরী থেকে সাবধান। ওর ছুরি বাঘের নখের চেয়েও ভয়ংকর।

অমৃতকান্তি বলল, দেখতে তো চলেছেন রাতের বন, সঙ্গে আবার ছুরি-কাঁচি থাকবে নাকি ?

গুপ্ত থাকবে। প্রয়োজনে মুহূর্তে ওগুলো বেরিয়ে আসবে।

সংগীতা অমনি বলল, একেবারে ধারালো সুন্দরী।

মামাবাবু হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, দারুণ বললে তো।

আমরা জীপে উঠে রওনা দিলাম। তখন ঘড়িতে চারটে বেজেছে। হসপিটাল থেকে উঠলেন ডাঃ তলোয়ার। সালোয়ার কামিজ পরেছেন! যথার্থ সুন্দরী মহিলা, হেসে সবাইকে নমস্কার করলেন।

পেছনে চারজন বেশ ছড়িয়ে মুখোমুখি বসতে পারে। সংগীতা আগে ভাগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আমি আর সংগীতা একদিকে আর অমৃত-কান্তির পাশে ডাঃ তলোয়ারের ঠাঁই।

অমৃত আস্তে-আস্তেই বলেছিল, আমাকে একেবারে বাঘিনীর মুখে ঠেলে দেবেন না বৌদি।

সংগীতা বলেছিল, তোমার বরাত জোর থাকলে বাঘিনীও অনুরাগিনী হতে পারে।

বৌদির সঙ্গে অমৃতকান্তির এখন আপনি থেকে তুমি-র পর্যায়ে যোগাযোগ চলছে।

ডাক্তার তলোয়ারের সঙ্গে অল্প সময়ের ভেতরেই আলাপ জমে উঠল। ইংরাজী আর ভাঙা হিন্দির জগাখিঁচুড়িতে আড্ডা জমজমাট। যুবতী ভারী আমুদে। সারাক্ষণ কথাবার্তায় হাসি ছড়িয়ে চলেছেন।

বললাম, ডাঃ তলোয়ার কি বাংলাভাষা এক আধটু বোঝেন ?

উনি মিষ্টি হেসে বললেন, একটি মাত্র শব্দ জানি আর সেটা শিখেছি ডাঃ ষড়ঙ্গীর কাছে—'নমোস্কার'।

শব্দটা উচ্চারণ করেই হাসিমুখে হাত জোড় করলেন ডাঃ তলোয়ার।

ডাঃ তলোয়ারের পাশ থেকে অমৃতকান্তি বলে উঠল, দাদা বড় সুখবর। প্রাণ খুলে দেশওয়ালী ভাষায় টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য ইত্যাদি করা যাবে।

সংগীতা অমনি বলল, না, ওটি একেবারে চলবে না। একজন কিছু বুঝবে না বলে খামোকা তাকে নিয়ে রঙ্গরসের ফোয়ারা ছোটাবে সে চলবে না। আমি মেয়ে হিসেবে সবসময় ডাঃ তলোয়ারের পক্ষে জানবে। আর তাছাড়া এমন দিলদরিয়া সুন্দর স্বভাবের একটি মেয়ে, তাকে নিয়ে টীকা-টিপ্পনী কি ? আমার নিজের ভাই থাকলে ওকে ভাইয়ের বউ করে নিতাম।

অমৃতকান্তি মাথার চুল মুঠো করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমি কি তোমার ভাই নই বৌদি ?

সংগীতা বলল, সে কি মুখে প্রকাশ করার ভাই ?

আমরা বাংলায় কথা বলছিলাম আর ডাঃ তলোয়ার আমাদের মুখের দিকে

তাকিয়ে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন।

দু'একটা নেড়া পাহাড়ের টিলা পেরিয়ে এল আমাদের জীপ। এরপর আদিম অরণ্যের ভেতর পশুরাজ সিংহের মতো গরগর করতে করতে ঢুকে পড়ল আমাদের যন্ত্রযানটি। কোথাও কোথাও গাছের জটলা অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে। আবার কোথাও বা জঙ্গল হাল্কা হয়ে সূর্যালোক প্রবেশের পথ করে দিচ্ছে। জীপের গর্জন শুনে একটা পত্র-বহুল গাছের ডাল থেকে এক ঝাঁক পাখি পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে চলে গেল।

আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, কি পাখি উড়ল?

চালক একটুখানি ব্রেক কষে বলল, সাহেব, সারজম গাছ থেকে বনমোরগ আর সারো-ময়নার দল উড়ে গেল ভ্যালির দিকে।

আমি বললাম, তোমরা সকলে যদি অনুমতি কর তাহলে আমি একটু সামনে গিয়ে বসি।

সঙ্গীতা বলল, বেশতো যাও না।

অমৃতকান্তি বলল, আমাদের পরিত্যাগ করলেন দাদা?

সঙ্গীতা বলল, বনবাসে এসে উদ্ভিদ-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করছে তোমার দাদা।

আমি গাড়ি থেকে নেমে সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

আলোছায়ার লীলাক্ষেত্র সারান্দা ফরেস্ট। ছায়ার ভেতর ঢুকছি, কোথাও নিবিড়, কোথাও ফিকে। আবার ছায়ার তোরণ থেকে বেরিয়ে আসছি আলোর জগতে।

একবার একটা গাঢ় ছায়ার থেকে বেরুবার সময়ে অপূর্ব একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। পাতায় ছাওয়া একটি গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের সোনালী এক-ঝাঁক তীর ছুটে আসছে। আমাদের গায়ে মাথায় তার স্পর্শ রেখে গেল। পথের দু-পাশে ছোট ছোট ঝোপ—তার মাঝে মাঝে লম্বা বড় বড় ঘাস। কোথাও গাঢ় সবুজ, কোথাও বা কচি কলাপাতার রঙ। বর্ষা-ধোওয়া শরতের গাছপালা ঝলমল করছে। তারই ওপর এসে পড়েছে শেষবেলার রোদের সোনা। যে দৃশ্য ভোলার নয়।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, যে গাছটার আড়ালে সূর্য আটকা পড়েছে, ওর নাম কি?

বারম। ওর ডাল-পাতা জড়িয়ে উঠেছে তেউড়ির লতা, তাই এত ঘন দেখাচ্ছে।

গাছটার কাছাকাছি হতেই দেখা গেল তেউড়ির লতা-ভরে ফুল ফুটেছে। হাল্কা নীল আর সাদায় মেশা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল।

পাহাড়ী বাঁকে গাড়ি চলেছে। পাশে জঙ্গলে ভরা গভীর খাদ। আলোর ছোঁওয়ায় মায়াময়। ভেতরে ওরা গল্পে মেতেছে। মাঝে মাঝে জীপের পেছন থেকে দেখছে পিছলে যাওয়া বনের শোভা। টুকরো টুকরো ভাল লাগার মন্তব্য আমি সামনে বসে শুনতে পাচ্ছি।

বেলাশেষের আলোর রঙে হঠাৎ মধুর ছোঁওয়া লাগল। কী অপরূপ সে রঙ! মধুবিন্দুর মতো পাহাড় থেকে উপত্যকায় গড়িয়ে পড়ছে। গাছের মাথা থেকে ঝরে পড়ছে নীচের ঝোপঝাড়ে। সেখান থেকে চলে যাচ্ছে পাশের খাদে অজস্র লতাগুল্মের জটিল জটায়। শেষবেলায় নীড়ের আশ্রয়ে ফিরে আসছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি। দূরে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকেই পাখীরা উড়ে আসছে পাহাড়ের ওপর তাদের রাতের আশ্রয়ে। পাখিদের ডানায় সেই সোনালী মধুর ঝিলিক। এক ঝাঁক শুগা পাখি সবুজ পাতার মতো ছেয়ে ফেলল আকাশ। তার পর ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ তুলে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছটা দখল করে বসল। গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল লাল লাল ছোট ছোট ফুল। ফুলের লালে, পাখির গায়ের সবুজে মিলে মিশে সে এক মনোরম শোভা।

দাদাজী, ডানদিকে দেখুন—জীপের ভেতর থেকে ডাঃ তলোয়ারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

একটা নদী সিঁথির মতো উপত্যকার সবুজ চিরে বয়ে চলেছে। তার প্রবাহে সূর্যের শেষ সোনার স্পর্শ। নদীর দুপারে তরঙ্গিত শালের বন দূরের পাহাড় ছুঁয়ে প্রসারিত।

আমরা প্রকৃতির এই আনন্দ-যজ্ঞে যেন একদল নিমন্ত্রিত অতিথি। সূর্য এখন পাহাড়ের আড়ালে। ঘুমের দেশে যাবার আগে দেব দিবাকর কি মধুর রেশ রেখে যাচ্ছেন আকাশের গায়ে ছড়ানো টুকরো টুকরো মেঘের বুকে। সাদা মেঘগুলো অনুরাগের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে।

সম্ভবতঃ অমৃত তার বৌদির কাছে গানের ফরমাস করেছে। ধীরে ধীরে সুর ছড়িয়ে পড়ল শেষ সূর্যের ছোঁওয়া-লাগা অরণ্য প্রকৃতির বুকে।

'মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হলো শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ ॥
দিনান্তের এই এক কোনাতে সন্ধ্যা মেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥'

এ গান আমার প্রাণের গান। শত শত শ্রোতার মুগ্ধ আত্মনিবেদনে এ গান অমরত্ব লাভ করেছে। মহাকবির উপলব্ধির কি আশ্চর্য উচ্চারণ!

অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠল। আমাদের গাড়ি এসে ঢুকল ফরেস্ট বাংলোতে। গার্ড সেলাম দিয়ে সরে দাঁড়াল। আলো হাতে এগিয়ে এল একটি মেয়ে। আমরা সে আলোর পথ ধরে উঠে এলাম বাংলোর ওপর। সিমেন্ট মাজা ঘরের মেঝে আর দেওয়াল, সুন্দর খড়ের ছাউনি। সামনে ফুলের লন। হ্যাজাকের আলোয় পুরো লনটা দেখতে না পেলেও মাথা নেড়ে ফুলেদের

অভ্যর্থনার কিছু কিছু ছবি চোখে পড়ল।

রেঞ্জার মিঃ চৌধুরী দারুণ আন্তরিকতায় আমাদের প্রত্যেককে অভ্যর্থনা জানালেন। একটু অভিমানের সুরে ডঃ তলোয়ারের করমর্দন করতে গিয়ে বললেন, তবু সৌভাগ্য এত দিন পরে এলেন।

জেনেছিলাম, বিপত্নীক রেঞ্জার সাহেব একবার চিতার অতর্কিত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গুয়ার হসপিট্যালে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাঃ তলোয়ারের হাতের ছোঁওয়ায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ এই মানুষটি ডাঃ তলোয়ারকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ফরেস্টে তাঁর অতিথি হওয়ার জন্যে। যে কোনো কারণেই হোক ডাঃ তলোয়ার এত দিন সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। এখন মামার পরামর্শে আমাদের সঙ্গে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন।

ভোজের বিপুল আয়োজন ছিল। চৌধুরী সাহেবের লক্ষ্যভেদে দারুণ সুনাম। মামার মুখে সে কাহিনী অবগত হয়েছিলাম।

চৌধুরী সাহেব বললেন, বনে এসেছেন, তাই বন-মোরগের রোস্ট দিয়ে আজ আপনাদের প্রথম আপ্যায়ন করা হলো।

বললাম, এ আপনার হাতের শিকার নিশ্চয়।

হেসে বললেন মিঃ চৌধুরী, এ বনে আর কাউকে বন্দুক চালাতে দিই না।

একটু থেমে বললেন, আজ আমাদের খাওয়ার পাট একটু তাড়াতাড়ি চুকিয়ে নিতে হবে। কারণ ডাঃ ষড়ঙ্গীর যে চার্ট আমার হাতে এসে পোঁছেছে তাতে আজকের রাত আপনাদের নিদ্রাহীন কাটবে।

বললাম, সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

চৌধুরী বললেন, অবশ্য শেষ রাতে আর একটা বাংলোয় আপনাদের তুলে দেব। আপনারা সেখানে যতক্ষণ খুশি ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।

রান্নার প্রতিটা পদ ভারি চমৎকার। খেতে খেতেই বললাম, কার হাতের রান্না?

মিঃ চৌধুরী বললেন, যে মেয়েটি আপনাদের আলো দেখিয়ে নিয়ে এল।

বললাম, মেয়েটি আদিবাসী বলে মনে হলো।

হাঁ, 'হো' সম্প্রদায়ের মেয়ে। রান্না শেখাতে হয়েছে, কিন্তু এরই ভেতরে ওর হাত একেবারে পাকা হয়ে গেছে।

দুজন বেয়ারা পান থেকে যাতে চুন না খসে, এমনি তদারকি করছিল আমাদের। তারাই গাড়িতে কতকগুলো জিনিস তুললো। ফ্লাস্কে গরম কফির ব্যবস্থা রইল। স্পট লাইট, টর্চলাইট ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন সবই নেওয়া হলো। এখন আমি আমার পেছনের জায়গাটিতে এসে বসলাম। সামনে বসলেন রেঞ্জার সাহেব। একটা উত্তেজনায় আমাদের সকলের মনই টানটান হয়ে আছে। গাড়ি গর্জন করে উঠল। দুটো হেডলাইটের আলো অন্ধকারের বুক চিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের জঙ্গলের ওপর।

রাতের অরণ্য মুহূর্তে তার অন্দরমহলের দ্বার খুলে দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই

অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে সেই উজ্জ্বল প্রাসাদগুলি। গাড়ি বাঁক নিলেই আমরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছি। টাল সামলাবার চেষ্টা করলেও ঠিক পারা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে আমাদের উল্টোদিকের বেঞ্চ থেকে 'সরি' 'সরি' আওয়াজ উঠছে। প্রধানতঃ ডাঃ তলোয়ারের কণ্ঠস্বর। সম্ভবতঃ ডাঃ তলোয়ার টাল সামলাতে না পেরে অমৃতকান্তির ওপর টলে পড়ছিলেন, তাই মাপ চেয়ে নিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। আমাদের সে বালাই ছিল না। যত খুশি যে যার ঘাড়ে, পড়, কারো কিছু বলার নেই। প্রথম পরিচয়, প্রথম ছোঁওয়া লাগার রোমাঞ্চই আলাদা। সে কথা সঙ্গীতার কানে চুপি-চুপি বলতেই ও তার পাঁচটি আঙুল আমার চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে হাল্কা একটা ঝাঁকনি দিল।

হঠাৎ জীপটা আলো নিভিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। সবাই নিঃশব্দে বসে রয়েছি। অরণ্যের নিঃস্তব্ধতা যে এত গভীর তা রাতের অরণ্যে না এলে বোঝা যায় না।

যখন অন্ধকারে কিছুটা ধাতস্থ হলাম তখন দূরে কোথাও একটানা করাত চলছে বলে মনে হলো। আমি ভাবলাম, রেঞ্জার সাহেব সম্ভবতঃ চোরাকারবারের কিছু গন্ধ পেয়েছেন। তাই জীপের আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করছেন। নিশ্চয় রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে বনের বাইরে চালান করে দেওয়ার মতলব।

সামনের সীটে বসে আছেন রেঞ্জার সাহেব। অন্ধকারে কি একটা খুটখাট শব্দ উঠছে। রেঞ্জার কি তাঁর বন্দুকে গুলি ভরছেন!

আমি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যেন করাত চলছে বলে মনে হচ্ছে। কেউ গাছ কাটছে কি?

রেঞ্জার সাহেব বললেন, না না, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

আমি গ্রামের ছেলে, আমাকে অত সহজে বোঝানো যাবে না। কারণ রাতে গ্রামের ঝোপে-ঝাড়ে, গাছপালায় অনেক ঝিঁঝিঁর একটানা ঐকতান শুনেছি। সে শব্দে করাতের আওয়াজ নেই।

বললাম, এ কেমন ঝিঁঝির ডাক!

রেঞ্জার বললেন, পাহাড়ী ঝিঁঝি আকারে বড় আর এমন করেই শব্দ তোলে। প্রথমে যখন সারান্দায় আসি তখন আমারও এই শব্দ শুনে করাত চালিয়ে কেউ গোপনে গাছ কাটছে বলে মনে হয়েছিল। সে সময় ভুল ভেঙে দিয়েছিল ফরেস্ট-গার্ড।

আমরা সকলেই অবাক হলাম। কারণ আমার মতো সকলেরই মনে হয়েছিল ওটা অন্ধকারে করাত চালানোর আওয়াজ।

হঠাৎ রেঞ্জার বললেন, এবার লক্ষ্য করুন নিচের দিকে, আমি স্পট-লাইট ফেলছি।

খাদের জঙ্গলে স্পট-লাইটের আলো গিয়ে পড়ল। অমনি মনে হলো জঙ্গলে একটা হুড়-দাঙ্গা লেগে গেছে। আমরা স্পট-লাইটের আলোয় দেখলাম, হলুদ পোখরাজের মতো কয়েকটা টুকরো যেন ছিটকে পড়ল।

জিজ্ঞেস করলাম, ওগুলো কি ?

রেঞ্জার সাহেব বললেন, বাইসনগুলো হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে গেল। ওদের চোখের মণিতে স্পট-লাইট পড়ে এই আলোগুলো ছিটকে বেরোচ্ছে।

স্পট-লাইটের আলো নিভে গেল।

অন্ধকারে একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল।

ডাঃ তলোয়ার বললেন, কিসের আওয়াজ ?

রেঞ্জার বললেন, অজগর বুনো শুয়োরকে জড়িয়ে ধরে গিলতে শুরু করেছে। এই আর্তনাদটা বন্য শূকরের।

আবার এক জায়গায় স্পট-লাইটের আলো পড়ল। মাথা ঝুঁকে কি যেন দেখতে লাগলেন রেঞ্জার। চুপিচুপি বললেন, একটুও আওয়াজ করবেন না যেন। মনে হচ্ছে একটা চিতার দুটো চোখ জ্বলছে। স্পট লাইটের আলোর রেখা ধরে গুঁড়ি মেরে ওপর দিকে উঠে আসছে। ওরা অন্য জানোয়ারের মতো ভয় পেয়ে পালায় না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা বাঘের আকার আমাদের চোখের ওপর ভেসে উঠল। চিতাটা পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে ওপরের দিকে উঠে আসছিল।

ভয় মেশানো উত্তেজনা তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। জীপটার আদ্দেক প্রায় ডুবে আছে লম্বা-লম্বা ঘাসের ভেতরে। হঠাৎ যদি চিতাটা লাফ দিয়ে একেবারে জীপের ভেতর ঢুকে পড়ে তাহলে ব্যাঘ্রমশাইয়ের নৈশ ভোজটা আমাদের বন-মোরগের রোস্টের চেয়ে আশা করি কিছু কম হবে না।

রেঞ্জার স্পট-লাইট নিভিয়ে দিয়ে জীপ চালাবার অর্ডার দিলেন। হেড-লাইটের আলো জেলে জীপটা গর্জন করতে করতে সামনের দিকে ছুটে চলল। জীপটা পাহাড়ে উঠছে নামছে, বাঁক নিচ্ছে। কখনও রাগে ফুঁসছে—সে এক টাল-মাটাল অবস্থা।

এই মুহূর্তগুলোতে আমি আশা করছিলাম অনেকগুলো 'সরি, সরি' ধ্বনি শুনতে পাব। কিন্তু আমাদের নর্মদাদির শোলোকের মতো—'সে গুড়ে বালি, ও বনমালী'—সব চুপচাপ। এখন বোধহয় ডাঃ তলোয়ার টাল সামলে নেওয়ার কায়দাটা আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

হেডলাইটের আলো ঘুরে ঘুরে পড়ছে বনের গভীরে। পাখা ঝাপটে আর্ত আওয়াজ করতে করতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে পালাচ্ছে বন-মোরগ। অসময়ে আলোর ছোঁওয়ায় ঘুম ভেঙে এক ঝাঁক পাখি একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে কলরব করে উঠল।

রেঞ্জার সাহেবের নির্দেশে এক জায়গায় এসে জীপ থামল। সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইটের আলোও নিভে গেল। রেঞ্জার সাহেব ড্রাইভারকে কি যেন বললেন। মনে হলো, এ পথ, এ বনের অন্ধি-সন্ধি ড্রাইভারের নখদর্পণে। ওরই ভেতর জীপটা ব্যাক করতে করতে ভ্যালির দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। আমরা ভ্যালির প্রায় কাছাকাছি নেমে এসেছিলাম। হঠাৎ হেডলাইটের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ভ্যালির ওপর। আলোটা যেখানে পড়ল, সেখান থেকে মনে হলো এক-

মুঠো হীরে কে যেন আমাদের চোখের ওপর ছুঁড়ে মারল। ভাল করে চেয়ে দেখি ভ্যালিতে শাল গাছের জটলা, তাকে বেড় দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী ছোটবড় পাথরের চাঁইয়ের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে। ঐ শালগাছের জটলার ভেতর অগুণতি হরিণ রাতের আশ্রয় নিয়েছিল। হেডলাইটের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তাদের চোখ থেকে ঠিকরে পড়েছে মুঠো মুঠো হীরের বিস্ময়!

সে রাতে আমরা জীপে করে ঐ ভ্যালির ওপর দিয়ে বয়ে চলা নদীটা পেরোলাম। আমরা সবাই মিলে জীপটাকে দাঁড় করালাম। তারপর জীপ থেকে নেমে নদীর জলে পা ডুবিয়ে হাঁটতে লাগলাম। সবাই মিলে রাতের ক্লান্তি দূর করবার জন্যে ঐ ঠান্ডা জল অঞ্জলি করে তুলে চোখমুখ ধুলাম, মাথায় ছড়ালাম।

রেঞ্জার সাহেব বললেন, পাহাড়ী নদীকে বিশ্বাস করবেন না, ও এখুনি শীর্ণা, পরমুহূর্তেই স্ফীতা। হয়তো দেখছেন তিরতির করে গান গেয়ে নুড়ির নূপুর বাজিয়ে চলেছে, হঠাৎ পাহাড়ী ঢল এল, সাদা জলের স্রোতে গেরুয়ার ছোপ লাগল, পাগলিনীর মতো ফুলে ফেঁপে ছুটতে লাগল দুকূল ভাসিয়ে।

এখানে আমরা একাদশীর চাঁদটাকে ঠিকমত দেখতে পেলাম। শরতের নীল আকাশ, দিগন্তে দু একটুকরো সাদা মেঘ, উপত্যকার মাঝে মাঝে শাল বনের জটলা, তার ওপর এসে পড়েছে একাদশীর চাঁদের শুভ্র শীতল জ্যোৎস্না। স্বপ্নের জগতে এসে পড়েছি বলে মনে হলো আমাদের।

আনমনে গুনগুন করে সুর সাধছিল সংগীতা। রেঞ্জার সাহেব বললেন, কেবল সুর শোনালে মন ভরবে না, আমরা গান শুনতে চাই।

সংগীতা হেসে বলল, আমি যে গান গাইতে জানি সেটা আপনি জানলেন কি করে?

মিঃ চৌধুরী বললেন, অরণ্যের গভীরে লুকিয়ে থাকে ফুল, তাকে চোখে দেখা যায় না হয়তো, কিন্তু সেকি তার গন্ধটুকু লুকিয়ে রাখতে পারে?

অমৃতকান্তি বাহবা দিয়ে উঠল, মশাই আপনি তো জাত কবি।

রেঞ্জার বললেন, বনে থাকতে থাকতে বুনো কবি হয়ে উঠেছি আর কি।

এবার ডাঃ তলোয়ার বললেন, গানটি শুরু হোক দিদিজী, পরে আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে দেবেন।

সংগীতা চরাচরব্যাপী সেই মোহনীয় জ্যোৎস্নার প্রবাহে তার গানের ভেলাটি ভাসিয়ে দিলে। যখন সে গাইছিল,—

'আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী।

ওই স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'—তখন মনে হচ্ছিল কথায় সুরে আশ্চর্যভাবে নিসর্গ প্রকৃতি একাত্ম হয়ে ধরা দিয়েছে। জীবনে বোধহয় এমন কোনো উপলব্ধি নেই যা গীতবিতানের মধ্যে উচ্চারিত হয়নি। হরজটা থেকে নিঃসৃত গঙ্গার মতো প্রেম, পূজা, প্রকৃতির জাহ্নবী-ধারা আমাদের অহল্যা হৃদয়গুলোকে সুজলা সুফলা করে তুলেছে।

রাত দুটোতেই আমরা ফিরে এলাম রেঞ্জার সাহেবের নির্দিষ্ট আর একটি ফরেস্ট বাংলোয়। আমাদের জন্য দুটি ঘরের ব্যবস্থা ছিল। আমি অমৃত একটি ঘরে ঢুকলাম। ডাঃ তলোয়ার রইলেন সঙ্গীতার সঙ্গে। ঘণ্টাখানেক বনের গল্পে কাটল। তারপর টানা ঘুম। কখন ভোর হয়েছে জানি না, কড়া রোদ্দুরে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে একসঙ্গে চা ও জলযোগ সেরে নিলাম।

মামাবাবুর পনের দিনের ঠাসা প্রোগ্রাম চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি, কলাক্ষয়ের মধ্যে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তার হিসেব পেলাম না। অবশ্য তার হিসেব মেলাতে মনের কোনো তগাদা ছিল না। যা পেলাম তুলনা তার নেই। 'হো'দের হাটে গিয়ে মুরগীর লড়াই দেখে ওদেরই মতো আমরা হৈ হৈ করে হাততালি দিয়েছি। দেখেছি সন্ধ্যার আলো গায়ে মেখে হো পুরুষ রমণীদের দল বেঁধে ঘরে ফিরতে। দর্শনীয় আকৃতি এই আদিবাসী সম্প্রদায়টির। সরু কাঁকাল, উন্নত বক্ষ, টান টান দেহভঙ্গিমা। মেয়েরা মাথার চুল একদিকে টেনে বেঁধে ফুল গুঁজেছে, নয়তো কাঁকই। খানিকটা লালচে ধরনের চুল, হয়তো তেলের অভাবে। কিন্তু তাতে দেহের সুষমা একটুও ম্লান হয়নি। ছেলেরা হাতে তীরধনুক আর টাঙ্গি নিয়ে পথ চলে। শাল, শিমুল, হেসেল, বীজা বনের পাশ দিয়ে ওরা যখন পথ চলে তখন ওদের দেখে মনে হয় ওরা এই বৃক্ষসমাজের পরমাত্মীয়। সারান্দা বনভূমির আত্মার সঙ্গে ওরা মিশে আছে অভিন্ন হয়ে। ওরা অবশ্য এই বৃক্ষের জটলার মধ্যেই ওদের পূর্বপুরুষের আত্মাকে রেখে দেয় বেদী তৈরী করে। সেই বেদীকে ওরা বলে 'আদিং'। ওরা সেই বেদীতে সিঁদুর মাখায়, ফুল দেয়, পুজো করে। ওরা বড় একটা চাষবাস করে না। ছেলে বুড়ো সবাই সকাল থেকে মহুয়ার ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়। মহুয়া দিয়ে মদ তৈরী করে খায়। ওদের মেয়েরা বন থেকে মেটে আলু সংগ্রহ করে। ছেলেরা পাখপাখালী শিকার করে আনে। দু এক জায়গায় ওদের মকাইয়ের চাষ করতে দেখেছি। যুবকরা ফরেস্টে কুলিকামিনের কাজ করে কিছু রোজকার করে। ছোট, ছোট ছেলেমেয়েরা 'কোয়েল', 'কোয়না' আর 'কারো' নদীতে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মাছ ধরে। ঐ মাছগুলো থেকে শুঁটকি তৈরী হবে। সারাবছর ধরে সেই শুঁটকি খাবে ওরা। তাছাড়া দুপুরের বনে দেখেছি বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেন কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ওরা 'জোঁদা'র সন্ধান করছে। একধরনের পিঁপড়ের ডিম ওগুলো, দারুণ খেতে।

চলার পথে সিঁদুর মাখানো গাছ দেখলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, ও সাধারণ কোনো গাছ নয়। ওগুলি হলো বৃক্ষ-দেবতা। বুনো মোষের রক্ষা কর্তা দেবতা 'ট্যাঁড়বারো'। কোথাও কোথাও বনদেবী 'জায়েরা'র আস্তানা আছে। অরণ্য ওদের আত্মার আত্মীয়, তাই অরণ্য জুড়ে বিরাজ করছে ওদের দেবতারা। আমি দেখেছি বনদেবতা সম্পর্কে এদের বিশ্বাস কত গভীর। ফরেস্ট বাংলোর রাঁধুনী সেই আদিবাসী মেয়েটিকে ওদের দেবতাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তার চোখমুখে অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করতাম উত্তর দেবার সময়।

ভোরের সূর্য ঝকঝকে মাজা পেতলের মতো ঝিলিক তুলে গাছগাছালির পাতাপত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। গাড়ি থামিয়ে সেই দৃশ্য দেখছি আমরা। গায়ে মাথায় মেখে নিচ্ছি সে রোদ। কেলাউন্দার ঝোপ থেকে এমনি এক সকালে বেরিয়ে এল ফুটফুটে দুটো হলুদ পাখি। একটা মসৃণ পাথরের ওপর টিঁউ টিঁউ, কিচ্ কিচ্ গান আর লাফিয়ে লাফিয়ে সে কি নাচ। অন্যদিকে শিমুল গাছটিকে জড়িয়ে সাংকারলা লতায় সাদা সাদা ফুল ফুটেছে। হো মেয়েদের অনাবিল হাসি ঝরে পড়ছে যেন সেই ফুলের জলসায়।

কুইনা রেঞ্জ ধরে একদিন যাচ্ছিল গাড়ি, আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম দিগন্ত প্রসারী ফুলের সমারোহ দেখে। সাদা আর পিঙ্ক্ রঙের কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে একটা পাহাড়ের পাদদেশ জুড়ে। তাদের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে কয়েকটি পাহাড়ী ঝর্ণা। গাছের কাণ্ডে পাথরের নুড়িতে ধাক্কা খেতে খেতে সেই অদৃশ্য জলস্রোত অদ্ভুত মিষ্টি একটা সুর তুলেছে। কারা এই দৃষ্টিনন্দন কাঞ্চন ফুলের গাছগুলি এখানে রোপণ করেছে জানি না। কিন্তু অরণ্যের এ এক মহার্ঘ সম্পদ। অথবা আপনাতে আপনি বিকশিত হয়েছে এই কান্তিময়ী কাঞ্চন। আমি রেঞ্জার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেও এর সদুত্তর পাইনি। তিনি বলেছিলেন, বহু পূর্বকাল থেকে নাকি এসকল বৃক্ষ আপনি পুষ্পিত হয়ে চলেছে। বৃদ্ধ হোদের জিজ্ঞেস করলে বলে, তাদের বাপ-ঠাকুরদারাও ছোটবেলা থেকে এই ফুল দেখে এসেছে।

অবিস্মরণীয় এক পূর্ণিমার রাতে আমাদের নিশিজাগরণ হ'লো। যদিও বসন্তকাল নয় তবুও আমরা সংগীতার সংগে গেয়ে উঠলাম,—

'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।'

অমৃতকান্তি বলল, গুরুদেবের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে আমরা দুটি শব্দ এখানে বদলে নিতে চাই।

সংগীতা বলল, কিরকম ?

'গেছে'র জায়গায় 'এলাম' এবং 'বসন্তে'র জায়গায় 'শরতে'র।

আমি বললাম, তাহলে তোমার যুগলপদটি দাঁড়াল এ'রকম—

'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই এলাম বনে
শরতের এই মাতাল সমীরণে।'

তা মন্দ হলো না। যদিও পাশের নদী ছুঁয়ে বয়ে আসছে শিরশিরে নৈশ হাওয়া তাহলেও আমাদের মতো কয়েকটি নিশাচরকে পাগল করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে ঐ হাওয়ার।

এই জ্যোৎস্নার জলে ভাসা পূর্ণিমায় মনে হলো সমস্ত বনটা আমাদের অধিকারে। কখনও পাহাড়ে উঠছি, কখনও উপত্যকায় নামছি। আমাদের গাড়ির শব্দে একদল হরিণ নাচের ভঙ্গিমায় দ্রুত নেমে গেল ভ্যালির দিকে। একবার হর্নের আওয়াজ হলেই পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠছে। বিশ্রামরত যে সব পাখি ভয় পেয়ে নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ছিল, চাঁদের আলোয় তাদের

গায়ের রঙ পর্যন্ত স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল।

সংগীতা বলল, আহা বেচারাদের রাতের ঘুম আমরা কেড়ে নিচ্ছি।

অমৃত বলল, আহা ওরাও একটু মানুষ হোক। পূর্ণিমাকে চিনতে শিখুক, ভালবাসতে শিখুক। একমাত্র পাপিয়া-ই শুনেছি চাঁদকে ভালবাসে। দু-জনে ওড়াউড়ি করে চাঁদের জলে স্নান করে আর আকুল করা গানে মাতে।

সংগীতা বলল, তোমার কথাকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর একটি গানে।

অমৃতকান্তি বলল, বৌদি সংগীতের ভেতর দিয়ে আমার কথার সমর্থনটি দয়া করে পেশ করুন।

সংগীতা বলল, অসম্ভব। আঁকাবাঁকা পথে চলতি গাড়িতে সে গান গাওয়া যায় না।

রেঞ্জার সাহেবের ইঙ্গিতে একটা সুন্দর জায়গায় গাড়ি থেমে গেল। ছোট্ট একচিলতে ফাঁকা প্রান্তর। দুটি শালের গাছ ডালে পাতায় এক হয়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও একটা লতা ফুল ফুটিয়েছে। লতাটির নাম 'জনাপা'। বেগুনী রঙের ফুলে ভরে আছে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে সে রঙ। ভ্যালি থেকে হাওয়া দিলেই দুলছে সে লতা। ভোরবেলা পাখিতে নিশ্চয় ঐ ফুলে ভরা লতায় বসে দোল খায়। এটি দিব্যি বনবিহগের সুন্দর একটি পুষ্পিত দোলনা হতে পারে। আমরা সকলে ঐ ছোট্ট প্রান্তরে নেমে ঘাসের জমিতে বসে পড়লাম। সামান্য শিশির-সিক্ত, তা হোক।

গান ধরল সংগীতা। জ্যোৎস্নার স্রোতে কথা আর সুর ভেসে চলল নীলাকাশে।

> 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
> আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো॥
> রাখিস না আর মায়ার ঘোরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দেরে।
> উধাও হয়ে মিশিয়ে যাই এমন রাত আর পাব না লো॥
> পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশভুবন গেল ভেসে;
> থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ ক'রে শোন বাইরে এসে॥'

তাল ছাড়া এই টানা গানটি বারবার হৃদয় ছুঁয়ে বাজতে লাগল। ডি. এল. রায় এই গানের কথায় সুরে এমন একটি যাদু সৃষ্টি করেছেন যা হৃদয়কে আবিষ্ট আর আকুল করে তোলে।

গানটি শেষ হওয়ার পরেও কেউ কোনো কথা না বলে কিছু সময় চুপ করে বসে রইল।

চৌধুরী সাহেব সমঝদার মানুষ। তিনি বললেন, আজ আমার রাঁচী যাওয়ার কথা ছিল ভাগ্যিস যাইনি।

অমৃতকান্তি বলল, একটা পাগলাগারদে আপনি একাই যেতেন, এখন আমরা সবাই মিলে মস্ত বড় একটা পাগলাগারদে ঢুকে পড়েছি। আপনারা যদি আদেশ করেন তাহলে এ উন্মাদও গলা ছেড়ে ডি. এল. রায়ের দু'ছত্র গান গায়।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, অবশ্য, অবশ্য।

অমৃতকান্তি চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে উচ্চগ্রামে গলা তুলে গাইল—

'আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।'

এর পর পুরো গানটা অমৃতর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল সংগীতা।

আমাদের এই আসরটি চলল বহুক্ষণ।

শেষে চাঁদ অস্তে গেল একসময়। আমরা এই পূর্ণিমার স্মৃতিটুকু বুকের গভীরে ভরে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। এ যেন পূর্ণিমা-প্রকৃতির রাজ্য থেকে বিষণ্ণ বিদায়। গাড়ি বাংলোর দিকে ছুটে চলল। সামান্য পথ যেতে না যেতেই পূব দিকে ভোরের আয়োজন দেখলাম। নীলাভ ঊষার দ্যুতি পাহাড়ের আড়াল থেকে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ব'য়ে আসছে। আমাদের গায়ে এক একখানা গরম চাদর। ডাঃ তলোয়ার পরেছেন একটা পাতলা কার্ডিগান। নীলের আয়োজনের সঙ্গে লালের আভা এসে মিশল। আকাশের দু-এক টুকরো মেঘে এসে লাগল সে রঙ। সাদা মেঘে লালের ছোঁওয়ার সে এক অপরূপ শোভা। চোখ ফেরানো যায় না। ভোরের স্পর্শই আলাদা। হৈ হৈ করে পাখিরা পাখা ভাসিয়ে দিয়ে উড়ে চলেছে আলোর সমুদ্রে। অরণ্যের গাছপালা তাদের অন্ধকারের বোরখা খুলে ফেলছে ধীরে ধীরে। বনের সবুজ শ্যামল রূপটি বেরিয়ে আসছে আলোর ছোঁওয়ায়।

আমাদের পনের দিনের প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘটল কৃষ্ণা দশমীর ম্লান চাঁদের আলোয়। সেদিন গাড়িতে রেঞ্জার সাহেব ছিলেন না। আমরা কোয়েল নদীর ধারে একটা মসৃণ পাথরের চাঁইয়ের ওপর চারজনে হাত ধরাধরি করে বসেছিলাম। আমাদের মুখে কথা ছিল না। একটু আগে ঊর্মিলার মুখ থেকে শুনেছিলাম তার অতীত জীবনের এক অকথিত যন্ত্রণার কথা। যেটা সে হাসিমুখে এতকাল বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো আজীবন এমনই বয়ে বেড়াতে হবে তাকে।

সংগীতা কিন্তু একদিন আমাকে একান্তে বলেছিল, ঊর্মিলার ভেতর মনে হয় কোনো একটা ট্র্যাজেডি আছে। সে সেই দুঃখটাকে মনের একান্ত গভীরে গোপন করে রেখে দিয়েছে।

আমরা এই পনের দিনে দেখেছি, সবার সঙ্গে ঊর্মিলার অত্যন্ত হৃদ্য আর অসংকোচ আচরণ। সে যেন আমাদেরই পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল। অমৃতকান্তির সংগে সে হাত ধরাধরি করে উঠেছে কোন একটা ছোট্ট টিলার ওপর। আমরা নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছি। সে ফিরে দাঁড়িয়ে আমাদের নির্মল এক হাসি উপহার দিয়েছে। হাতখানা নেড়েছে বাতাসে কম্পমান পতাকার মতো। তার এই আনন্দময় আচরণগুলি মনের গভীরে নাড়া দিয়ে গেছে।

কৃষ্ণা দশমীর শেষ রাতে আকাশের বুকে জেগে উঠেছিল পাণ্ডুর চাঁদ। তখন আমরা এক শোক-সাগরের কূলে বসে মূক আর স্তব্ধ হয়ে আছি।

আমরা পরস্পরের হাতের বাঁধনের ভেতর দিয়ে অনুভব করছিলাম পরস্পরের বুকের স্পন্দন। তারই ভেতর দিয়ে চোখের ওপর ফুটে উঠছিল একটা ছবি।

সিন্ধু প্রদেশে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে। সংখ্যালঘু হিন্দু আর শিখেরা সব ফেলে ছুটে আসছে সীমান্তের দিকে। রাত্রিদিন চলেছে সেই জনপ্রবাহ। সেই স্রোতের সঙ্গে মিশে আছে একটি পরিবার। পরিণত কিশোরী একটি মেয়ে তাদের প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা ও তার যুবক পুত্রের সঙ্গে আতঙ্কের দিনরাত্রি একসঙ্গে কাটাচ্ছে। কোনো কোনো গ্রাম অতিক্রম করার সময়ে সংঘাত লাগছে, ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু প্রবাহ থেমে থাকেনি। আশ্চর্য জীবন! সেই আতঙ্কিত দিনরাত্রির ভেতরে দুটি হৃদয়ের গভীরে ফুটে উঠেছে দুটি রক্তগোলাপ। সেই যুবক আর কিশোরীর মধ্যে গড়ে উঠেছে প্রায় অনুচ্চারিত এক ভালবাসা। শিখ যুবক সুজন সিং হিন্দু প্রতিবেশিনী ঊর্মিলাকে কথা দিয়েছে সীমান্তের ওপারে তারা ঘর বাঁধবে। এই আশ্বাসে মন ভরে আছে ঊর্মিলার। সব হারিয়েও সব পাওয়ার একটা আশ্বাস।

চতুর্থ দিনে এমনি একটা পান্ডুর চাঁদ আকাশে উঠেছিল। ওরা একটা গাছের আড়ালে আচ্ছন্ন হয়ে ব'সে রাত কাটাচ্ছিল। চোখে প্রায় নিদ্রা ছিল না তাদের। এমন সময় নৈশ অন্ধকার ভেদ করে এসে পড়ল কয়েকটি গাড়ির হেডলাইটের আলো। দু-তিনখানা গাড়ির আলোতে ওরা যা দেখল তাতে বোঝা গেল সশস্ত্র এক দল মানুষ পথক্লান্তদের আক্রমণের জন্যে এই শেষ রাত্রিটিকে বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আতঙ্কের ধ্বনি উঠল। বিভিন্ন জায়গা থেকে টর্চের আলো এসে পড়ছে। তারই ভেতর দিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত লোকের পলায়নের ছবিটি দেখা যাচ্ছে।

সুজন সিং কিন্তু তার তলোয়ারটি বের করে উঠে দাঁড়াল। সুজন সিংয়ের বৃদ্ধা মা বললেন, কোথা যাবি তুই?
ঐ দেখ মা কত মানুষ কাপুরুষের মতো মরছে, আর আর্ত চীৎকার তুলছে। মরতে হয়তো মরার মতো মরি। তুমি ঊর্মিলার হাত ধরে এই বনের ভেতর দিয়ে যতদূর পার এগিয়ে তো যাও। আমি একসময় নিশ্চিত তোমাদের খুঁজে নেব। ঊর্মিলাকে বলল, সীমান্ত পেরিয়ে যেখানেই যাও আমি খুঁজে নেব তোমাদের। তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবেই।

ঊর্মিলা কাঁপছিল। সুজন সিং তার হাত ছেড়ে দিয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে গুরুগোবিন্দ সিংয়ের নাম করতে করতে সেই দুর্বৃত্তদের গাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

ঊর্মিলার হাত শক্ত করে ধরে সুজনের মা অন্ধকার চিরে দ্রুত পায়ে চলতে লাগলেন সীমান্তের দিকে। তাঁর বুকের ভাষা পড়ার সুযোগ ছিল না তখন ঊর্মিলার। সে তখন আতঙ্কে আচ্ছন্ন। পরে ঊর্মিলা বুঝেছিল, একটি কিশোরী মেয়ের আত্মসম্মান রক্ষার দায়িত্ব যিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি তাঁর সন্তানের পরিণতিকে তার চেয়ে বড় করে দেখতে পারেননি। তাঁর বুকের মধ্যে নিশ্চয় কান্না ছিল কিন্তু তখন তিনি পাথর-

প্রতিমা। সমস্ত চিন্তা তখন তাঁর ছিল কেবলমাত্র এই কিশোরীটিকে কেন্দ্র করে। মহৎ কাজে তিনি কখনও নিজের স্বামী-সন্তানকে বাধা দেননি। তাঁর স্বামীও এইভাবে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সন্তানকেও তিনি বাধা না দিয়ে অন্তর থেকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

রাত্রি কেটে গিয়ে দিন এসেছিল। ওরা বার বার সর্বহারা মিছিলের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করেছিল সুজনের কথা। কিন্তু কারু কাছ থেকে কোনো সদুত্তরই পায়নি। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ওরা সন্ধ্যায় কোনো এক গ্রামের কুটীরের দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। একবিন্দু জলের জন্য তখন ওরা কাতর। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। ওরা ক্ষীণ কণ্ঠে তার কাছে জলের প্রার্থনা জানিয়েছিল।

মেয়েটি বলেছিল, আমরা মুসলমান।

সুজনের মা জয়াবতী একটুও ভয় পাননি। উনি বলেছিলেন, আমি শিখ, এ মেয়েটি হিন্দু। আমরা তিনজনেই কিন্তু মানুষ মা। তুমি নিজের হাতে আমাদের একটু জল দাও।

মেয়েটি জল আর খাবার এনে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার আর একটু গাঢ় হলে ঘরের দুতিনটি পুরুষ ক্ষেতের কাজ সেরে ফিরে এসেছিল। ওরা ছিল কৃষক পরিবার। জয়াবতী লক্ষ্য করেছিলেন, ঐ দয়ালু মুসলমান মেয়েটি উঠোনের ওপারে দাঁড়িয়ে পুরুষদের কি যেন বোঝাচ্ছিল।

পুরুষরা এসে কিন্তু ওদের সালাম জানাল। অত্যন্ত যত্ন করে ওদের ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে রাখল। শেষ রাতে ওদের বিছানা থেকে জাগিয়ে তুলল মেয়েটি। বলল, তোমরা তৈরী হয়ে নাও, আমার স্বামী সোজা রাস্তায় তোমাদের সীমান্তের পারে রেখে আসবে।

ছেলের পরিণতির কথা ভেবে যে জয়াবতীর চোখে একবিন্দু অশ্রু নামেনি তিনি মুসলমান মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত দীর্ঘশ্বাস আর চোখের সঞ্চিত জল উজাড় করে দিলেন।

উর্মিলার হাত ধরে একসময় জয়াবতী সীমান্তের এপারে এসে পেঁছিলেন। তারপর সুজনের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা। একদিকে জীবনধারণের সংগ্রাম, অন্যদিকে সন্তানের জন্য প্রতীক্ষা। জয়াবতী সে সময় যেন দশভুজার মূর্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন।

উর্মিলা জয়াবতীকে 'মা' বলে ডাকতে লাগল। কোন্ কাজ সে করবে আর না করবে তা স্থির করে দিতে লাগলেন জয়াবতী। রাতে বিছানায় শুয়ে অঝোরে কাঁদত উর্মিলা। পাশে শুয়ে জয়াবতী বুঝতেন ওর বুকের ব্যথা। হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন, সুজন বেঁচে আছে, আর সে বেঁচে থাকবেও চিরদিন। তুই মিথ্যে কাঁদছিস কেন মা ?

সম্পদের মধ্যে একটি থলেতে কয়েক খণ্ড মূল্যবান হীরে এনেছিলেন জয়াবতী। নিজে কায়িক পরিশ্রম করে রোজগার করতেন, নিতান্ত প্রয়োজন

না হলে হীরক খণ্ডগুলি বিক্রি করতেন না।

ঊর্মিলাকে জয়াবতী পড়াতে লাগলেন। এক বছরের ভেতর স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে ঢুকল সে। জয়াবতীর আগ্রহ আর চেষ্টাতেই মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পেল ঊর্মিলা। হীরে বিক্রি করে, নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে ডাক্তারী পড়ার খরচ যোগাতে লাগলেন জয়াবতী।

একসময় ডাক্তারী পাশ করল ঊর্মিলা তলোয়ার। মায়ের অনুমতি নিয়ে চাকরির সন্ধান করতে লাগল। দর্শনীয় রূপ যৌবন ঊর্মিলার। তাকে জীবন-সঙ্গিনী করার জন্য খ্যাতিমান, বিত্তবান অনেকেই উন্মুখ। কিন্তু এক হৃদয়বান নির্ভীক যুবক তখন শিলাচিত্রের মত উৎকীর্ণ হয়ে আছে তার বুকের মাঝখানে।

চণ্ডীগড়ের এক হাসপাতালে চাকরী পেল ঊর্মিলা। মাকে নিয়ে উঠে এল ছোট একটা কোয়ার্টারে।

অনেক পরিশ্রম করেছেন জয়াবতী, আর নয়। ঊর্মিলা বলল, সারাদিন মাথা গুঁজে সেলাইয়ের কাজ করা চলবে না তোমার মা। অনেক করেছ আমার জন্য এখন তোমার জন্য আমাকে একটু করতে দাও।

কবছর জয়াবতী যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন তার ফলে তাঁর শরীরে দ্রুত এগিয়ে এসেছিল বার্ধক্য। মনের অসীম শক্তিতে তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার ফলে তিনি শিকার হয়েছিলেন দু'একটি রোগের।

ঊর্মিলা কাজে বেরুবার আগে জয়াবতীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র রেখে যেত, কিন্তু ফিরে এসে দেখত, দু'একটি ছাড়া প্রায় সবকটি ওষুধই পড়ে রয়েছে যথাস্থানে।

হয়তো কোনোদিন তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারে ফিরে দেখত ঊর্মিলা, জয়াবতী ঘরে নেই, শুধু দরজার শেকলটা তোলা আছে। ঊর্মিলা ভাবত, কাছে পিঠে কোথাও গিয়ে থাকবে, ফিরে আসবে এখুনি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যেত, উদ্বেগে আকুল হয়ে মায়ের খোঁজে ছুটোছুটি করত সে।

কোনোদিন উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়ে দেখা পেত জয়াবতীর। উদ্ভ্রান্তের মতো কলোনীর ঘরে ঘরে উঁকি দিয়ে কাকে যেন খুঁজছেন।

ঊর্মিলা সামনে গিয়ে দাঁড়ালে উনি বলে উঠতেন, সুজনকে যেন দেখলাম আমি কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে হনহন করে হেঁটে যেতে। আমিও তার পেছু নিয়েছিলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না ওকে।

তুমি ঠিক দেখেছ কি?

তেমনি তো মনে হলো মা।

ঊর্মিলা কথা না বাড়িয়ে হাত ধরে নিয়ে আসত জয়াবতীর।

এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটে গেল।

একদিন তো ঊর্মিলা মাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে স্টেশানে এসে হাজির। তখন স্টেশান থেকে ট্রেনটা সরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঊর্মিলা অবাক হয়ে

দেখল, জয়াবতী প্ল্যাটফর্ম বরাবর ট্রেনের সঙ্গে দৌড়চ্ছেন। মুখে ডেকে চলেছেন, সুজন···সুজন রে··· ।

ওষুধ দিয়ে জয়াবতীকে টেনশান মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল ঊর্মিলা। একটি কাজের মেয়েও নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু এত বাঁধনের মধ্যেও বেঁধে রাখা গেল না জয়াবতীকে। একদিন হসপিট্যাল থেকে ফিরে এসে ঊর্মিলা দেখল, মা নেই, টেবিলের ওপর একটুকরো চিঠি পড়ে আছে।

'আমার খোঁজ কর না ঊর্মি', আমি সুজনের খোঁজে চললাম। এপারে না পাই ওপারে যাব।—মা'

চিঠিখানা হাতে নিয়ে পাষাণ-প্রতিমার মতো কতক্ষণ বসে রইল ঊর্মিলা। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো তার। যতদিন না সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলো ততদিন পুত্রহারা জননীর হাহাকার বুকে চেপে নীরবে কাজ করে গেলেন এই দয়াময়ী নারী। এখন কাজ থেকে ছুটি পেয়ে খুলে গেল ব্যথার রুদ্ধ উৎসমুখ। তারই প্লাবনে ভেসে গেলেন জননী জয়াবতী।

পুরো দুটো বছর খোঁজ করেও ব্যর্থ হয়ে গেল ঊর্মিলা। শেষে জয়াবতীর স্মৃতির স্পর্শমাখা বাসগৃহ, এমনকি পুরো শহরটাই তার কাছে মরুভূমি বলে মনে হাত লাগল। ইতিমধ্যে এম. এস. টা সে করে ফেলেছিল। এখন মায়ের স্মৃতির দংশন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে শহর থেকে কোনো দূর শান্ত পরিবেশে কাজ নিয়ে চলে যাবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

আশ্চর্যভাবে সুযোগ এসে গেল তার হাতে। গুয়ার হসপিট্যাল থেকে একজন সার্জন চেয়ে স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অ্যাপ্লাই করতেই ডাক এল। ইন্টারভিউ নামমাত্র। হাতে হাতে পেয়ে গেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

কিন্তু নির্জনে এসেও কি ঊর্মিলা মুছে ফেলতে পারল তার স্মৃতির লেখাগুলো? না অতীত স্মৃতিতে আজ পূর্ণ তার অন্তর। সে স্মৃতিতে অমৃতের স্বাদ আবার তাতেই নীল গরলের জ্বালা।

স্টেশানে বিদায় জানাতে এসেছিলেন অনেকেই শুধু আসেনি একজন, সে ঊর্মিলা। ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে হসপিট্যালের এক বেয়ারা দৌড়ে এসে আমার হাতে একখানা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেল।

ট্রেন ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল গুয়ার শাল অরণ্য। ডানদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা সারান্দা ফরেস্ট তখন আমাদের স্বপ্নের বনভূমি। একসময় চোখের ওপর থেকে সব ছবি মুছে গেল। কিন্তু মনের পর্দায় অক্ষয় হয়ে রইল সে সব ছবি। আর একটি চরিত্র, যে আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে নিল, সে রামায়ণের ঊর্মিলা। অযোধ্যার সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভেতরে থেকেও যে অন্তরের গভীরে চিরনির্বাসিতা। বাইরে সেবিকা, ভেতরে সন্ন্যাসিনী।

ঊর্মিলার চিঠিখানা খুললাম। লিখেছে,-

দাদাজী,

বুকের ভেতর এমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারলাম না যাতে স্টেশানে গিয়ে তোমাদের বিদায় জানাতে পারি। এই পক্ষকালের স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে আছে আমার মন। তোমরা দূরে চলে যাচ্ছ একথা আমি ভাবতেই পারব না। প্রতিটি দিন সরস মন্তব্যে মাতিয়ে রেখেছিল অমৃত। অবকাশ মুহূর্তে সে সব কথা ভাবব আর গভীর আনন্দে মন ভরে উঠবে। ভাবীজী আর তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে অক্ষয় হয়ে রইল। তোমাদের দেখে নতুন করে আমি বাঁচার প্রেরণা পেয়েছি। আমার ভেতরে স্তিমিত স্মৃতির আগুনটাকে তোমরা উজ্জ্বল করে দিয়ে গেলে।

যে ভাগ্যহীনা জননী তার বীরপুত্রের সন্ধানে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে, আমিও যে মনেপ্রাণে সে পথেরই যাত্রী। এই পথ চলাতেই আমার বুকের রক্তক্ষরণ আবার এর ভেতরেই আমার সত্যিকারের বেঁচে থাকা।

তোমাদের ঊর্মিলা।

কলকাতা পেঁছে পরের দিন আমাদের কলেজ স্ট্রীটের ডেরায় এলাম। একটি খাম পড়ে আছে ভেতরে। অমৃত কান্তি, খামটি খুলে প্রায় লাফিয়ে উঠল, দাদা অর্ডার। বাঁকুড়ার একটা কলেজ-লাইব্রেরী থেকে এসেছে। প্রায় হাজার কুড়ি টাকার ইংরাজী বই।

আমি বললাম, এতসব বইয়ের পাব্লিশার্স নিশ্চয় এদেশের নয়। এখন এসব বই পাওয়া যাবে কোথায় ?

অমৃত উত্তেজিত, অর্ডার পেয়েছি, দুনিয়া ঢুঁড়ে আনব।

পরের দিন সত্যিই ও সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যায় আমার বাসায় হাজির।

বৌদি কেল্লা ফতে। টাকা ছাড়ো।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, সত্যি, বইগুলোর হদিস পেলে ?

ও বলল, দু-চারখানা ছাড়া প্রায় সব। একজায়গাতেই পেয়ে গেলাম।

সে মহাসিন্ধ-পীঠটি কোথায় ?

কলেজ স্ট্রীটের ভেতরেই।

বললাম, দেরী না করে কালই চল, ব্যাঙ্কের চেক ভাঙিয়ে নিয়ে বইগুলি তোলার ব্যবস্থা করি।

অমৃত বলল, দেখুন বিভিন্ন বইয়ের পাশে পাশে লিখে এনেছি কমিশনের হার।

আমি অধিকাংশ বইয়ের পাশে ২৫%, আর কিছু কিছু বইয়ের পাশে ২০% দেখলাম।

বললাম, এতেই আমাদের কাজ হবে, কি বল ? আমরা তো লাইব্রেরীকে দেব ১০%। বাকীটা আমাদের লাভ।

পরের দিন টাকা পয়সা তুলে আমরা দোকানে হাজির। সেলস্ কাউন্টারে

বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর কাছে কলেজের নামে অর্ডারটা পেশ করলাম।

ভদ্রলোক অর্ডারের পাশে পাশে কমিশনের রেট লেখা দেখলেন। আমাদের ডেকে বললেন, আপনারা লাইব্রেরীতে সাপ্লাই করছেন, আমরা গড়ে ১২% এর বেশী দিতে পারব না।

মুহূর্তে সমস্ত পরিস্থিতিটা বদলে গেল। অমৃত বলল, কালই আপনাদের সেলস্‌ম্যান পাশে পাশে কমিশনের হার লিখে দিয়েছেন, এই দেখুন।

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা যে লাইব্রেরীতে সাপ্লাই করবেন তা ও নিশ্চয় জানত না।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, আমরা যেখানেই সাপ্লাই করি, কমিশন আপনারা সবাইকে যা দেন, তা তো আমরা পাবই !

কথায় কথা বাড়ল। কয়েকজন কর্মচারী এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের মাঝখানে।

ওদের ভেতর থেকে একজন বললেন, ওপাশের ঘরে আমাদের মালিক দয়ালজী বসে রয়েছেন। আপনারা বরং তাঁর কাছে যান। একমাত্র তিনিই এর সমাধান করে দিতে পারেন।

আমরা পাশের রুমে মালিকের সন্ধানে চললাম।

ঘরে ঢুকে দেখলাম দেয়ালের একপাশে একটা সোফা পড়ে আছে। তার উল্টোদিকে দুটো টেবিল নিয়ে দুজন কাজ করছেন। একজন টাইপ করে চলেছেন। অন্যজনের পাশে একগাদা বইপত্তর। একটা মোটা খাতায় তিনি কি সব লিখে যাচ্ছেন।

একটা স্যুইং ডোরের ওপাশে মনে হলো মালিকের বসার জায়গা।

কর্মরত একজনের ধ্যান ভঙ্গ করে বললাম, আমরা মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কর্মচারীটি উঠে গিয়ে মালিকের অনুমতি নিয়ে এসে বললেন, আপনারা ভেতরে যান।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। বড় একখানা টেবিল। তার একদিকে তিন চারখানা চেয়ার। অন্যদিকে মালিকের বসার জায়গা। দেয়াল জুড়ে মাথার ওপরে বুক-র‍্যাকে থরে থরে বই সাজানো। অধিকাংশই ইংরাজী বই। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলী একসেটও তার ভেতর দেখলাম।

দয়ালজী বসেছিলেন তাঁর চেয়ারে। উল্টোদিকে আর এক ভদ্রলোক একটা বাংলা বই থেকে মনে হলো কিছু পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

যদিও ক্ষুব্ধ ছিলাম, কিন্তু প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হলাম মানুষটিকে দেখে। অতি রূপবান এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। প্রশান্ত স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন।

আমরা দুজনে বসলাম।

আমি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটি ওঁর কাছে বলে গেলাম। ওঁদের কোনো কর্মচারী যে কাল আমাদের কমিশনের হার অর্ডারের পাশে পাশে লিখে

দিয়েছিলেন তা ওঁকে দেখালাম।

উনি চোখ নীচু করে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ওদের কোনো ভুল হয়নি। আপনি যদি কোনো পাব্লিশারের স্লিপ নিয়ে বই কিনতে আসতেন তাহলে ঐ ২৫% ই পেতেন। কিন্তু আপনি লাইব্রেরী অর্ডার সাপ্লাই করতে চান তাই ওরা আপনাকে ১২% দিচ্ছে।

আমরা অতসব ঘাঁতঘোঁত বুঝি না। তাই বললাম, আমরা এ বিষয়ে একেবারে নবীশ। আপনি এ ব্যাপারে একটা সুরাহা না করে দিলে আমরা বড় বিপন্ন হয়ে পড়ব।

উনি হেসে বললেন, এ ব্যাপারে আমার হাত কিন্তু বাঁধা। আপনি যদি আমার শো-রুমের সমস্ত বই কিনে নেওয়ার অর্ডার দেন, তাহলেও আপনি ঐ লাইব্রেরী সাপ্লাইয়ের জন্য ১২% ই পাবেন। তার এক পার্সেণ্ট বেশী নয়।

এর পর কথা চলে না। আমরা নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি দেখে দয়ালজী বললেন, বসুন বসুন। এখুনি চা আসছে খেয়ে যাবেন।

অভদ্রতা করে চলে যেতে পারলাম না। অগত্যা বসতে হলো।

কিছুক্ষণের ভেতরেই একজন বেয়ারা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্লেটে টোস্ট আর মিষ্টি। তারপর এল এক কাপ করে চা। পরে জেনেছিলাম, দয়ালজীর অপরাহ্ণের চায়ের আসরে যাঁরাই উপস্থিত থাকেন তাঁরা এই জলযোগে আপ্যায়িত হন।

খাওয়ার মাঝেই উনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম বলতেই হঠাৎ ওঁর খাওয়া থেমে গেলে। হা হা করে সে কি হাসি। হাসি আর থামেই না। দেখলাম, পাশে বসে থাকা ভদ্রলোকটিও আমার দিকে কেমন উৎসুক চোখে তাকাচ্ছেন। তাঁর মুখেও মৃদুমৃদু হাসি।

আমি হতচকিত। নাম শুনে এত হাসির কি হলো?

দয়ালজী এবার দরাজ গলায় বললেন, আরে মশাই আমি আপনাকে দীপক নিয়ে কতদিন যে খুঁজেছি তার ঠিক নেই।

আমি আরও অবাক। আমার মতো শত শত অধ্যাপক কলেজে কাজ করছেন। আমি এমন কেউকেটা নই। তাছাড়া দু-চার খানা বই মাত্র বেরিয়েছে, পাঠক সমাজে এমন কিছু পরিচিতিও নেই। সুতরাং আমার মত অভাজনকে দীপ নিয়ে কেউ খুঁজতে পারে এ যে স্বপ্নেরও অতীত।

আমি রহস্যের সন্ধান করতে না পেরে ওঁর দিকে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

দয়ালজী আমার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোকটির দিকে আঙুল তুলে বললেন, ইনি মিঃ সিন্‌হা, আমার বহু দিনের বন্ধু। ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের বড় অফিসার। অফিস ছুটির পর রোজ আসেন আর দয়া করে আমাকে বাংলা বই পড়ে শোনান। আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি, কিন্তু পড়তে কিংবা লিখতে পারি না।

এবার আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন, আপনিই তো 'শৈলপুরী কুমায়ুন' বইখানা লিখেছেন?

মাথা নেড়ে জানালাম, হাঁ।

উনি বললেন, আপনার ঐ বইখানা আগাগোড়া আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন আমার ঐ বন্ধুটি। বইটি পড়ে আমাদের এত ভাল লেগেছিল যে আমি হিন্দী আর ইংরাজীতে ওটা অনুবাদ করে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। আমি আপনার প্রকাশকের কাছে লোকও পাঠিয়েছিলাম আপনার ঠিকানার খোঁজে। কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁর কাছ থেকে আমরা ঠিকানা যোগাড় করতে পারিনি। কেউ বললেন, আপনি সাউথ ক্যালকাটার কোনো কলেজে কাজ করেন। দক্ষিণ কলকাতায় লোক পাঠালাম। দু-তিনটে কলেজে খোঁজ করেও আপনার হদিস পাওয়া গেল না। একজন একদিন বললেন, টালিগঞ্জের দিকে আপনি থাকেন। টালিগঞ্জ এত বড় অঞ্চল, ঠিকানা না থাকলে পাব কোথায়? পঞ্চান্নটি কর্মচারী কাজ করছে আমার দোকানে! তাদের ভেতর যাদের বাড়ি টালিগঞ্জ তাদেরও জিজ্ঞেস করলাম। না, আমার সব খোঁজা-ই বিফল হয়ে গেল। আজ স্বয়ং আপনি এসে ধরা দিয়েছেন।

আমার সমস্ত ক্ষোভ তখন গলে জল। আমি কি আর বলি। শুধু বললাম, আপনি যে অবাঙালী তা আপনার কথায়, পোশাকে বোঝার কোনো উপায় নেই।

আমি যে অবাঙালী তা আপনাকে কে বললে?

আমি সস্মিত মুখে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে উনি বললেন, দেড়শ বছর এই বাংলাদেশে আমরা রয়েছি। তারও আগে ছিলাম বেনারসের বাসিন্দা। তারও আগে পাঞ্জাবে। এক জায়গায় যাদের পূর্বপুরুষ দেড়শ বছর ধরে রয়েছে সে জায়গাটা কি তাদের দেশ নয়?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

দোকান ছুটি না হওয়া পর্যন্ত গল্প চলল আমাদের। অসম্ভব দিলদরিয়া মানুষ। কিন্তু বুঝলাম বিজনেসের ব্যাপারে উনি তাঁর নীতি থেকে একচুলও সরেন না।

চলে আসার সময় উনি বললেন, এখানে আপনাদের জন্য দরজা সবসময় খোলা। আপনার কলেজ তো এই সামনেই। ছুটি হলে আপনি চলে আসবেন এখানে। শনিবার যদি আসেন তাহলে আমাদের এ আড্ডায় সাহিত্যিক, বিচারক, কর্পোরেশন, রেল ও পুলিশের বড়বাবুদেরও দেখতে পাবেন। আমাদের একটি মাত্র শর্ত, সব পেশার লোকই এখানে আসতে পারেন কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রীতি থাকা চাই, তাঁকে বই-প্রেমী হতে হবে।

কলেজ ছুটি হয়ে গেলে কি এক অনিবার্য আকর্ষণে আমি এসে পড়তাম দয়ালজীর এই আড্ডার আসরে। বৈকালিক জলযোগের সঙ্গে নানাধরনের গল্প আর ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী বইয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ থেকে পাঠ চলত। সিনহা সাহেব ইংরাজীর লোক কিন্তু বাংলা ইংরাজী দুটো বিষয়েই তাঁর গভীর পড়াশুনো। তিনি যখন কোনকিছু পড়তেন তখন সে পাঠটি শোনার

মতো হতো। প্রতিদিনের আসরে প্রায় হাজির থাকতেন সিন্‌হা সাহেব ছাড়া সরিৎশেখরবাবু, পতিতপাবনবাবু আর শিববাবু। সরিৎশেখরবাবু আর পতিতপাবনবাবু নিজেদের লেখা কবিতা আর গল্প প্রায়ই পড়ে শোনাতেন। এই রোজকার আসরে পরে এসে যোগ দেন সাহিত্যিক তারাপদ রাহা মহাশয়।

মিঃ সিন্‌হার অবাধ অধিকার ছিল ওঁর শো-রুম থেকে যে কোনো রকমের বই নিয়ে যাওয়ার। তিনি বই নিয়ে গিয়ে পড়তেন। বিশেষ বিশেষ অংশ আমাদের চায়ের আসরে পড়ে শোনাতেন। তারপর বইটি শো-রুমে ফেরৎ দিয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে কিছু অংশ পাঠ ছিল আবশ্যিক। শেষে দয়ালজী পড়তেন 'নবনীত' হিন্দু মাসিক থেকে নির্বাচিত অংশ। তাছাড়া ইংরাজী, হিন্দী বইয়ের ভেতর যা কিছু তাঁর ভাল লাগত তিনি তা একটি বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতেন। সেগুলি থেকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন আমাদের।

অসম্ভব সুন্দর ছিল তাঁর অনুভূতি আর নির্বাচন। ওঁর সংগ্রহগুলি মণি-মঞ্জুষায় রাখা রত্নের মত মূল্যবান ছিল। আমরা দারুণ উপভোগ করতাম। কোন কোন দিন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আড্ডায় এসে যোগ দিতেন।

অচিন্ত্যবাবু যেদিন আসতেন সেদিন আমাদের আসরের মেজাজই বদলে যেত। তিনি শুরু করলে অন্তত দু'তিন ঘণ্টা অনর্গল বলে যেতে পারতেন। তাঁর বিষয়বস্তু আর বর্ণনার কৌশল চুম্বকের মত আমাদের আকর্ষণ করত। প্রেমেন্দ্র মিত্র বেশী কথা বলতে পারতেন না। দু'একটা কথা যা বলতেন তা কিন্তু অব্যর্থ লক্ষ্য তীরের মত লক্ষ্য বস্তুকে ভেদ করত। কথা বলার কৌশল ছিল বিচারপতি বাগচী মশাইয়ের। তিনিও অচিন্ত্যবাবুর মতো দু-তিন ঘণ্টা গল্প করে জমিয়ে রাখতে পারতেন। তিনি অবশ্য সাহিত্যের এলাকায় বিচরণ করতেন না। ধর্ম, আর বিচার বিভাগ নিয়ে বিচিত্র সব বিষয়ের অবতারণা করতেন। কখনও কখনও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অলৌকিক বস্তু ঢুকে পড়ত। কিন্তু এত গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি সেগুলি বলতেন যে সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকত না।

তিনটেতে সেদিন ছুটি হয়েছিল। আমি সোজা চলে এলাম দয়ালজীর ওখানে।

কি খাবেন প্রফেসার ?

বললাম, সন্ধ্যের সময় একসঙ্গে জলযোগ করা যাবে।

কলেজ থেকে সোজা চলে এসেছেন, এখন একটু কিছু খান।

উনি পকোড়া আর কফি আনালেন।

আমি খাচ্ছি আর উনি ওঁর ফাইলের কাজ সারছেন। এমন সময় স্যুইং ডোর ঠেলে ওঁর এক আত্মীয়ের ছেলে ঘরে ঢুকল। আমি ওকে জানি, ও এখানে কাজ করে।

ও এসে বলল, এক ভদ্রলোক আমাদের শো-রুমে এসেছিলেন। তিনি

অনেকগুলো বই চেয়ে নিয়ে দেখলেন কিন্তু একটিও না কিনে চলে গেলেন। পেছন থেকে সুবীরবাবু মন্তব্য করলেন, এতগুলো বই নামিয়ে পাহাড় করলেন কিন্তু গাঁটে এমন রেস্ত নেই যে একখানা কেনেন। ভদ্রলোক মন্তব্যটা শুনেছেন কিনা বলতে পারব না, কিন্তু সুবীরবাবু বেশ জোরে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন।

দয়ালজী চশমাটা খুলে চোখটা মুছলেন। এবার চশমাটা পরে উনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, সুবীরবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সুবীরবাবু এসে হাজির হলেন। দয়ালজী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, একটু আগে এক ভদ্রলোকে এসে খুব ঝঞ্ঝাট করে গেছেন তো ?

হাঁ স্যার। আমাকে দিয়ে অনেক বই নামিয়েছেন। শেষে ঘেঁটে ঘুঁটে একটিও না কিনে চলে গেছেন।

দয়ালজী বললেন, এ দোকানটা কার সুবীরবাবু ?

আজ্ঞে, আপনার।

আপনি ভুল বলছেন, এ দোকানে আমার যতটা অধিকার আপনাদের তার চেয়ে এককড়ি কম নয়। সুতরাং এ দোকানের মর্যাদা রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আপনি আজ আমাদের দোকানের মর্যাদা রাখতে পারেননি।

এবার বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, যদি কোনো কাস্টমার বই দেখতে চেয়ে আমাদের শো-রুমের সমস্ত বই নিচে নামিয়ে ফেলেন এবং একটিও না কিনে চলে যান, তাহলেও আপনারা হাত জোড় করে বলবেন, দয়া করে আবার আসবেন।

আপনি জানবেন, ঐ ভদ্রলোক তারপর একটি বই দরকার হলেও আমাদের দোকানে এসেই কিনবেন।

সেদিন সন্ধ্যে পাঁচটায় এলেন মিঃ সিন্‌হা। যথারীতি কিছু পড়া হলো। একসময় হঠাৎ দয়ালজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শৈলপুরী কুমায়ুন' এখন কোন পাবলিশারের কাছে আছে ?

বললাম, নতুন পাবলিশার দুটো এডিশন করেছিল। এখন প্রায় বছর তিনেক আউট অব প্রিণ্ট।

উনি ডান হাতখানা বাড়িয়ে হেসে বললেন, দিন, আমি ছাপব।

বললাম, কালই নিয়ে আসবো।

দয়ালজী বললেন, বইটার কিন্তু বেশ নাম হয়েছিল। আমি অনেকের মুখে শুনেছি।

আমি বললাম, নিজের বই সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক নয়, তবে এ বই নিয়ে আমার একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে।

সিন্‌হা সাহেব বললেন, কিরকম ?

বছর দুয়েক আগে আমার একটা চোখ নিয়ে বিশেষ ট্রাবলে পড়ি। বন্ধুদের পরামর্শে অন্যতম নামকরা চোখের ডাক্তার নীহার মুন্সী মশাইয়ের

কাছে যাই। তখন ওঁর চেম্বার ছিল ক্রীক রোতে। দুটোর পর গেছি ওঁর চেম্বারে। নাম লিখিয়ে বসে আছি। আমার আগে দু-একজন এসেছেন। পরে আরও অনেকে এলেন।

রোগী দেখা শুরু হলো। পরপর দুজনের ডাক পড়ল। এবার আমার পালা। আমাকে কিন্তু ডাকা হলো না। আমার পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই চোখ দেখালেন। আমি তখন ক্লান্ত এবং কিছুটা ক্ষুব্ধও।

মিনিট দশেক আর কাউকে ডাকা হলো না।

হঠাৎ আমার ডানদিকের একটা দরজা খুলে গেল। একজন বেয়ারা আমার কাছে এসে ধীর গলায় বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

আমি ভাবলাম, ওদিকেও বুঝি ডাক্তারবাবুর আর একটা চেম্বার আছে। আমি বেয়ারাটির পেছন পেছন দরজাটি দিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। বেয়ারা দরজা বন্ধ করে সামনের টানা পরদাটা সরিয়ে দিল।

আমি তো অবাক। একটি ডাইনিং টেবিলের দুদিকে দুজন বসে রয়েছেন। একজন ডাক্তার মুন্সি অন্যজন সম্ভবত তাঁর স্ত্রী। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুদর্শনা মহিলা। উনি নমস্কার করে হেসে আমাকে বসতে বললেন।

ডাঃ মুন্সী বললেন, যথাসময়ে ডাক না পেয়ে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তো?

আমি সসঙ্কোচে একটু হেসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। তখনও আমি ব্যাপারটা কি তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এটা যে একটা বৈকালিক চায়ের আসর তা বোঝা যাচ্ছিল। চায়ের কাপ ইত্যাদি সাজানো। ডালমুট আর কয়েক রকমের বিস্কুট রয়েছে প্লেটে।

ভদ্রমহিলা প্রথম চা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, আপনার 'শৈলপুরী কুমায়ুনে'র জন্য ধন্যবাদ। কালই আমি বইটি পড়ে শেষ করেছি।

ডাঃ মুন্সী বললেন, আমাকেও উনি অনেকগুলো জায়গা পড়ে শুনিয়েছেন। আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা এবার পুজোর ছুটিতে ওদিকে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনাও করেছি।

একটু থেমে আবার বললেন, স্লিপে আপনার নামটা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিসেসের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলাম। চায়ের টেবিলে একজন লেখকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হবে। কাল রাতে যে লেখকের বই আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলে।

আমরা চা খেতে খেতে নৈনিতাল, আলমোড়া, রানীক্ষেত এবং কৌসানীর অনেক গল্প করলাম। পিণ্ডারী যেতে হলে যে হাতে একটু বেশী সময় নিতে হবে তা-ও বললাম।

সেদিন কিন্তু আমার শত অনুরোধ সত্ত্বেও ডাঃ মুন্সী একটি পয়সাও ফি নিলেন না। তারপর কয়েকবারই যেতে হয়েছে। এমন সজ্জন হৃদয়বান ডাক্তার আমি খুব কম দেখেছি। একবার ফোনে বললাম, দাদা দুটি গরীব ছেলে চোখ নিয়ে ভীষণ ভুগছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, পুরো ফি-টা দেওয়া

তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কাল তিনটেয় নিয়ে চলে এস।

উনি যত্ন করে ওদের চোখ দেখে দিলেন। মাঝে মাঝে এসে দেখিয়ে যেতে বললেন। সেদিন ওদের কাছ থেকে কোনো ফি নেননি এবং পরেও না।

দয়ালজী বললেন, এঁরা সত্যিকারের চিকিৎসক। এখন ওঁর মতো ডাক্তারের যখন ভাল লেগেছে তখন আমরা 'শৈলপুরী কুমায়ুন' ছাপা শুরু করতে পারি।

আমি বললাম, আচ্ছা দাদা, এটা তো পুরানো বইয়ের সংস্করণ হবে, প্রথম যদি একটা নতুন বই দিয়ে শুরু করা যায় তাহলে কেমন হয়? 'শৈলপুরী' তো হাতে রইলই।

বেশ তাই দিন, কিছু রেডি আছে?

বললাম, কতকগুলো বড় গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিল, সেগুলোর অধিকাংশই প্রেমের গল্প। আমি তার একটা সংকলন বের করতে চাই। সংকলনটির নামকরণও আমি করে রেখেছি। 'অনেক বসন্ত দুটি মন'।

দয়ালজী বললেন, কি বলেন সিন্‌হাসাহেব? প্রেমের গল্প দিয়েই শুরু হোক যাত্রা।

সিন্‌হা সাহেব মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন।

পরের দিন আমি গল্প সংকলন আর 'শৈলপুরী কুমায়ুন' বইখানা ওঁর হাতে তুলে দিয়ে এলাম।

একদিন উনি আমার হাতে একখানা বই ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ইংরাজী বইয়ের প্রথম পাতায় ছোট্ট একটি সিনপ্‌সিস্‌ থাকে। ওটা পড়লেই ক্রেতারা বই সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে।

আমি বললাম, দেখেছি, ক্রেতাদের অনেক সুবিধে হয় তাতে।

দয়ালজী বললেন, আপনি বাংলায় ঐ বইখানার ওপর লাইন দশেকের মত একটা সংক্ষিপ্তসার লিখে আনবেন তো।

বললাম, চেষ্টা করব।

বইখানা সংস্কৃত কাদম্বরীর প্রবোধেন্দু ঠাকুর কৃত বাংলা অনুবাদ। আমি আগে এ বইখানা পড়েছিলাম। তদ্ভব, তৎসম শব্দের প্রচুর ব্যবহার। কিন্তু বাক্য গঠনের এমন নৈপুণ্য যে প্রতিছত্রে যেন জীবন্ত প্রতিমা লীলা রসভরে এগিয়ে চলেছেন।

আমি তিন দিন পরে কাদম্বরীর ওপর একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে হাজির হলাম।

দয়ালজী চোখ বন্ধ করে আমার ঐ ছোট্ট এক চিলতে লেখা শুনলেন।

পড়া শেষ হলে উনি মাথা নাড়লেন। মনে হলো খুশী হয়েছেন, কিন্তু মুখে কোনোরকম মন্তব্য করলেন না।

একসময় বললেন, কাল আপনার ক্লাশ অফ হচ্ছে কখন?

পকেট থেকে রুটিন বের করে দেখে নিয়ে বললাম, আড়াইটায়।

কলেজ ছুটি হলে একবার চলে আসতে পারবেন ? দুজনে একসঙ্গে এক-জায়গায় যাব।

নিশ্চয় আসব।

পরের দিন আমরা দয়ালজীর গাড়িতে তিনটের ভেতর বেরিয়ে পড়লাম। উনি কোথায় যাচ্ছেন তা কিন্তু আমাকে বললেন না। জোড়াসাঁকো এলাকায় গাড়ি ঢুকল। অনেক পুরনো বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি গিয়ে একজায়গায় থামল। দুজনে গাড়ি থেকে নামলাম। দয়ালজী এগিয়ে চললেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। একটু পরেই একটা প্রাচীন বাড়ির ফটকের সামনে এসে হাজির হলাম। গেটের সামনের অংশটি নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছে বলে মনে হলো। গেটের সামনে একটি চাঁপাগাছ ফুল ফুটিয়েছে। ভেতরে ঢুকেই একখানি বসার ঘরে এসে পড়লাম। এক সুদর্শন প্রৌঢ় একখানি বড় চৌকিতে বসে কি যেন পড়ছিলেন। দয়ালজী ঢোকামাত্রই দুজনের নমস্কার বিনিময় হলো। উনি পাশের আসন দেখিয়ে বসতে বললেন।

আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় বসার পর দয়ালজী আমার পরিচয় দিলেন এবং আমি যে তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন সে কথারও উল্লেখ করলেন।

এরপর দয়ালজী তাঁর ফাইল থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি এগুলোর ভেতর থেকে একটা বেছে দিন।

ভদ্রলোক চারটে কাগজের কিছু লেখা নিবিষ্ট হয়ে পড়লেন।

পড়ার শেষে তিনটি কাগজ দয়ালজীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এই লেখাটা আমার পছন্দ,—বলেই কাগজটাকে ওপরের দিকে তুলে ধরলেন।

দয়ালজী অমনি তাঁর বিশেষ ভঙ্গীর হাসিটি হেসে বললেন, আপনিই বাজি মাৎ করলেন অধ্যাপক।

প্রবোধেন্দুবাবু সুভদ্র মানুষ। উনি বললেন, সকলেই নিজের নিজের মতো ভালই লিখেছেন। কিন্তু আমার ভাষার চলনটির সঙ্গে এঁর লেখাটি বেশ মানিয়ে গেছে।

ওঁর বাড়ীর ভেতর থেকে তবকে মোড়া দুটি করে সন্দেশ এল। পানপাতার মতো কালো পাথরের দুটি পাত্রে। শ্বেত পাথরের দুটি গ্লাসে জল।

আমি বললাম, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর বরানগরের আস্তানায় আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম। সেখানেও এমনি কালো পাতার মতো পাথরের পাত্রে আমাদের খেতে দেওয়া হয়েছিল।

প্রবোধেন্দুবাবু বললেন, উনিই তো আমার গুরুদেব। কেবল রক্ত-সম্পর্ক নয়, শিল্পভাবনায় আত্মার আত্মীয়।

ঘরের এককোণে টিপয়ের ওপর একটা কালো পাথরের মাঝারি থালায় খানিকটা জল ঢেলে তার ওপর ছড়িয়ে রাখা ছিল একমুঠো অশোক অথবা রঙ্গনের লাল ফুল। ঠাকুরবাড়ির রুচি ও সৌন্দর্যের নমুনা।

চলে আসার আগে ছোট্ট একটি পেতলের ডাবর থেকে আমাদের জন্য সাজা পান নিজের হাতে তুলে দিলেন প্রবোধেন্দু ঠাকুর। মিঠে পান, কমলালেবুর

শুকনো খোসার টুকরো মেশানো।

ফেরার সময় গাড়িতে বসে দয়ালজী বললেন, আমি চার জনকে লিখতে দিয়েছিলাম, উনি যখন নাম না জেনে আপনারটাই পছন্দ করলেন তখন আমার বাংলা পাবলিকেশানের সিনপ্সিস্ লেখা আর লেখকের জীবনী লেখার দায়িত্ব এখন থেকে আপনাকে নিতে হবে। আপনি আজ থেকে হলেন আমাদের বাংলা পাবলিকেশান ডিপার্টমেন্টের এডিটর।

ভারী খুশী আমি।

উনি আবার বললেন, প্রতিটি বইতে আপনার একটা পার্সেন্টেজ থাকবে।

বাসায় ফিরে সঙ্গীতাকে বললাম সব কথা। সঙ্গীতা বলল, তোমার যাতায়াতের টাকাটা উঠবে।

হেসে বললাম, এটাও কম কি। আমি খুবই আনন্দে ছিলাম। তাই বললাম, একদিন দয়ালজীকে বাসায় নেমন্তন্ন করবো।

কিন্তু উনি তো মছলি খাবেন না।

আমি বললাম, তুমি পুরী আর আলুর দম তৈরী করবে, আমি দহি-বড়া আর মেঠাই নিয়ে আসব।

সঙ্গীতা বলল, তেওয়ারীর দোকান থেকে কয়েকখানা জিলাবীও এনো।

তথাস্তু।

পাঁচটার পর একদিন দয়ালজী গাড়ি করে আমার বাসায় এলেন। সঙ্গে দু-তিনখানা ইংরাজী বই, একখানা শাড়ী আর একবাক্স মিষ্টি। উনি জানতেন, আমি বিবাহিত।

প্রথম দর্শনেই দয়ালজী সঙ্গীতাকে বললেন, মা তোমাকে দেখতে এলাম।

সঙ্গীতা প্রথমে নত হয়ে নমস্কার করেছিল, হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

দয়ালজী বললেন, আমার মেয়ে নেই, আজ থেকে তুমিই আমার মেয়ে, কি বল?

আমি বললাম, দাদা, আপনাকে আমি দাদা বলে ডাকি, ও-ও আপনাকে দাদা বলেই ডাকবে।

ডাকাতে কি এসে যায়। আজ থেকে ও আমার মেয়ের স্নেহটি পাবে।

বললাম, সে ওর সৌভাগ্য।

উনি বই, মিষ্টি আর শাড়ী সঙ্গীতাকে উপহার দিলেন।

খেতে খেতে বললেন, তোমার জন্মদিন কবে মা?

সঙ্গীতা বলল, বড় একটা পুণ্যদিনে আমি জন্মেছি। কবিগুরুর জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখে।

দয়ালজী বললেন, আমার এক বন্ধু সিন্‌হা সাহেব রোজ আমাকে রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনান। ওটা আমার কাছে পুজোর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বললাম, আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন?

দয়ালজী বললেন, ঠাকুরবাড়ির আখড়াতে প্রায় রোজ কুস্তি লড়তে যেতাম। সেখানে প্রবোধেন্দু ঠাকুরও যেতেন। এক ভদ্রলোককে প্রায়ই দোতলার ওপর বসে থাকতে দেখতাম। একদিন প্রবোধেন্দুবাবুকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। একদিন ওঁকে উঠোন পেরিয়ে যেতে দেখলাম। আমি অবাক হলাম, ভাবুকের মত ওঁর বড় বড় দুটো চোখ দেখে। ব্যস ঐ পর্যন্ত। তারপর অনেকখানি বড় হয়ে ওঁর মাহাত্ম্য জানতে পেরেছি।

সেদিন দয়ালজী অনেকক্ষণ আমার বাসায় ছিলেন। যাবার সময় সংগীতাকে বললেন, আমার বাড়ির মেয়েরা তোমার কাছে আসবে। তুমিও সময় সুযোগ করে এসো আমার বাড়ি। আমি সারা বছরে অন্তত একদিন তোমার এখানে আসব। সেদিনটা পঁচিশে বৈশাখ।

হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত হলো দয়ালজীর।

সংগীতা বলল, আমি কিন্তু সেদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকব দাদা।

হাহা করে হেসে বললেন, আসব, তোমার হাতের তৈরী ভোজ খাবার জন্যে।

কিছুদিন আগে 'গল্পভারতী'তে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটির নাম দিয়েছিলাম, 'ডাঃ জনসনের ডায়েরী'। অরণ্যসংগ্রামের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। সারান্দা ফরেস্টের এক আদিবাসী 'হো' কন্যা কিভাবে ইংরাজ রেঞ্জার এবং তার সশস্ত্র দলবলের বিরুদ্ধে নিজের মানুষদের সংঘবদ্ধ করে লড়াই চালিয়েছিল তারই এক কাহিনী ছিল ঐ উপন্যাসে। ইংরাজদের নিষ্ঠুরতার মাঝখানে মানবদরদী জনসন নামে এক ডাক্তারের নিরলস সেবার কথাও বলেছিলাম কাহিনীর মধ্যে।

এই উপন্যাসটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্বনামধন্য অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে 'মুখর অভিযান' নাম দিয়ে এই কাহিনীটি মঞ্চস্থ করেন।

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র বিমলদা পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীটিকে প্রকাশ করেন গ্রন্থাকারে। সে সময় উপেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন না। আমি গ্রন্থখানি তাঁকেই উৎসর্গ করি।

এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে উপেন্দ্রনাথের কথা। কি অগাধ ভালবাসা ছিল তাঁর মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে শিল্পী, সাহিত্যিকদের ওপর। আমার সব থেকে প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমরগ্রন্থ 'পথের পাঁচালী'কে ছাপার অক্ষরে হয়ত দেখতে পেতাম না যদি উপেন্দ্রনাথ রচনাটির মর্ম উপলব্ধি করে প্রকাশ না করতেন তাঁর 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।

প্রবাসী থেকে ফিরে এসেছিল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপি। সেই ফিরে আসা পাণ্ডুলিপিটির কয়েক পৃষ্ঠা শুনেই তিনি

বুঝেছিলেন, এই গ্রন্থ নতুন এক দিগন্ত খুলে দেবে। এই লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রবাহকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

ধারাবাহিকভাবে বিচিত্রায় প্রকাশিত হতে লাগল 'পথের পাঁচালী'। পাঠকেরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল, গ্রাম জীবনের অন্তঃপুরে এক দরিদ্র, মুগ্ধমতি গ্রাম্যবালকের স্বপ্নময় জীবনের ছবি, কবিতায় ভরা পল্লীপ্রকৃতির দৃষ্টিনন্দন আলো, দরিদ্র জীবনের মর্মস্পর্শী কাহিনী এমন অনায়াস বর্ণ-সম্পাতে ক'জন লেখকই বা অঙ্কন করতে পারেন।

আজ বিশ্বের রসিক সমাজে যে গ্রন্থখানি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার মূল্য প্রথম পাঠেই উপলব্ধি করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ।

বিভূতিভূষণকে সাহিত্যজগতে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত বাঙালী পাঠক চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন সম্পাদক সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথের কাছে।

আকাদেমী পুরস্কার পেলেন তারাশঙ্কর। তিনি দিল্লী থেকে চিঠি লিখলেন উপেন্দ্রনাথকে। সে চিঠি আমরা উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশ করেছিলাম 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকার উপেন্দ্র স্মরণ সংখ্যায়।

চিঠিখানির বিষয়বস্তু ছিল এরকম,—দাদা, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম নেবেন। আজ সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতির পুরস্কারটি পেয়ে প্রথম আপনার অবয়বখানিই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল।

আমি তখন এক ভবঘুরে। সাহিত্যসৃষ্টির পাগলামো চেপে বসেছে মাথায়। এক সাহিত্যসভার খবর পেয়ে পকেটে একটি সদ্যলেখা গল্প নিয়ে হাজির হয়েছি সভাস্থলে। আপনি সেদিন সে সভায় সভাপতি। অনেকেই রচনা পাঠ করছিলেন, সমালোচনাও চলছিল মাঝে মাঝে। আমি সবিনয়ে আপনার অনুমতি চাইলাম, গল্পটি পাঠ করার জন্য। এক অপরিচিত সাহিত্যপ্রেমী যুবকের হৃদয়াবেগকে উপলব্ধি করে আপনি অনুমতি দিলেন।

গল্পপাঠ শুরু হলো। কিছু পরেই সভায় উঠল গুঞ্জন। অশ্লীল, অশ্লীল, বসে পড়ুন।

আমি মাঝপথেই থেমে গেলাম। অত্যন্ত অপমানে, বেদনায় তখন আমি মুহ্যমান। মনে মনে জপ করছি, বসুন্ধরা দ্বিধা হও, আমি আমার লাঞ্ছিত মুখখানা লুকোই।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক অসহায় সাহিত্যপ্রেমীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন আপনি। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমার যদি কিছুমাত্র সাহিত্য-বোধ থেকে থাকে তাহলে আমি এই সভায় গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, যে সাহিত্যিক এমন একটি গল্প রচনা করেছেন, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সাধনার পথে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে পারলে এই যুবক একদিন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদা লাভ করতে পারবেন।

সেদিনটির কথা আমি আজও ভুলিনি দাদা। তাই আপনাকে এই গৌরব লাভের দিনে প্রথম প্রণামটি নিবেদন করতে পেরে গভীর তৃপ্তি বোধ করছি।

শেষ জীবনে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সামান্য মনান্তর

হয়েছিল। এদিকে সজনীকান্তের সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তাঁর একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মনান্তরটি দূর করার ব্যাপারে তিনিই মধ্যস্থতা করেছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস টিপ্পনি কাটলেন, উনি তো গল্পভারতী (তখন উপেন্দ্রনাথ গল্পভারতীর সম্পাদক), তাই ভাল করেই গল্প বানাতে পারেন।

কয়েকটি সংখ্যা গল্পভারতী আর শনিবারের চিঠির ভেতর বাদ-প্রতিবাদ চলল।

শেষে প্রশান্ত মহলানবীশ মশায়ের বাড়িতে যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মিলন ঘটেছিল এবং তার উদ্যোক্তা যে উপেন্দ্রনাথই ছিলেন এটি মহলানবীশ মশায় সমর্থন করায় বাদ-প্রতিবাদ থেমে গেল।

আমি কিন্তু তৎকালের সাহিত্যিকদের হৃদয়ের একটি পরিচয় পেয়েছিলাম উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

যে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে শেষ জীবনে তাঁর মনান্তর চলছিল তিনি মৃত্যু-সংবাদ শুনে ছুটে এলেন তাঁর টালার বাড়ি থেকে। আমি চোখের সামনে দেখলাম, মৃতের দুটি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন তারাশঙ্কর। যখন মাথা তুললেন তখন তাঁর চোখ অশ্রুসজল। তারাশঙ্করের এ মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের মহত্ত্বের আর একটি কথা মনে পড়ছে। ঘটনাটি শুনেছিলাম সুলেখক মধুসূদন মজুমদারের মুখে। একবার স্বনামধন্য গীতিকার ও সুরকার হীরেন বসুর সঙ্গে আকস্মিকভাবে তারাশঙ্করের দেখা হয়ে যায়। আলাপের মধ্যে হঠাৎ সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়। সে বিতর্ক শেষ অবধি ব্যক্তিগত আক্রমণে গিয়ে পৌঁছয়। তখন দুজনেই ক্ষুব্ধ হয়ে স্থান পরিত্যাগ করেন।

বেশ কিছুকাল পরের কথা। তখন 'নবকল্লোল' পত্রিকায় 'পঞ্চবর্ষী' ছদ্মনামে কোনো এক লেখক 'জাতিস্মরের শিল্পলোক' নামে একটি ধারাবাহিক রচনা লিখছিলেন। সেটি পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। অনেকেই এই ছদ্মনামের আড়ালে কোন লেখক লিখছেন তা জানতে চান। কিন্তু পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কাউকে সে বিষয়ে কিছু জানাননি।

একদিন মধুসূদনবাবুর সঙ্গে তারাশঙ্করের দেখা। তারাশঙ্কর বললেন, মধুসূদন, তোমার পত্রিকার 'পঞ্চবর্ষী'টি কে?

কেন দাদা?

তারাশঙ্কর বললেন, চমৎকার লেখা।

মধুসূদনবাবু বললেন, হীরেনদা লিখছেন, হীরেন বসু।

আমি তাঁকে বিলক্ষণ চিনি। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

মধুসূদনবাবু বললেন, সে ব্যবস্থা আমি করব।

হীরেনবাবু নবকল্লোল অফিসে আসতেই মধুসূদনবাবু বললেন,

তারাশঙ্করদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি কবে কোথায় থাকবেন বলুন ?

হীরেনবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, তারাশঙ্করবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, আমিই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনবাবুর গাড়িতে দুজনে টালার দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

তারাশঙ্করের বসার ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, লেখক একটি বই নিবিষ্ট হয়ে পড়ছেন। হঠাৎ পায়ের সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন।

আরে মধুসূদন তুমি হীরেনবাবুকে ধরে এনেছ, আমি নিজেই ওঁর কাছে যেতে চেয়েছিলাম।

হীরেনবাবু বললেন, দাদা আপনি যাবেন আমার কাছে, একি একটা কথা হলো। আপনার ইচ্ছের কথা শুনে আমি নিজেই আপনার পায়ের ধুলো নিতে চলে এলাম।

কথাগুলো বলেই হীরেনবাবু নত হয়ে তারাশঙ্করের পায়ের ধূলি নিতে যাচ্ছিলেন, অমনি দুহাতে তাঁকে তুলে তারাশঙ্কর নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার স্থান এইখানে। তুমি পরিচালক, গীতিকার, সুরকার বলে জানতাম, কিন্তু তুমি যে এমন সাহিত্যও রচনা করতে পার তা 'জাতিস্মরের শিল্পলোক' না পড়লে জানতে পারতাম না। তুমি তোমার দুর্বলতাগুলিকেও অকপটে বলে গেছ। একমাত্র গান্ধীজীর রচনায় ছাড়া এরকম অকপট স্বীকারোক্তি আমি আর কোথাও দেখিনি।

হীরেনবাবুও তখন আপ্লুত গলায় বললেন, যে সাহিত্যিক আজ ভারতের গৌরব, তাঁর এই 'উক্তি' আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে মনে করি।

এসব মানুষদের ভেতরে এমন একটা ঐশ্বর্য ছিল যার বলে তাঁরা মুহূর্তে মনের সমস্ত গ্লানিকে সরিয়ে ফেলতে পারতেন।

কথা হচ্ছিল উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। সেদিন কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত ভোরবেলা খবর পাওয়া মাত্রই চলে এসেছিলেন উপেন্দ্রনাথের শেষশয্যার পাশে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শোকযাত্রার সমস্ত আয়োজন তদারকি করছিলেন তিনি।

আমরা সেদিন নগ্ন পায়ে উপেন্দ্রনাথের শবাধার নিয়ে ক্যাওড়াতলা যাত্রা করেছিলাম।

'উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্যময় শেষ আড্ডার আসরটি উঠে গেল।' সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিচারণে একসময় এই উক্তিটি করেছিলেন।

এখন দয়ালজীর কাছে প্রায় প্রতিদিনই আমাকে যেতে হচ্ছে। যত পাণ্ডুলিপি আসে তা নির্বাচনের জন্য বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন রীডারের কাছে পাঠানো হয়। যেগুলি নির্বাচিত হয় সেগুলির শেষ সম্পাদনার ভার পড়ে আমার ওপর। তাই আমি ওখানে বসে বসেই আমার কাজ করি।

দুপুরবেলা ফল খান দয়ালজী। তাঁর সঙ্গে আমাকেও এক প্লেট ফল দিয়ে

যায় বেয়ারা।

উনি মাঝে মাঝে বলেন, ফিস ফ্রাই আনিয়ে দেব? আমি নিরামিষাশী, তা বলে আপনি মাছ খাবেন না কেন?

হেসে বলি, এখানেই বোঝা যাচ্ছে আপনি বাঙালী নন। যদিও প্রতিটি আচরণে এবং কথায় আপনি নিজেকে বাঙালী বলে প্রমাণ করতে চান।

উনি হো হো করে হেসে উঠে বলেন, প্রফেসর, কথা আছে আপ রুচি খানা।

আমার ছেলেদের বলেছি, তোমরা ইচ্ছে হলে মাছ মাংস খাবে, তবে বাড়িতে নয়।

কয়েকদিন আমি দেশের বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দয়ালজীর বুক-শপে গেলাম। উনি একা বসেছিলেন। মনে হলো ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখের এধরনের ভাবান্তর আমি আগে কখনও দেখিনি।

কিছুক্ষণ পরে যেন নিজের সম্বিত ফিরে পেলেন।

কবে ফিরলেন?

আজই বেলা দশটায়।

কলেজে যাননি?

কলেজ ছুঁয়ে চলে এসেছি। কিন্তু দাদা ঘরে ঢুকেই আপনাকে কেমন বিচলিত দেখছিলাম।

আপনি অবিনাশবাবুকে জানেন তো? উনি আমার স্টেনো। ওঁর সতের বছরের একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিল কয়েক মাস আগে। জামাইটি ব্লাড ক্যানসারে কয়েক দিন আগে মারা গেছে। অবিনাশবাবু আজ এসে খুব কান্নাকাটি করছিলেন।

আমি বললাম, দারুণ দুঃখের খবর তো!

উনি বললেন, আমি অবিনাশবাবুকে বলেছি, ঐ কচি মেয়েটিকে বিধবা সাজিয়ে রাখবেন না। ভাববেন, ওর বিয়ে হয়নি। ওকে আবার বিয়ে দিতে হবে।

অবিনাশবাবু কেঁদে বললেন, একবার বিয়ে হওয়া মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

আমি বলেছি, আপনি ভাল পাত্র খুঁজুন। সে পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে ক' হাজার টাকা লাগবে আমি দেব।

বললাম, এ তো দারুণ প্রস্তাব। অনেক গরীব বাড়ির মেধাবী ছেলে এমন মেয়েকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে।

দয়ালজী বললেন, আমার মা এরকম অল্পবয়সী বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে কয়েক জনকে সাহায্যও করেছেন। যে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর জন্মেছেন, সে দেশে এই সব দুঃখী মেয়ের বিয়ে হবে না, তাকি হয়?

মায়ের কথা যেই উঠল, দয়ালজীর মুখ চোখ, গলার স্বর বদলে গেল।

এক মাতৃনির্ভরশীল অসহায় শিশুর মতো হয়ে গেলেন তিনি।

দয়ালজী বলতে লাগলেন, আমার বয়েস যখন চার বছর তখন বাবা মারা যান। আমরা ছোট্ট একখানা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। ভরণপোষণের সংগতি ছিল না। মা অনেক কষ্টে সংসার চালাতেন।

আমি ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর পৈতৃক রুমালের ব্যবসা শুরু করি। বিলিতি রুমালের ব্যবসা ছিল একসময়। লোকের অভাবে তা প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। আমি সেই রুমাল আনিয়ে দোকানে দোকানে ডজন ডজন সাপ্লাই করতে লাগলাম। ব্যবসা বেশ জমে উঠল। লাহোর পর্যন্ত আমি রুমাল নিয়ে পাড়ি দিতাম।

কিন্তু হঠাৎ ব্যবসায়ে একটা বিপর্যয় নেমে এল। যে বিলিতি কোম্পানীর রুমাল আমি বিক্রি করতাম, সেই কোম্পানীর ছাপ মেরে জাপানী রুমাল একজন বিক্রি করতে লাগল অনেক সস্তা দরে।

আমাদের কোম্পানী খবরটা জানতে পেরে আমাকে কোর্টে কেস ঠুকে দিতে বলল। আমি কিন্তু রাজি হলাম না। কোর্টের হ্যাপা পোহাবে কে? কেসে ঢুকলে সময় গেল, অর্থ গেল, শান্তি গেল।

বিলিতি কোম্পানী আমার একগুঁয়েমী দেখে খারিজ করে দিল আমার এজেন্সী। যা হোক কিছু হচ্ছিল, এখন একেবারে বেকার।

আমি কথার মাঝে বললাম, বইয়ের ব্যবসা শুরু করলেন কবে থেকে? ইংরাজী বইয়ের ব্যবসার কথাইবা আপনার মাথায় ঢুকল কি করে?

দয়ালজী বললেন, আগের ব্যবসার সূত্র ধরে নতুন ব্যবসাটা গড়ে উঠল।

কি রকম?

আমার যখন এজেন্সী গেল তখন হাতে রয়েছে তিন হাজার টাকার রুমাল। আমি নিউ মার্কেটের একটা দোকানে গেলাম সেই রুমাল বিক্রির আশায়। এই দোকানটি আমাদের খদ্দের ছিল। ডজন ডজন রুমাল আমরা সাপ্লাই করেছি ওদের।

একসঙ্গে এতগুলো টাকার রুমাল স্টক করতে চাইল না দোকানদার। আমি কিন্তু নাছোড়। তখন ঐ তিন হাজার টাকা একসঙ্গে আমার হাতে এসে গেলে অনেক সুরাহা হয়।

শেষে বহুৎ কথা চালাচালি, মাথা নাড়ানাড়ির পর দোকানদারকে আমার প্রস্তাবে রাজি করালাম। মেহনতটা কাজে লাগাতে পেরে আমি মনে মনে খুবই সোয়াস্তি পেলাম।

ফিরে আসছি, মুখোমুখি হলাম এক সাহেবের। আরে এ যে খোদ লালমুখো।

সাহেব বেশ খুশী খুশী মেজাজে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি ঐ দোকানে কি বোঝাচ্ছিলে?

আমি ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে সব ব্যাপারটা সাহেবকে খুলে বললাম।

সাহেব আমার নামটা জেনে নিল। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে একখানা

কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, তুমি কাল দশটায় গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সাঁইত্রিশ নম্বর রুমে আমার সঙ্গে একবার দেখা কর।

সাহেব চলে গেল। আমি দেখলাম, কার্ডে লেখা রয়েছে, কে. জ্যাকসন মার্শেল। এক্সপোর্ট ম্যানেজার, কলিন্স্।

পরের দিন ঠিক সময়ে হোটেলে হাজির হলাম। ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি বাধা দিল দরোয়ান।

আমি বললাম, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, পথ ছাড়ো।

দরোয়ান তেরিয়া হয়ে উঠল, হুকুম নেই, ভাগো।

দেখলাম, ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে লাভ নেই। মোলায়েম গলায় বললাম, ভাই আমরা দুজনেই হিন্দুস্থানী। তুমি আমাকে একটু সাহায্য না করলে কে করবে বল ?

দরোয়ানজী মনে হলো, একটু নরম হয়েছে। বলল, কার সঙ্গে দেখা করতে চাও ?

বললাম, কে. জ্যাকসন মার্শেল। সাঁইত্রিশ নম্বর রুম।

কি নাম তোমার ?

নাম বললাম। ও সঙ্গে সঙ্গে একটা বেয়ারাকে ওপরে পাঠিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই বেয়ারা নেমে এসে বলল, সাহেব ডাকছেন।

আমি ওপরে উঠে গেলাম। সাহেবের ঘরে গিয়ে দেখি সাহেব সোফায় বসে। চারদিকে বড় বড় কতকগুলো প্যাকেট পড়ে আছে। মনে হলো বইয়ের প্যাকেট। দু'একখানা খোলা বইও দেখলাম।

সাহেব আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে সামনের চেয়ারে বসতে বলল।

আমি সাহেবের মুখোমুখি বসলাম।

সোজাসুজি কথা বলল সাহেব, তুমি ব্যবসা করতে চাও ?

বললাম, হাঁ সাহেব।

তুমি ইংরাজী বইয়েয় ব্যবসা শুরু কর, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, ও কর্ম আমার দ্বারা হবেনা।

মুখে বললাম, আমার লেখাপড়া বেশীদূর এগোয়নি সাহেব। আমি ভাল করে ইংরাজী বলতে পারি না। এ ব্যবসা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

সাহেব জোরের সঙ্গে বলল, এরজন্যে ইউনিভারসিটির ডিগ্রি দরকার হয় না। সামান্য ইংরাজী জানলে আর ব্যবসাবুদ্ধি থাকলে চলবে।

বললাম, আমার কি রকম সাহসে কুলোচ্ছে না সাহেব।

আমি কাল নিউমার্কেটে তোমার সেল্‌স্‌ম্যানসিপ্ দেখেছি। তুমি ঠিক পারবে। আমি তোমার নামে কলিন্স্ জেম ডিক্সনারী জাহাজে পাঠিয়ে দেব। তুমি ডিক্সনারী বিক্রি করবে আর দু'মাস অন্তর টাকা শোধ দিয়ে যাবে। ফুরিয়ে গেলে আবার পাঠাব।

আমি মুখ নিচু করে ভাবছি দেখে সাহেব বলল, বেশ, এখুনি তোমায় কথা দিতে হবে না। তুমি আজ সারাদিন বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি কর

কাল এসে তোমার মতামত জানিয়ে যেও।

আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, এই নতুন ব্যবসার ব্যাপারে কার কাছে পরামর্শ নিই।

কার্জন পার্কের কাছে এসে হঠাৎ আমার মনে পড়ল দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের কথা। তাইতো, এতক্ষণ ওর নামটা মনে পড়েনি। লিণ্ডসে স্ট্রীটে ওরই তো ছোট একখানা ইংরাজী বইয়ের দোকান আছে।

ছুটলাম ওর কাছে, বললাম সব কথা। এও জানালাম, আমার সাহসে কুলোচ্ছে না। যদি বই বেচতে না পারি, টাকা শোধ দেব কেমন করে।

আত্মীয়টি উত্তেজিত হয়ে বলল, তুই নামেও ভোঁদা আর ভাবনাতেও দেখছি ভোঁদা। এমন সুবর্ণ সুযোগ কেউ ছাড়ে। সেধে সোনা হাতে তুলে দিচ্ছে সাহেব। আহম্মকী রাখ। এখুনি সাহেবের কাছে গিয়ে তোর সম্মতি জানিয়ে আয়।

পরের দিন সাহেবের কাছে গিয়ে জানালাম, আমি রাজি।

সাহেব এবার আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই পারবে। আমি ফিরে গিয়েই তোমার বই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ মার্শেল আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

এক নম্বর: ব্যবসার নিয়মকানুন অনেক বিবেচনা করে তৈরী করবে। নিজের গড়া নিয়ম থেকে একচুলও সরে আসবে না।

দু' নম্বর: পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবে, চুকিয়েও দেবে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর।

তিন নম্বর: কোনো চিঠি পেলে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে তার জবাব দেবে। যদি কোনো চিঠির উত্তর দিতে বেশী সময় লাগবে বলে মনে কর, তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি চিঠি দেবে। ওতে লিখবে, যথা সত্বর উত্তর যাচ্ছে।

দয়ালজী বললেন, আমি আজও ঐ নিয়ম মেনে চলি।

আমি বললাম, মার্শেল সাহেবের এক নম্বর উপদেশটি যে আপনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন তার পরিচয় আমি বিলক্ষণ পেয়ে গেছি।

উনি হা হা করে হেসে উঠে বললেন, সেই বারো পার্সেণ্ট তো?

আমি বললাম, আমিও কম ব্যবসাদার নই দয়ালজী। ঐ বার পার্সেণ্টের সূত্র ধরে ঢুকে পড়ে আমি এখন আপনার বাংলা পাবলিকেশনের চীফ এডিটর হয়ে বসে আছি।

দয়ালজী হেসে বললেন, সাধে কি আপনাকে চীফ এডিটর করা হয়েছে সাহেব। যেদিন আপনি অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'র ভেতরে কিছু কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃতির ভুল ধরে নিয়ে এলেন সেদিনই আপনি আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার পেয়ে গেছেন।

বললাম, এই ভুল, যাঁরা কপি করেছিলেন, কম্পোজ করেছিলেন আর প্রুফ দেখেছিলেন তাঁদের দিক থেকে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শিল্পগুরু

অবনীন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতিগুলি প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি হয়তো নিখুঁত করে তাঁর শেষ প্রুফটি দেখতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় শিল্পের যে শতদলটি এই প্রবন্ধের মধ্যে ফুটে উঠেছে তার ভেতর সামান্যতম ত্রুটিও সজাগ পাঠককে পীড়া দেবে। শুধু সেই কথা ভেবে আমি সমস্ত বইটি নিখুঁত ভাবে পড়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আমাদের পাবলিকেশনে ঐ গ্রন্থটিকেই এখনও পর্যন্ত সব সেরা গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করতে পারি।

একটু থেমে আমি বললাম, আপনার মায়ের কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন অনেকগুলো বিষয় তার ভেতর ঢুকে পড়েছে। আপনি আপনার মায়ের কথা কিছু বলুন।

দয়ালজী গভীর হলেন। একসময় বললেন, আমি প্রতিদিন ঘর থেকে বেরুবার সময় মায়ের ফটোকে প্রণাম করে আসি। কোনো একটি কঠিন সমস্যায় পড়লে এখনও আমি মায়ের ছবির নীচে গিয়ে দাঁড়াই। সমস্যার কয়েকটা সমাধান তাঁর কাছে তুলে ধরি। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলে দেন, কোন সমাধানটি আমার পক্ষে শুভ। হয়তো তাঁর প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ আর নির্ভরতার জন্য আমার এ ধরনের উপলব্ধি হয়।

একটু থেমে বললেন, আমার ছোটবেলায় মা আমাকে বলতেন,—

'আঁধি আওয়ে
বৈঠ গমাওয়ে'

ঝড় উঠলে একটু বসে যেতে হয়। আজও আমি মায়ের বলা এই প্রবচনটিকে বেদবাক্যের মতো মান্য করি। দোকানে, সংসারে অনেক বিপর্যয়, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা এসেছে, কিন্তু আমি কখনো বিচলিত বা বুদ্ধিভ্রষ্ট হইনি।

বললাম, এ আপনার মায়ের আশীর্বাদ।

দয়ালজী বললেন, আমার মায়ের হৃদয় ছিল অনেক বড়। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। আমাদের ভাড়াবাড়ির নীচে ছিল স্নানের ঘর। আর ওপরে দুখানা ঘরে থাকতাম আমরা। মা একদিন স্নানের ঘরের একটা ভাঙা ফুটো দিয়ে দেখলেন, দরজার সামনে একটি ভিখিরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়িখানা এমনি জীর্ণ যে সেটাতে লজ্জা ঢাকার কোনো উপায় ছিল না। মেয়েটিও যুবতী। মা সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে টাঙানো দড়ি থেকে তাঁর একমাত্র শুকনো শাড়িটি টেনে নিয়ে দরজা একটুখানি ফাঁকা করে ছুঁড়ে দিলেন মেয়েটিকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, বৌমা আমাকে একখানা গামছা দিয়ে যাও।

প্রায় নিঃস্ব অবস্থাতেও মায়ের কত যে দান আছে তা বলে শেষ করতে পারব না। আমি জানি, তাঁর এই পুণ্য কর্মগুলি আজ আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দয়ালজীর জীবনে আর একদিনের ঘটনা। পণ্ডিত নেহেরু এসেছেন বিধান রায়ের বাড়িতে। ডাক্তার রায়ের বাড়ি থেকে ফোন এল, কতকগুলো বিশেষ বই

পণ্ডিত নেহেরুর চাই। ডাঃ রায়ের ওখানে যেন অবিলম্বে বইগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দয়ালজী প্রায় সব কটি বই-ই প্যাক করার ব্যবস্থা করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বিল বানিয়ে লোক মারফত পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে স্বয়ং ডাঃ রায়ের ফোন। দয়াল (বিধান রায় ছিলেন দয়ালজীর ডাক্তার শ্বশুর-মহাশয়ের বন্ধু) এ কি করেছো ?

দয়ালজী বললেন, কেন স্যার ?

পণ্ডিতজীকে কয়েকখানা বই দিয়েছো, তার সঙ্গে গুঁজে দিয়েছ বিল !

দয়ালজী বললেন, বিলটা আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনবো স্যার, কিন্তু আমি পণ্ডিতজীকে দেওয়া সবকটি বইয়ের ডুপ্লিকেট নিয়ে যাব। ওগুলোর ভেতরে ওঁর অটোগ্রাফ চাই।

ফোনের ওপ্যার থেকে হাসলেন ডাঃ রায়। বললেন, দারুণ বিজনেসম্যান হয়েছো তো তুমি। ঠিক আছে নিয়ে এসো।

দয়ালজী সেল্‌ফ্‌ থেকে একটি একটি করে বই নামিয়ে পণ্ডিত জওহরলালের অটোগ্রাফগুলি দেখালেন।

মাঝে মাঝে কলেজের মেয়েরা তাদের বাড়ি থেকে ফুল নিয়ে এসে আমাদের উপহার দিয়ে যায়। গন্ধরাজ, চাঁপা এবং গোলাপ। গোলাপগুচ্ছ পেলে আমি কখনও কাচের গ্লাসে জল ভরে প্রিন্সিপালের টেবিলে সাজিয়ে রেখে আসি, অথবা একটি একটি করে সহকর্মীদের বিলিয়ে দিই। ওঁরা যখন পান, তখন এমনি করে আমরাও তার ভাগ পাই।

একবার থার্ডইয়ার অনার্সের একটি মেয়ে ফোর্থইয়ার অনার্সের ক্লাসে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একগুচ্ছ রক্ত-করবী। আমি ঐ ক্লাসে 'রক্তকরবী'-ই পড়াচ্ছিলাম। মেয়েটি আমাকে ফুলগুলি উপহার দিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন পরে অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ মেয়েদের নিয়ে রক্তকরবী মঞ্চস্থ করলেন। অভিনয়ের দিন আমি সবিস্ময়ে দেখলাম, যে মেয়েটি আমাকে রক্তকরবী উপহার দিয়েছিল সেই মেয়েটি নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। চলনে-বলনে-উচ্চারণে কী সাবলীল দক্ষতা তার। নন্দিনীর সমস্ত গানগুলো সে নিজের গলায় গাইল। আমি সেদিন বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছিলাম একথা ভেবে যে এমন একটি প্রতিভাময়ী মেয়ে আমাদের কলেজে পড়তে এসেছে।

বিয়ের পর সংসারের চাপে এইসব অভিনয় প্রতিভার হয়তো অপমৃত্যু ঘটবে। কজনই বা শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্র দম্পতির মত প্রতিভার এমন স্ফুরণ ঘটাতে পেরেছেন।

ফুলের কথায় ফুলের মতো আর একটি মেয়ের মুখ মনে পড়ল। সে সবুজ অথবা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে আসত। রঙটি ভারি ফর্সা তার। মুখে চোখে এমন একটি শান্ত পবিত্রতা ছিল যা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। সে আমাকে একদিন একগুচ্ছ সাদা গোলাপ উপহার দেয়।

আমি বললাম, এগুলো তুমি পেলে কোথায় ?

মেয়েটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমাদের বাগানে ফুটেছিল।

আমি তার পরিচয় জানতে চাইলাম। সে আমাকে যা বলল, তাতে আমার মনের মধ্যে গভীর সম্ভ্রম বোধ জেগে উঠল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে সে আবদ্ধ।

ইংরাজীর অধ্যাপক সুভাষ সরকার আর অংশুপতি দাশগুপ্ত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনেই অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। আধুনিক কবিতা লেখায় হাত পাকিয়েছেন দুজনেই। কবিতার বইও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। অংশুপতি ইংরাজী গল্পের বাংলা নাট্যরূপ দিচ্ছেন আর সেগুলি অভিনীত হচ্ছে রেডিওতে! সুভাষ আবেগপ্রবণ, বন্ধুবৎসল। ইংরাজীতে কিছু লেখা লিখে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ইতিমধ্যে। নামকরা ফটোগ্রাফার সুভাষ। বহু প্রদর্শনীতে তাঁর তোলা ফটো প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

দুই বন্ধুই ভ্রাম্যমান। ছুটি পড়লেই উধাও। আমিও ঐ দলে। সস্ত্রীক আমরা ঘুরে বেড়াই আলাদা আলাদা। ছুটি ফুরোলে কলেজে ফিরে হৈ হৈ। কে কোথায় কি দেখল, কি অভিজ্ঞতা হলো, তারই আলোচনায় মশগুল।

তীর্থদর্শন সকলের হয় না। গভীর ইচ্ছা নিয়ে বেরিও মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়। পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক অরুণ মিত্র গিয়েছিলেন স্ত্রী ও শাশুড়ীকে নিয়ে বদরীনাথ। পাহাড়ী পথে এক জায়গায় বাস থামল। যাত্রীরা নেমে একটা চায়ের দোকানের দিকে ধাওয়া করল। কিছুক্ষণের বিরতি। অরুণরাও বেরিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ বিপর্যয়। ওপরের রাস্তায় সারানো হচ্ছিল একখানা মিলিটারী জীপ। কি করে তার একখানা চাকা লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে এল নিচে। ব্যস্, পড়বি তো পড়, একেবারে অরুণের শাশুড়ী মায়ের পায়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল পাখানা। তীর্থের পুণ্য পথেই মারা গেল। শেষে মিলিটারী জিপে উঠতে হলো। ঐ চাকাই গড়াতে গড়াতে সপরিবারে অরুণকে পেঁছে দিয়ে গেল হরিদ্বারে।

সুভাষ তাঁর ফটো তোলার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। একটা সেমিনারে গেছেন মণিপুর। পেপার পড়েছেন, জীবনানন্দের কবিতার ইংরাজী অনুবাদ শুনিয়ে ছাত্রসমাজ এবং বিদগ্ধজনের চিত্ত জয় করেছেন।

মণিপুরবাসীরাও তাঁদের ক্ল্যাসিকেল নাচ দেখিয়ে, খোল বাজিয়ে আর প্রচণ্ড লংকাবাটা সহযোগে অতি সুস্বাদু খানা খাইয়ে অভ্যাগতদের হৃদয় হরণ করেছেন।

সুভাষ নৃত্য, বাদ্য, সব কিছুরই ফটো তুলে চলেছেন দারুণ আনন্দ আর উত্তেজনার ভেতর।

হঠাৎ সুভাষের খেয়াল হলো, শহর ছাড়িয়ে একটুখানি পল্লী অঞ্চলে গিয়ে ফটো তুললে কেমন হয়। ইচ্ছা প্রকাশমাত্র একটি জীপ এসে গেল। জীপটি চালিয়ে নিয়ে চলল ইউনিভারসিটির একটি ছাত্র।

মাঝপথে পড়ল একটি ছোটখাট জঙ্গল। কাঠ কাটার শব্দ ভেসে আসছিল কিন্তু কাঠুরিয়াকে দেখা যাচ্ছিল না।

সুভাষের চোখে একটা ছবি এসে পড়ল। বনের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা নেমে গেছে, সেই পথ ধরে উঠে আসছে দুটি পল্লী তরুণী। মণিপুরীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পোশাক তাদের অঙ্গ ঘিরে। মাথায় দুটি পেতলের কলস। সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় মাজা কলস দুটি সোনার মতো ঝকঝক করছে। হয়তো কোনো ঝর্ণা থেকে জল ভরে আনছে ওরা।

সুভাষ রাস্তার ওপর জীপ থামিয়ে ছুটলেন বনের দিকে। এমন মোহন সাবজেক্ট কি হাতছাড়া করা যায়। কাছাকাছি গিয়েই এক হাঁটু মাটিতে ছুঁইয়ে একলব্যের লক্ষ্যভেদের মতো ক্যামেরা তাক্ করলেন সুভাষ।

শিকারীর সামনে এসে পড়া মৃগীর মতো মেয়ে দুটি প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর ভীতিবিহ্বল একটা আওয়াজ তুলে পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুভাষ মাতৃভাষায় তাদের অভয়দানের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই অবোধ গ্রাম্য তরুণী দুটি 'আ-মরি-বাংলাভাষা'র মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারল না। তারা স্ব-ভাষায় সম্ভবত কোনো পরিত্রাতাকে আহ্বান জানাতে লাগল।

বন থেকে ভেসে আসা কাঠ কাটার শব্দ ততক্ষণে থেমে গেছে।

হঠাৎ সুভাষ দেখলেন, পরশুরামের মতো কুঠার ঘাড়ে করে সুভাষের দিকে ছুটে আসছে কাঠুরিয়া। দূর থেকে তার মুখভঙ্গী দেখে সুভাষ বুঝলেন ঐ গোঁয়ারকে কিছু বোঝানো যাবে না। একটু অপেক্ষা করলেই পৈতৃক দেহখানা দু-ফাঁক হয়ে যাবে।

ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সুভাষও পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে জীপের দিকে ছুটলেন।

জীপ-চালক ইউনিভার্সিটির ছাত্রটি ততক্ষণে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝে ফেলেছে। সে লাফ মেরে নেমে পড়ল জীপ থেকে। ছুটল কুঠারধারী পরশুরামের দিকে। তারপর মাতৃভাষায় তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা চলল। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো শান্ত হয়ে গেলেন পরশুরাম। কুঠার ফেলে হাত জোড় করে এগিয়ে আসতে লাগল সুভাষের দিকে। সুভাষের কিন্তু ভয় যায়নি। জীপে উঠে বসাটাই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় ভেবে তিনি ঢুকে পড়লেন জীপের ভেতর।

ছাত্রটি সুভাষকে জীপ থেকে নেমে আসতে বলল।

সুভাষ নেমে এলে কাঠুরিয়া সম্ভবতঃ তার বেয়াদপির জন্য করজোড়ে মাফ চেয়ে নিল সুভাষের কাছে।

মেয়েরা তখন একটা গাছের আড়াল থেকে সমস্ত ঘটনাটা লক্ষ্য করছিল। ছাত্রটি এগিয়ে গিয়ে তাদের কিছু বোঝাল। তারপর ডাক দিল সে সুভাষকে। তখন সমস্ত পরিবেশটাই অভয়ারণ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নির্ভয়ে সুভাষ প্রাণভরে হাস্যমুখী তরুণীদের নানা অ্যাংগল থেকে ছবি তুললেন।

আমাদের আড্ডার আসর বেশ জমে উঠেছে। দু'তিন রাউণ্ড চাও শেষ। আমার কোথায় যেন যাবার কথা, আড্ডা ভেঙে পালাবার জন্য উসখুস করতে লাগলাম। বন্ধু সুভাষ আমার হাতটি ধরে অমনি বললেন, ওঠা চলবে না কিন্তু, এবার গল্প বলার পালা আপনার আর আমার পালা গরম গরম সিঙাড়া খাওয়ানোর।

অমনি বেয়ারার ডাক পড়ল। আমি শুরু করলাম আমার ভ্রাম্যমান জীবনের দু'একটি অভিজ্ঞতার গল্প।

কত চরিত্র, কত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় ভ্রাম্যমানকে। কুলু উপত্যকায় একটি তরুণীকে দেখেছিলাম। খশ জাতির রক্ত তার দেহে প্রবাহিত। নাগর-কোটিয় ব্রাহ্মণ। সৌন্দর্য বর্ণনাহীন। নাগ্‌গরে উঠেছি নিকোলাস রোয়েরিখের আর্টগ্যালারি দেখব বলে। গ্যালারি খোলা ছিল, কিন্তু সে সময়ে কোনো দর্শক ছিল না।

গ্যালারির দরজা দিয়ে ঢোকার সময় ঐ মেয়েটিকে দেখলাম। মেয়েটি আমাকে সবকটি ঘর ঘুরিয়ে ছবি দেখাতে লাগল।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখানেই থাকেন?

মেয়েটি বলল, এখানে তার একটা ছোট্ট কোয়ার্টার আছে, কিন্তু তার বাড়ি কুলুর ঢোল ময়দানের কাছাকাছি। অনেক কথার পর জানতে পারলাম, মেয়েটি আর্টিস্ট। সে এই আর্টগ্যালারির কেয়ারটেকার।

আমি ওকে প্রশ্ন করলাম, নিকোলাস রোয়েরিখের ছবিতে এত নীল রঙ কেন?

তরুণী কথা না বলে আমাকে কিন্তু ভারী সুন্দর একটি উত্তর দিল। সে শুধু জানালার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। একটি আশ্চর্য রূপলোক আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। নাগ্‌গর পাহাড়ের নীচে শস্যেভরা কুলু উপত্যকা। দূরে দূরে নীলাভ পাহাড়ের শ্রেণী। হাল্‌কা নীল নাইলনের উত্তরীয়ের মতো কুয়াশা জড়িয়ে আছে ঐ পাহাড়গুলোর গায়ে। মাঝখান দিয়ে উপবীতের মতো বয়ে চলেছে বিপাশার নীল ধারা। বুঝলাম, এই নীলের অঞ্জন লেগেছিল শিল্পী নিকোলাসের চোখে। তাই তাঁর সৃষ্টিতে নীলের এতখানি ব্যবহার।

এবার মেয়েটি কথা বলল, আসুন আমার সঙ্গে। ওকে অনুসরণ করে গ্যালারির বাইরে এলাম। পাহাড়ের গায়ে পাইন আর ফারের ঘন সন্নিবেশ। আমরা এসে দাঁড়ালাম দুটো ফার গাছের মাঝে। সেখানে একটা পাথর কেটে আসন তৈরী করা হয়েছে। এই আসনে শিল্পী নিকোলাস বসে দূরের একটি তুষারশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মাথার ওপরে আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। নীচে দুটি প্রায় সম-উচ্চতার নীলাভ পাহাড়। তাদের মাঝখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই শুভ্র তুষার-শৃঙ্গ।

সেদিন শিল্পী নিকোলাস সম্বন্ধে তরুণীটি অনেক কথা বলেছিল। পরে

আমি কলকাতা ফিরে এসে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বিশ্ববন্দিত শিল্পী নিকোলাসের সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছি। বিশ্বমানবতা বোধ ছিল নিকোলাসের মধ্যে। এই রাশিয়ান শিল্পীটির শিল্প-সম্ভার প্রায় প্রতিটি দেশের আর্ট-গ্যালারির একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে শোভা পাচ্ছে। বিশ্বমানবতাবোধে উদ্দীপ্ত কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর মানসিক সংযোগ ছিল শিল্পী নিকোলাসের। কেবল মানসিক সংযোগ নয়, পত্রালাপও চলতো উভয়ের মধ্যে। ভারতকে দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে ভাবতেন নিকোলাস রোয়েরিখ। কুলুর সীমাহীন সৌন্দর্যলোকের দিকে তাকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন শিল্পী রোয়েরিখ। তাঁর পুত্র শিল্পী মাইকেল রোয়েরিখ ভারতের সঙ্গে আরও নিবিড় করে নিলেন তাঁর বন্ধন। এককালের ভারতবিখ্যাত নায়িকা দেবীকারানীর সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ভারত ও রাশিয়ার মিলন-বন্ধন যেন এর মাধ্যমে দৃঢ়তর হলো।

নাগ্গরের আর্টগ্যালারি নিয়েই কথা শুরু হয়েছিল। একসময় আমরা ছবি দেখতে দেখতে শেষ ঘরটিতে ঢুকে পড়লাম। একখানা ছবিতে আমার চোখ আটকে গেল। এ ছবিখানায় গৈরিকরঙের ব্যবহার করেছেন শিল্পী।

দেখলাম, একখানা মসৃণ শিলা। তার তলায় লুটিয়ে পড়ে আছে কয়েকটি নুড়ি পাথর। সমস্ত প্রস্তরখণ্ডগুলিতে গেরুয়ার ছোঁওয়া লেগেছে। পাশে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। প্রপাতের মতো নেমে চলেছে তার শুভ্র বারিধারা।

আমি দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। প্রশ্ন করলাম, রঙে এবং চিন্তায় শিল্পীর এ ব্যতিক্রম কেন?

তরুণী শিল্পীটি বলল, এত নীলের মাঝখানে হঠাৎ গৈরিক রঙটি এসে চোখে নতুন একটা ছোঁওয়া লাগিয়ে দিল। এই ভাবনাটাই হয়ত তখন শিল্পীর মাথায় এসেছিল।

আমার মাথায় তখন কিন্তু অন্য ভাবনা চেপেছে। আমি জানতাম, শিল্পী রোয়েরিখ মধ্য এশিয়ায় খননকার্য চালিয়েছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু ভগ্ন বুদ্ধ-মূর্তি এবং বৌদ্ধ-নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন।

আমি মেয়েটিকে বললাম, এই শিলাখণ্ডটিকে শিল্পী বুদ্ধরূপে কল্পনা করেছিলেন। আর এই নুড়িগুলি বুদ্ধের পঞ্চশিষ্য। গুরুর চরণে প্রণিপাতের ভঙ্গীতে লুটিয়ে আছে। পাশে করুণার প্রস্রবণ বয়ে চলেছে।

তরুণীটি উল্লসিত হয়ে বলল, অতি সুন্দর ব্যাখ্যা। এরপর আমি এটা সবাইকে জানাতে পারব। আমার নিজেরও এই ছবিটি সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন ছিল।

কুলুর এই কন্যাটিকে নিয়েই আমি 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসটি রচনা করি। পরের সংস্করণে বইটির নাম হয়, 'নির্জন নির্ঝর'।

এই কুলুতেই আমার আর একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমরা আমাদের শিশুকন্যাটিকে নিয়ে সেবার উঠেছিলাম সৌন্দর্যের লীলাভূমি মানালীতে। আমরা গভর্ণমেণ্টের যে রেস্টহাউসে ছিলাম সেটা মানালীর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে

বেশ খানিকটা ওপরে। ফিরব চণ্ডীগড় হয়ে। তখন চণ্ডীগড়ের বাস ছাড়তো ভোর পাঁচটায়। আকাশে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করত। এত ভোরে মালপত্র নিয়ে এত নীচে নেমে আসা কি করে সম্ভব হবে তাই ভেবে বেশ খানিকটা বিচলিত হলাম। আগের দিন সন্ধ্যায় কুলির খোঁজ করলাম মানালী বাসস্ট্যাণ্ডে। স্বল্পসংখ্যক কুলি আগেভাগেই এনগেজ হয়ে গিয়েছিল। আমি দৌড়ঝাঁপ করে একটি আধা-কুলি যোগাড় করলাম। কুলির লিস্টে তার নাম নেই, সে থাকে নীচের ভ্যালিতে।

আমি বললাম, তুমি কি চারটের সময় ঐ গভর্ণমেণ্ট বাংলোতে আসতে পারবে?

দরিদ্র মানুষটি বলল, ঠিক সময়ে ওখানে পেঁছে যাব সাহেব।

তখন উপায়হীন আমি। ওর ওপরেই ভরসা করে থাকতে হলো।

মাঝরাত থেকেই শুরু হলো পাহাড়ী ঝড়বৃষ্টি। দমকে দমকে হিমেল হাওয়া শরীরের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সঙ্গে এলোমেলো বৃষ্টি আর বিদ্যুতের চমক। একবার মেঘ ডেকে উঠলেই পাহাড়ে পাহাড়ে কতক্ষণ ধরে তার প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে বাজছিল।

আমি শঙ্কিত-ভীত এবং দুশ্চিন্তায় জর্জরিত। সেই লোকটির আসার আশা ততক্ষণে আমি ছেড়ে দিয়েছি। অনেকগুলো টাকার টিকিট যে জলে পড়বে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

আমাকে স্তম্ভিত বিস্মিত করে দিয়ে ঠিক চারটেতে দরজায় করাঘাত।

তখন ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা মন্দীভূত হলেও একেবারে থামেনি। আমার মালপত্র দেখে লোকটি বলল, সাহেব একবারে যাওয়া যাবে না। আমি দৌড়ে আপনার বেডিং আর স্যুটকেস বাসের মাথায় তুলে দিয়ে আসি। তারপর বাকী জিনিসপত্রের সঙ্গে খুকুকে কাঁধে নিয়ে নেমে যাব।

ওর কথা মতোই কাজ হলো। ও প্রথমবার আমার বেডিং নিয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আর ঝড়ের ভেতর দিয়ে নেমে গেল নিচে। ফিরে আসার পরে একটা সমস্যা দেখা দিল। বৃষ্টি যত অল্পই হোক, ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওকে সমস্যার কথাটা জানাতেই ও বলল, আপনারা খুকীকে ভাল করে জড়িয়ে আমার কাঁধে তুলে দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তর আমার কাঁধে পিঠে ঝুলিয়ে দিন। আপনারা আমার কম্বলটা মাথায় চাপা দিয়ে চলে আসুন বাসস্ট্যাণ্ডে।

বললাম, তুমি আমাদের কম্বলটা দিয়ে দিলে এই ঠাণ্ডায় ভিজে জমে যাবে যে।

ও বলল, কিচ্ছু হবে না সাহেব, আপনারা চলে যান।

আমরা আর কোনো কথা না বলে ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হলাম। খুকীকে নিয়ে লোকটাও এসে পেঁছিল। বাস ছাড়তে বেশী দেরী ছিল না। আমি জিনিসপত্তরগুলো গুনে নিতে লাগলাম।

ফ্লাস্ক কই!

লোকটি শোনামাত্রই অন্ধকারে আবার কোথায় দৌড়াল।

আমার মনে হলো, ও একবার একটা পাথরের ঢিবির ওপর হাতের জিনিস-গুলো নামিয়ে ঠিকমতো ধরার জন্য গুছিয়ে নিচ্ছিল। হয়তো ওখানেই ও ভুলে ফ্লাস্কটা ফেলে এসেছে।

ও তো চলে গেল। কিন্তু এদিকে যে ঘন ঘন হর্ন বাজতে শুরু করেছে। বাস ছাড়লো বলে। লোকটি তার পারিশ্রমিকও নেয়নি। সে জেনে গেছে, ঐ ফ্লাস্কে খুকুর জন্যে গরম দুধ আছে।

একটু পরেই বাস কিন্তু নিয়মমাফিক ছেড়ে দিল। আমাদের অনুরোধে সামান্য সময় অপেক্ষা করেছিল। আমি গরীব মানুষটির জন্যে যথেষ্ট দুঃখ পাচ্ছিলাম। ফ্লাস্কটা আমার কাছে দরকারী ঠিক কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন ওর পারিশ্রমিকটা।

ধীরে ধীরে গাড়িটা বাঁক নিচ্ছিল। 'সাহেব' 'সাহেব' বলে দৌড়তে দৌড়তে লোকটি ডাক দিল। শেষে সে জানলা দিয়ে কোনোরকমে আমার ফ্লাস্কটা অন্য একজনের হাতে ধরিয়ে দিলে। তখন স্পীড নিয়েছে বাস। জানালা দিয়ে দেখলাম অস্পষ্ট অন্ধকারে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। আমি কয়েকখানা নোট পাকিয়ে ভেজা রাস্তার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম।

মনে হলো সে এগিয়ে আসছে। বাস তখন স্পীডে আর একটা বাঁক নিয়েছে। আমি বুঝতে পারিনি সেই বৃষ্টি আর অন্ধকারে গরীব মানুষটি তার টাকা পেয়েছিল কিনা। সে টাকা পেয়ে থাকলেও তার কাছে আমার যে ঋণ রয়ে গেল তা অপরিশোধ্য। সেই সরল সুন্দর হৃদয়বান পাহাড়ীটির কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

অংশুপতি বললেন, এখনও এরকম মানুষ আছে বলে পৃথিবীটা এত সুন্দর।

আজ আষাঢ় শেষের দিনটি বড় বিষণ্নতায় ভরে উঠেছে। এলোমেলো দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে গাছগাছালির পাতাপত্র কেমন যেন ছন্নছাড়া। ভোরবেলার ট্রেনে চেপেছি। ঘণ্টা দুয়েক ট্রেন জার্নির পরেই বাসযাত্রা। সেও প্রায় দুঘণ্টা। তারপর গাঁয়ের মাটি ছুঁয়ে দাঁড়ানো।

হু হু হাওয়ার দাপটে কাচের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে যাত্রীরা। আমিও সিটের লাগাও জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছি। তবে চোখ দুটো পেতে রেখেছি জানালার ওপারে। প্রান্তরে কাজ চলেছে চাষের। তাল তাল মেঘ ক্রমাগত ভেঙে গড়িয়ে চেহারা বদল করছে।

আমার বুকের মধ্যে ঐ হাওয়ার হু-হু। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার মেঘ গুমরে গুমরে উঠছে আমার মনের গভীরে।

এ যাত্রায় গ্রামে ফেরার আনন্দ নেই। একটা শোকের সাগর সাঁতরে চলেছি কূলে ওঠার চেষ্টায়।

আমরা অভিন্নহৃদয় তিন বন্ধু। আমি যখন কলেজে পড়াচ্ছি, চন্দ্রমৌলী রয়েছে মেডিক্যাল কলেজে। আনন্দগোপাল প্রতিশ্রুতিবান এক ইঞ্জিনিয়ার।

প্রায় রোজ আমরা তিন বন্ধুতে চলে যাই কফি হাউস অথবা গঙ্গার ঘাটে। সংখ্যাহীন বিষয় নিয়ে অন্তহীন আলোচনায় মেতে উঠি আমরা।

সেদিন এমনি এক আলোচনায় মগ্ন হয়েছিলাম। সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছিল গঙ্গার বুকে। অনেক মৃত্যু দেখেছে চন্দ্রমৌলী। তাই মশলামুড়ি চিবুতে চিবুতে সে বলছিল, মর্গে ছড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলোর দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না, একদিন ওরা হেসে কথা বলেছিল, রেগে উঠেছিল কারু ওপরে অথবা প্রেম নিবেদন করেছিল কাউকে।

আমি বললাম, একটা আশ্চর্য বায়ু খেলা করে আমাদের ভেতর, তাকে আমরা নাম দিয়েছি প্রাণবায়ু। সে যতক্ষণ খেলছে ততক্ষণ আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় সচল, সে দেহের খাঁচাটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র সব লীলার শেষ। তাকে কোনো কিছুতে ভুলিয়ে ধরে রাখা যায় না, সাধ্য সাধনাতেও নয়।

আনন্দগোপাল বলল, বিজ্ঞান যেভাবে এগোচ্ছে তাতে মনে হয় এমন একটা সুরক্ষা-চক্র ওরা তৈরি করে ফেলবে যাতে এই খাঁচাটা ছেড়ে প্রাণবায়ু আর পালাতে পারবে না।

চন্দ্রমৌলী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, নিশ্চিত থেকো বন্ধু, সেই শুভদিনটি দেখার জন্য অন্তত আমাদের ভেতর কেউ এ মর্ত্যধামে টিকে থাকবে না।

আমি বললাম, সেই ভয়ংকর শুভদিনটি যেন কখনো না আসে। মানুষ অমর নয় বলেই তার ক্ষণস্থায়ী জীবনে পৃথিবীটা এত সুন্দর। মৃত্যু আছে বলেই এই ছোট্ট জীবনটার ওপরে এত ভালবাসা।

আনন্দ অমনি বলে উঠল, বেশ, বেশ, তাহলে তুই মৃত্যুর মহিমার ওপরে একটা কবিতা লিখে কাল শোনাবি।

চন্দ্রমৌলী বলল, কাল নয় পরশু। কাল ব্যস্ত থাকব, পরশু রঞ্জন আসার পথে তোকে ডেকে নিয়ে আমার কোয়ার্টারে চলে আসবে। সেখান থেকে তিন-জনে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' না হওয়া পর্যন্ত হেঁটে যাব।

ওর মুখে 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' কথাটা শুনেই আমরা হা হা করে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে বললাম, আমাদের তিনজনের ভেতর আমারই সবার আগে গঙ্গাপ্রাপ্তি যোগ আছে।

আনন্দ হেঁকে বলল, কেন? কেন? তুই কেন এই মহা সৌভাগ্যের অধিকারী আগে হবি?

কারণ আমি মৃত্যুর পক্ষে ওকালতি করে কবিতা লিখছি।

চন্দ্রমৌলী বলল, আরে আমার নাম-মাহাত্ম্যের কথাটা ভেবে দেখেছিস? আমি হলাম চন্দ্রমৌলী, শিব। আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি আগে না হয়ে কি তোদের হবে!

আনন্দ অমনি বলে উঠল, ও কথাটি বলিস না ভাই। মৃত্যুশয্যাতে শেষ যন্ত্রণার ভেতর তোর মতো ডাক্তার বন্ধুরই তো সবচেয়ে বেশী দরকার। তুই

আগেভাগে মরে গেলে আমাদের যন্ত্রণা কমাবে কে ?

নির্দিষ্ট দিনে আনন্দের আস্তানার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বৌবাজারের মোড় পার হবার আগেই দেখা হয়ে গেল দিবাকর গুপ্তের সঙ্গে। চন্দ্রমৌলীর ক্লাসফ্রেন্ড, একই সঙ্গে কাজ করে, তাই আমাদেরও বিশেষ পরিচিত।

দিবাকর বলল, আমি তোমার কাছেই একটা জরুরী প্রয়োজনে যাচ্ছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

কি ব্যাপার ? কোথায় ?

চন্দ্রমৌলীর ওখানে।

বললাম, আনন্দকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যেতে হবে যে।

সে সব পরে হবে, তুমি আমার সঙ্গে চল।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

দ্রুতপায়ে হেঁটে দিবাকরের সঙ্গে ঢুকলাম মেডিক্যাল কলেজে। ও আমাকে টেনে নিয়ে গেল একেবারে মর্গের সামনে। চন্দ্রমৌলী দাঁড়িয়ে আছে, উদ্ভ্রান্ত বিধ্বস্ত।

তাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, কি হয়েছে চন্দ্রমৌলী !

ও কোনো কথা বলতে পারল না, মর্গের দিকে আঙুলটা তুলে দেখাল।

একখানা কাপড় চাপা দেওয়া ছিল আনন্দের গায়ে। ধবধবে মুখখানায় রক্তপদ্মের ছোঁয়া লেগে আছে। বিকারহীন স্বর্গীয় মুখে এক টুকরো হাসির আভা। আমি আর চন্দ্রমৌলী ততক্ষণে দুজনকে দুজন জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়েছি।

দিবাকর আহত গলায় বলে উঠল, এ বয়সে সাধারণত যা হয় না তাই ঘটে গেল। শেষ রাতে ম্যাসিভ্ অ্যাটাক। তোমার মৃত্যুর ওপর লেখা কবিতাটা শোনবার আগেই আনন্দ পাড়ি দিল অমৃতধামে।

চন্দ্রমৌলী ডুকরে কেঁদে উঠল, নিষ্ঠুর আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে চলে গেলি !

ট্রেন ছুটে চলেছে। মনের ওপর ছায়া ফেলে যাচ্ছে স্মৃতির ছবিগুলো। কত ঘটনা কত কথা।

চন্দ্রমৌলী আর আমার বিয়েটা ভালোবাসার। আনন্দ মাস কয়েক হলো আমাদের বাংলার মাস্টারমশায় প্রফুল্লবাবুর মেয়েকে বিয়ে করেছিল। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশায়ের মা-মরা ছেলে আনন্দ। একই স্কুলের দুজন মাস্টারমশায়ের ইচ্ছাতেই এ বিয়ে। কিন্তু বেচারা আনন্দ বিয়ের পরেই পড়ে গিয়েছিল পরীক্ষার কবলে। তাই যাঁদের ইচ্ছাপূরণের জন্য আনন্দকে ছাঁদনাতলায় যেতে হয়েছিল অসময়ে তাঁরা বিয়েটি চুকে যাওয়ার কদিন পরেই দম্পতিকে তফাৎ করে দিলেন। বিয়ের দামী একটা স্যুটকেস আর অনামিকায়

একখানা আংটি ধারণ করে বিনাবাক্যে আনন্দকে চলে আসতে হয়েছিল কলকাতায়।

কফি হাউসে বসে আমরা এই তো কমাস আগে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম।

আনন্দ সক্ষোভে বলেছিল, লোহালক্কড়ের কারবারী বলে কি লোহার বাসর ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমাকে। বসন্তের ফুল ছোঁয়ার,পাখির গান শোনার অধিকার বুঝি নেই আমার!

চন্দ্রমৌলী বলল, তোরা তো জানিস, পরীক্ষার সময় আমার বউ ছিল পাশে। সারারাত বই আর বউ নিয়ে জেগেছি। ঐ প্রেরণাতেই উৎরে গেছি।

বললাম, আদি কবি বাল্মীকি এতবড় একখানা মহাকাব্য লিখে ফেললেন, কেবল ক্রৌঞ্চির কান্নাটুকুকে সম্বল করে। তাই সারা রামায়ণখানা ভেসে গেল শোকসাগরে। ব্যাধকে অভিসম্পাত পেতে হলো। এসব ভয়ভাবনা কি অভিভাবকদের আছে? না তাঁরা ভাল করে রামায়ণখানা পড়ে দেখেছেন?

চন্দ্রমৌলী বলল, আনন্দের নামটা আজ তার দিকে তাকিয়ে পরিহাসের হাসি হাসছে। এই বিষাদময় পরিস্থিতিতে আমরা তিন বন্ধুই শোকাভিভূত।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য এই প্রস্তাবের সঙ্গে কিছু সমবেদনার বাণী যুক্ত করে দিবি না?

অমনি চন্দ্রমৌলী বলে উঠল, সেই প্রোষিতভর্তৃকা গ্রাম্য বালিকাটির হৃদয় থেকে আজ আনন্দ অপহৃত। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। প্রেমের দেবতার কাছে এই প্রার্থনা, তিনি যেন সরলা বালিকাটির হৃদয়ে ঘন ঘন শর নিক্ষেপ না করেন।

আমি বললাম, প্রস্তাবে একটি শব্দের পরিবর্তন করতে হবে। যে দুটি জায়গায় রয়েছে 'বালিকা', সেখানে বসাতে হবে 'তরুণী'।

এবার মুখ খুলল আনন্দ, তোরা কিরে! আমি মরছি বউয়ের বিরহে আর তোরা ফাজলামো শুরু করে দিলি!

পাশ দিয়ে বেয়ারা যাচ্ছিল। আনন্দ হাঁকল, তিনটে কফি।

চন্দ্রমৌলী অমনি বলল, হট নয় কোল্ড কফি।

কেনরে?

গরমে উত্তেজনা বাড়বে তাই ঠাণ্ডা কফি খাওয়াই ভাল।

আমি প্রসঙ্গ পালটে বললাম, কিরে বউয়ের চিঠি আসেনি?

আনন্দ দ্রুত মাথা নেড়ে জানাল, সে বউয়ের চিঠি পায়নি। মুখে বলল, তবে একটা চিরকুট এসেছে, শ্যালিকার।

পকেট থেকে বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাল এসেছে।

চন্দ্রমৌলী বলল, এতক্ষণ চেপে রেখেছিস। কিরে তুই, মাইরি! তোর বউয়ের নাম মধুশ্রী হলে কি হবে, আসল মধু পাবি তোর শ্যালিকা পুষ্পশ্রীর চিঠিতে।

আনন্দ বলল, নিংড়ে দেখ কতটা মধু পাস।

এবার আমাদের চারটে চোখ চিঠির অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ঠিকই বলেছে আনন্দ, চিঠি নয় চিরকুট এসেছে।

শ্রীচরণেষু,

এবার ডাল ভরে জাম ফলেছিল। বাদুড় যত খেয়েছে, আমি সাঁটিয়েছি তার চেয়ে বেশী। দিদি একটিও খায়নি তোমার কথা ভেবে। আমি নিজের আর তোমাদের দুভাগ একাই খেয়েছি। মা খুব দুঃখ করছিল, এবার আর সে তিনটে ছেলে জাম কুড়োতে এল না।

আমি মাকে বললাম, তুমি তো বেশ, জামাই কখনো জাম কুড়োতে আসে? যখন জামাই ছিল না তখন জাম কুড়িয়েছে। শুধু কুড়োয়নি, চুরি করতে এসে মারও খেয়েছে।

মা অমনি বলল, তুই থাম তো, মেলাই বকবক করিসনি।

জাম খাবার ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। প্রফুল্লবাবুর শান বাঁধানো ঘাটের ধারে আদ্যিকালের বিশাল এক জামগাছ। বিচি ছোট, শাঁস বেশি। যে একবার খেয়েছে সে মজেছে। সোজা পথে পাওয়ার উপায় নেই তাই গতি নেই চুরি করা ছাড়া।

অবশ্য আমরা তিন বন্ধুতে ইতিমধ্যে হাত পাকিয়েছি চুরি বিদ্যায়। ইস্কুলের সামনে বিশাল পুকুর। তার দক্ষিণে সারি সারি নারকেল গাছ। ঐ দক্ষিণ প্রান্তেই বোর্ডিং। আমরা তিনজনে মাঝরাতে জানালার রড খুলে বেরিয়ে পড়লাম। আমার হাতে কাছি দড়ি, আনন্দের কোমরে গোঁজা ছোট্ট একখানা হাঁসুয়া।

নির্দিষ্ট নারকেল গাছটার কাছে এসে আমরা একবার তাকিয়ে নিলাম চারিদিকে। না, কাছেপিঠে কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হয় না।

চন্দ্রমৌলী আমার হাত থেকে দড়িখানা নিয়ে একপ্রান্ত বেঁধে দিল আনন্দের কোমরে। বাকি বাণ্ডিলটা ধরে রইল নিজে। আনন্দ অন্ধকারে মিশমিশে কালো একটা ভূতের মতো সড় সড় করে উঠে গেল গাছ বেয়ে। কাঁদি কেটে দড়িতে বেঁধে নামালেই আমি ধরে নেব। অবশ্য পুরো কাঁদিটা ধরা খুব সহজ কাজ নয়। কারণ নারকেল গাছগুলো মাথা নুইয়ে রেখেছে পুকুরের দিকে। কাঁদি কাটা আর বাঁধা হয়ে গেলে দড়িতে সংকেত এল চন্দ্রমৌলীর কাছে। সে ধীরে ধীরে দড়ি ছাড়ছে আর ওপর থেকে পুরো কাঁদিটা নেমে আসছে। আমি অন্ধকারে পুকুরের একেবারে কিনারে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দরকার হলে পুকুরে নেমেই কাঁদিটা ধরব। এমন সময় দেখলাম দুটো কালো ছায়া পাশাপাশি নামছে। ইতিমধ্যে কাজ গুছিয়ে নেমে আসছে আনন্দ। আমি দুটো কালো ছায়াকে তালগোল পাকিয়ে ফেললাম। পেছন থেকে চন্দ্রমৌলী 'ধর' বলতেই আমি হাতের কাছে নেমে আসা কালো ছায়াটাকে ধরে ফেললাম। আরে এটা কে। আনন্দ চাপা গলায় বলে উঠল, আমাকে ধরছিস কেন। ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে হাতের দড়ি ছেড়ে দিয়েছে চন্দ্রমৌলী। আমি ভুল বোঝার সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেছি জলে। কিন্তু তার আগেই পুকুর

কাঁপিয়ে আছড়ে পড়েছে কাঁদি।

অনেকেই জেগে উঠে হৈ-হল্লা শুরু করে দিল। আনন্দ আর চন্দ্রমৌলী বিদ্যুৎচমকের মতো বোর্ডিংয়ের ভাঙা জানালা দিয়ে গলে পড়ল রুমের ভেতর। আমার ওঠার উপায় ছিল না। সবাই ছুটে আসছে শব্দ লক্ষ্য করে। অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য জলে ডুব দিলাম। শেষরক্ষা কিন্তু হলো না। এক গণ্ডা টর্চের আলো তখন সার্চলাইটের মতো এসে পড়েছে পুকুরের জলে। কতক্ষণ দম বন্ধ রেখে ডুব সাঁতার দেওয়া যায়। অতএব ধরা পড়ে গিয়ে একসময় নির্বোধ চোরকে ডাঙায় উঠতে হলো।

হেডমাস্টারমশায় বললেন, আমার বেত নিয়ে আয়।

পণ্ডিতমশায় ফোড়ন কাটলেন, একা নয়, শাগরেদ আছে। ডাবের কাঁদি একা নামাতে সাহস পাবে না।

অতএব আমি যে রুমে থাকি সে রুমে তল্লাশী চলল। ঘুমের ভান করে টান টান হয়ে নিজের নিজের বেডে পড়ে আছে আনন্দ আর চন্দ্রমৌলী। এত কলরবেও ঘুম ভাঙে না। সারা বোর্ডিং জেগে গেছে আর এ দুটি প্রাণীই কেবল টের পায়নি! ঘোরতর সন্দেহের ব্যাপার।

পণ্ডিতমশায় ফোড়ন কাটলেন, কপট নিদ্রা সহজে ভাঙে না।

এরই ভেতর অঙ্কের মাস্টারমশায় পাক্কা ডিটেকটিভের মতো টর্চ নিয়ে চন্দ্রমৌলী আর আনন্দের পায়ের তলা পরীক্ষা করলেন। একরাশ ধুলো জমে আছে। পায়ের কাছে বিছানার চাদরে ধুলোমাটির ছাপ। টর্চের আলোয় খাটের তলায় দেখা গেল একটা হাঁসুয়া জিভ বের করে আছে।

হাতের পাতায় এক ঘা বেত পড়লেও আমি ওদের নাম বলিনি। কিন্তু হাঁসুয়া অবিষ্কারের পর হিড় হিড় করে টেনে ওদের মেঝেতে দাঁড় করানো হলো। হাঁসুয়া শুঁকতেই কাঁদি কাটার কাঁচা গন্ধ বেরিয়ে এল।

হেডমাস্টারমশায় সক্রোধে বেত তুলতেই ওরা দোষ স্বীকার করল। তিন ঘা করে বেত পড়ল তিনজনের হাতে। পরের দিন দুবেলাই বোর্ডিংয়ের মিল বন্ধ রইল তিনজনের। হেডমাস্টারমশায় শরীর খারাপের অজুহাতে নিজেও খেলেন না।

সেই থেকে চোর অপবাদ আর দাগী আসামীর সম্মানে ভূষিত করা হলো আমাদের।

কিন্তু পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় স্থান রইল আমাদের। হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদক আমরাই। লেখার সিংহভাগও আমাদের। অভিনয়ে আর সরস্বতী পুজার মণ্ড তৈরিতে কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রাইজ লুটে নিচ্ছি আমরা।

অনেক মাস্টারমশায় আমাদের চুরির ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকদিন জলঘোলা করেছিলেন। কিন্তু বাংলার মাস্টামশায় প্রফুল্লবাবু নাকি বলেছিলেন, গাছে ডাব নারকেল থাকলেই ছেলেরা দু'চারটে পেড়ে খাবে, এটা চুরি না বলে উঠতি বয়সীদের উদ্যম বলাই ভাল। ওরা ক্ষিদের জ্বালায় চুরি করেনি, একটা অ্যাডভেঞ্চারে মেতেই রাতে গাছ থেকে ডাব তুলেছে। (আমার

'মন্থন' উপন্যাসে এ কথা লেখা হয়েছে।)

অদ্ভুত মানুষ এই প্রফুল্লবাবু। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্ব আর চেহারা। স্বল্পবাক্, কিন্তু যখন কোনো প্রসঙ্গে কথা শুরু করেন তখন বেশ কিছু সময়ের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন শ্রোতাদের। আমার মতো তাঁর অনেক ছাত্রই স্বীকার করেন, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যত গুরুর সান্নিধ্যে তাঁরা এসেছেন, এমন অসাধারণ কথাশিল্পী দ্বিতীয় আর কাউকে তাঁরা দেখেননি। এমন রুচিবান শৌখিন মানুষও দুর্লভ। চৌবাচ্চার জলে স্নান করেন, তাতে গোলাপ জল মিশিয়ে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা এলেও ঐ একই ব্যবস্থা। ফ্রান্স থেকে সেন্টের আরক এনে তিনি মনোহারী শিশিতে সেন্ট ভরে বন্ধুবান্ধবদের ভেতর বিতরণ করতেন। নিজের হাতে তৈরি করতেন সাবান। একসময় সেই সাবানের তাল দিয়ে তৈরি করলেন ছোট্ট অবিকল এক তাজমহল। ডিস্ট্রিক্ট এগজিবিশানে সেই তাজমহল পেল প্রথম পুরস্কারের সম্মান। সোনার একটি মেডেল।

বিরাট এলাকা জুড়ে প্রফুল্লবাবুর বাড়ি। বিশাল বিশাল গাছের শ্যামল ছায়ায় স্থানটি শান্তিনিকেতনের রূপ নিয়েছে। তারই ভেতর পুকুরপাড়ে জামগাছটি। অতি লোভনীয় জাম। রাশি রাশি ফলে সেই গাছে। তলায় যে সব জাম পড়ে যায়, গাঁয়ের ছেলেমেয়ে কিংবা স্কুলের ছেলেদের তা কুড়িয়ে খেতে মানা নেই। তবে গাছে উঠে ফলপাড়া বারণ। এক্ষেত্রে গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীর অনুমতি চাই।

তখন ক্লাশ টেনে উঠেছি। গ্রীষ্মকাল। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। শুরু হয়ে গেছে মর্নিংক্লাশ। দুপুরের গরমে বোর্ডিংয়ে বসে পড়াশোনায় মন বসানো দায়।

আনন্দ বলল, চল ঘুরে আসি।

বললাম, ঠা-ঠা রোদে কোথায় ঘুরবি?

চন্দ্রমৌলী ফোড়ন কাটল, ও রস শুকোতে যাবে।

আনন্দ বলল, রস শুকোতে নয় রে, রসের সন্ধানে।

বললাম, সে কি রকম?

আনন্দ বলল, সব বাগানেই এখন আম, জাম কাঁঠাল। পেকে গন্ধে একেবারে ম-ম করছে। রসে টইটম্বুর।

চন্দ্রমৌলী বলল, তুই হেডমাস্টারমশায়ের ছেলে বলে কি তোর জন্যে সবাই দুপুরবেলা ফলের বাগান খুলে বসে আছে নাকি রে?

বললাম, সব বাগানে আগল থাকলেও একটা বাগান অন্তত খোলা পাবি।

কোনটা?

প্রফুল্লবাবুর বাগান।

চন্দ্রমৌলীর নোলা অমনি সুড়সুড় করে উঠল, দারুণ বলেছিস। চল, জাম খেয়ে আসি।

তিনজনে মাঠ পেরিয়ে অচিরেই প্রফুল্লবাবুর বাগানে হাজির। গাছপালা,

লতা ফুলে ভরে আছে বাগান। এত ঘন যে সহসা কারু চোখে পড়ে না, কে এলো, কে গেল।

জামতলায় ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে চোর এসে কাজ সেরে চলে গেছে বোঝা গেল। দু'চারটে একেবারে গলা পচা জাম ছাড়া আস্ত একটিও পড়ে নেই। অথচ গাছের ডালে জাম একেবারে ভেঙে পড়েছে।

চন্দ্রমৌলী বলল, অতঃ কিম্ ?

আমি বললাম, দোহাই তোর, আর যাকে পারিস স্মরণ কর, কেবল পণ্ডিতমশায়কে নয়। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ধরা পড়ে যেতে হবে সেবারের মতো।

আনন্দ বলল, এতদূর এসে ফিরে যেতে পারব না, আমি গাছে উঠে ডাল নাড়ছি, তোরা কুড়িয়ে নে।

উত্তম প্রস্তাব। গাছে উঠে গেল আনন্দ। আমি কলাপাতা সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি কয়েকটা ঠোঙা বানিয়ে ফেললাম।

জামতলায় বৃষ্টির মতো চড়বড়িয়ে জাম পড়তে লাগল। ওপরে তাকিয়ে দেখি, আমাদের আনন্দগোপাল ডালে ডালে ধেই ধেই করে নাচছে। দারুণ ফলপ্রসূ নাচ।

চন্দ্রমৌলী ঠোঙায় জাম ভরতে ভরতে চাপা গলায় বলল, ব্যাটা নেমে আয়, অনেক হয়েছে, এখুনি 'ক্যাচ, কট, কট' হয়ে যাবি।

নিচের দিকে তাকিয়ে কিসের যেন একটা গন্ধ পেয়ে গেছে আনন্দ। নাচ থেমে গেছে তার। এখন একটা কাঠবেড়ালীর মতো তির্‌তির্ করে নেমে আসছে সে।

জামগাছের গোড়ায় বেশ খানিকটা ঘিরে বৈঁচির ঝোপ। গাছে উঠতে গেলে সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। ঝোপের গা ঘেঁষে পুকুর অবধি ঘন কামিনী আর মেহেদির ঝাড়।

আনন্দ পা বাঁচিয়ে বৈঁচির ঝাড়ে নেমে পড়েছে। এবার সাবধানে ডান পা-টা তুলেছে কি তোলেনি, পেছন থেকে হাফ শার্টের কলারে টান পড়ল। দারুণ টান, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচানি, মা ছুটে এসো, চোর ধরেছি, চোর।

জোর করে লাফিয়ে পালাবে তার উপায় নেই। নতুন জামা যদি ছেঁড়ে, পুত্র বলে আনন্দগোপাল রেহাই পাবে না। বেতের ঘায়ে হেডমাস্টারমশায় পিঠের ছালচামড়া তুলে নেবেন।

মন পালাই পালাই করলেও জামার মায়ায় লজ্জার মাথা খেয়ে আটকা পড়ে যেতে হলো।

মধুশ্রী আমার গাঁয়ের মেয়ে। স্বাস্থ্য, শ্রী সবই তারিফ করার মতো, কেবল একটু ডাকাবুকো। ভয়ডরের বালাই নেই।

আমি অনুনয় করে বললাম, মধু, তুই আর চ্যাঁচাস নে, আমরা ঘাট মানছি। এই নে তোর জাম, দেখ আমরা একটাও দাঁতে কাটিনি।

মধু জামা ছেড়ে দিল আনন্দের কিন্তু পিঠে বসিয়ে দিল দুটো কিল,

চোরের শাস্তি। (বাসরে মধুর বান্ধবীরা বলেছিল, জাম চুরি করতে এসে কিল খেয়েছ, এখন ডাকাতি করে মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছ, দুটো কানমলা খেয়ে যাও।)

ততক্ষণে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কিন্তু জগদ্ধাত্রীর মুখটি বসানো।

বললেন, এদিকে এসো তোমরা।

মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা মেয়ে হয়েছ বাপু। দাদাদের গায়ে হাত! যা ঘরে যা।

তখন আমাদের অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কিন্তু তিনি ভারী মিষ্টি গলায় আমাদের তিনজনকে ঘরের ভেতর ডেকে নিলেন। অবশ্য খিড়কি দিয়েই আমরা অন্দরমহলে ঢুকলাম।

উনি আমার দিকে ফিরে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো বোর্ডিংয়ে আছ এখন। মা কবে ফিরবেন চাষবাড়ি থেকে?

বললাম, চার মাস তো হলো, ঠাকুমার শরীর খারাপ তাই ফিরতে পারছেন না। নইলে অনেক আগেই ফিরে আসতেন। এখনও ফেরার কোনো খবর পাইনি। পড়ার জন্য বোর্ডিংয়েই আছি।

উনি বললেন, বোর্ডিংয়ে আছ ভালই তো। সবাই মিলে ভালভাবে পড়াশোনাটা চালাতে পারবে। বাড়িতে না রেখে তোমার মা ঠিক কাজই করেছেন।

এরপর আনন্দ আর চন্দ্রমৌলীর সঙ্গেও অনেক কথা বললেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের বাড়িঘরের খোঁজখবর নিলেন।

সেদিন আমরা বোর্ডিংয়ে ফিরলাম দারুণ ফলাহার সেরে। নানা রকমের আম কেটে কেটে প্লেট ভর্তি করে খেতে দিলেন। খাজা কাঁঠালও খাওয়া হলো। শেষে উনি ঐ জামগুলোও আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। অভয় দিয়ে বললেন, যখন খাবার ইচ্ছে হবে চলে এসো। আমার কাছেই আসবে।

আশ্চর্য মাতৃমমতার এক প্রতিমূর্তি এই নারী। কিশোরী বয়সে বধূ হয়ে এসেছিলেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। শ্বশুর, স্বামী আর ছটি দেবর নিয়ে সংসার। কিন্তু সে সংসার একদিন বিশাল হয়ে উঠল অনাত্মীয়ের ভিড়ে। পথের কুকুর, কাঠবেড়ালী, পাখপাখালি থেকে পুকুরের মাছ অবধি তাঁর দেওয়া খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হতো। দেবর ছটি হলে কি হবে, তাদের বন্ধুবান্ধব অগুনতি। সদরে নিজের লাইব্রেরীতে বই নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন প্রফুল্লবাবু। ভায়েরা দফায় দফায় বন্ধু নিয়ে খিড়কি দিয়ে ঢুকে পড়ছে বৌদির এজলাসে। জলখাবারে কারু চাই গরম ভাত, আলুমাখা। কেউ খাবে পান্তাভাত, আলু-ভাজা আর বড়িভাজা দিয়ে। একদল ওসবে নেই। তারা চিবুবে মুড়ি আর নারকেল। কেউ খাবে দুধ আর পাটালি দিয়ে মুড়ি। কাজের লোক, জনমজুর আগেভাগে বসে গেছে পাত পেড়ে। মায়ের হাতের ছোঁয়ায় পাত উপচে পড়বে।

বৌদির কাছে কারু কোনো সংকোচ নেই। কোন মেয়েটিকে কার ভাল লেগেছে সে নিয়ে বৌদির সঙ্গে চলল গোপন পরামর্শ। অন্যায় করে শ্বশুর,

স্বামীর হাতে ছেলেরা মার খেল, প্রবোধ আর সান্ত্বনা এল বৌদির কাছ থেকে। শাস্তিতে ছেলেদের কারুর ভাত বন্ধ হলে, বৌদিরও সঙ্গে সঙ্গে চলল অনশন।

সারাদিন কাজের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন সবার চোখে হয়ে গেলেন সংসারের মধ্যমণি। বৌদির আসন থেকে কখন প্রতিষ্ঠিত হলেন মায়ের বেদীতে।

এদিকে প্রফুল্লবাবু একসময় স্কুল ছেড়ে দিলেন। প্রতিভাবান ছেলেরা কিন্তু সব সময়ে তাঁর প্রশ্রয় পেত। উঠতি লেখকরা লেখা নিয়ে ভিড় জমাতো তাঁর কাছে। নিখুঁত সমালোচনা তাঁর। প্রশংসার কিছু থাকলে বলতেন অল্প কথায়। উচ্ছ্বসিত হতেন না কখনো। ঐ একটুখানি সাধুবাদেই তরুণ লেখক পেয়ে যেত তার প্রেরণা আর পুরস্কার। আঁকিয়েদের জন্যে কলকাতা থেকে এনে দিতেন রঙ, তুলি, আরও নানা রকমের সরঞ্জাম। যেসব ছেলেরা মূর্তি গড়তে পারত তাদের উৎসাহ দিতেন। সেইসব ছবি আর মূর্তি চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছেন নিজের ঘরে। বিশিষ্ট লোকেরা এলে তাদের সেগুলি ঘুরে ঘুরে আজও দেখান। এতেই তাঁর তৃপ্তি।

পুজার্চনার বালাই নেই তাঁর বাড়িতে। শ্রাদ্ধশান্তি ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশ্বাসী নন। তবে তাঁর স্ত্রী রামকৃষ্ণ, সারদা ও বিবেকানন্দের তিনটি ছবিকে পাশাপাশি রেখে প্রণাম করতেন। তাই দেখে তিনি নিজের হাতে একসময় একটি ছোট্ট, অতি সুদর্শন মন্দির তৈরি করে দেন। নিজে দেবদেবীর পুজা সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও কারু ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে কখনও আঘাত করেন না।

প্রফুল্লবাবুর প্রাণের ঠাকুর যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বহু বই সংগ্রহ করে রেখেছেন তাঁর লাইব্রেরীতে, কিন্তু মগ্ন হয়ে থাকেন রবীন্দ্র রচনাবলীর ভেতর। রবীন্দ্রনাথের ওপর লেখা যত বই, প্রায় সবই তিনি সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড-গুলি তাঁর সঞ্চয়ে। আপন মনে সেগুলি তিনি বাজিয়ে শোনেন। তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গী ও সান্ত্বনাদাতা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

প্রফুল্লবাবুর মতো এমন একজন বৃক্ষপ্রেমিক সত্যিই দুর্লভ। বিশাল বাগানটি অজস্র গাছপালায় আকীর্ণ। ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফোটে, ফল ফলে, পাখি ডাকে। তাদের ভেতর বসে সবকিছু দেখেন, শোনেন আর অনুভব করেন। তিনি কড়া আদেশ জারি করে রেখেছেন, রান্নায় জন্য শুকনো পাতা, মরা ডালপালাই শুধু ব্যবহার করা চলবে। কাঠের জন্য সজীব সতেজ গাছের ডাল কাটা চলবে না।

প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে খেজুর গুড়ের প্রবেশ নিষেধ। খেজুর গাছের গলা চেঁছে তার কণ্ঠনালিটি বিদ্ধ করে যে রস বের করা হয় সেটাকে তিনি প্রাণ থেকে কোনো মতেই সমর্থন করতে পারেননি। এই পদ্ধতিকে তিনি নিষ্ঠুরতা বলেই মনে করেন।

সেবার আমি বসেছিলাম ওঁর পাশটিতে। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের চিঠি-

গুলি নিয়ে উনি আলোচনা শুরু করেছিলেন। চিঠি যে রচনার গুণে কতবড় সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে তা তিনি চিঠিগুলোর বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ে বোঝাচ্ছিলেন।

আমি নিজেই ও বিষয়টা নিয়ে অনার্সের ছাত্রদের কাছে আলোচনা করি কিন্তু ওঁর কাছে আমি চিরদিনের ছাত্র, তাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম।

পড়া শেষ হলে কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে প্রফুল্লবাবু বললেন, চল, একটু ঘুরে আসি।

আমরা দুজনে বাগানের ভেতর পায়চারি করতে লাগলাম। হরেক রকমের গাছ, নানা রঙের অজস্র ফুল, বাতাসে মিশ্রিত সুবাস।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। কৃষ্ণচূড়ার ডাল ভরে ফুলের উৎসব। বেশ কয়েকটা ফুল নিচে ঘাসের জমিতে ঝরে পড়েছে। পাশেই ঘন পত্রবহুল বকুলের ডালে বসে একটা পাখি ডেকে চলেছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। ছোট্ট বাঁধানো পুকুরের ধারে জবাফুলের গাছ। সবুজের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে টুকটুকে লাল ফুল। বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে গলানো সোনার মতো সূর্যের আলো ঝিলিক দিয়ে সোনার কুচি ছড়াচ্ছে পুকুরের জলে। আহা মরে যাই।

হঠাৎ প্রফুল্লবাবু বললেন, জায়গাটা কেমন ?

বললাম, তুলনা নেই। একেবারে সুন্দরের দেবতা শান্তির নীড়টি রচনা করে রেখেছেন।

প্রফুল্লবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ জায়গাটি আমি নির্বাচন করে রেখেছি।

আমি কথাটার অর্থ ধরতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

উনি একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বললেন, আমি চাই না আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি গাছেরও মৃত্যু হয়, অথবা সে ভয়ংকর রকমের আঘাত পায়। তাই তোমাদের মাকে আমি বলে রেখেছি, আমি মারা গেলে আমাকে দাহ না করে এই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় যেন সমাধি দেওয়া হয়।

সেই প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষটি সেদিন চোখের সামনে গাছ থেকে টুপ করে খসে পড়া একটি শুকনো পাতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, মৃত্যু যেন এমনি করেই আসে। কাউকে যন্ত্রণা না দিয়ে, দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে রোগ ভোগ না করে এই যে নিঃশব্দে সরে যাওয়া, এর চেয়ে কাম্য আর কি হতে পারে বল ?

সেদিন আমার পক্ষে এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আজ মনে হয় সদ্য বিবাহিত তাঁর বড় আদরের কন্যা মধুশ্রীর বৈধব্য তাঁকে নিশ্চিতভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

বাইরে বসেছিলেন প্রফুল্লবাবু। স্থির, নিশ্চল। দৃষ্টি সামনের দিকে মেলে রেখেছেন। ভেতরে কতখানি বিধ্বস্ত তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না।

প্রণাম করে মাথা তুললাম। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বৃষ্টিতে

ভিজে গেছ একেবারে, ভেতরে গিয়ে গা-হাত মুছে কাপড়চোপড় বদলে নাও। সংগীতা এলো না ?

বললাম, সে তিলাইয়াতে দিদি জামাইবাবুর কাছে বেড়াতে গেছে। তাকে এখনও খবরটা দিইনি।

ভাল করেছ। শুনলে সে একেবারে ভেঙে পড়বে। বড় নরম মন।

বললাম, সংগীতার ফেরার কথা এই সপ্তাহের শেষের দিকে। খবর পাওয়া-মাত্রই ও ছুটে আসবে ওর বোনেদের কাছে।

সে আমি জানি। বাবার কষ্টে ও ছাড়া কে আমার বুকে হাত বুলিয়ে দেবে।

অন্দরে ঢুকতে পা সরছিল না, তবু যেতে হলো।

ভেতরে শালের খুঁটি ঘেরা চৌঘরা উঠোন। প্রতিদিন যেখানে মাকে ঘিরে চেনা, আধচেনা ভিক্ষার্থী নারী-পুরুষের মহোৎসব, যেখানে অন্নপূর্ণা অকাতরে অন্নদান করছেন, সেই অন্দরমহলে শ্মশানের নীরবতা।

এ ক'দিন সান্ত্বনার কথা জানাতে নিশ্চয়ই অনেক মানুষ এসেছিলেন। এখন তাঁরা যে যার কাজের ভেতর জড়িয়ে পড়েছেন।

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী এগিয়ে এসে আমার দুটো হাত ধরে বললেন, তুমি একাই এলে বাবা, বন্ধুকে সঙ্গে আনতে পারলে না ?

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। বেশ বুঝতে পারলাম, ওঁর হাত দুটি কাঁপছে। আমি পায়ের ধুলো নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একসময়ে চোখ গিয়ে পড়ল চৌঘরার পুব প্রান্তে। শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে মধুশ্রী। এলোচুল লুটিয়ে পড়েছে কিছু কোলের ওপর, কিছু মেঝেতে। কপালে, মাথায়, নির্মমভাবে মুছে ফেলা হয়েছে সিঁদুরের চিহ্ন।

পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই ডাকাবুকো মেয়েটাকে চেনার কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ হুঁশ ফিরে এল ওর। এতক্ষণ যেন কোনো একটা স্বপ্নের ঘোরে কাটাচ্ছিল। পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতেই আমি ওর হাত ধরে তুললাম। বন্যার স্রোত বইছিল ওর দুগাল বেয়ে।

প্রবোধ দেবার ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি ওকে নিঃশব্দে চোখের জল ঝরাতে দিলাম।

একসময় পোশাক ছেড়ে আমি পুব দিকের দোলনাটিতে বসলাম। মা আমাকে ঐ দোলনাটিতে বসিয়ে দিয়ে, জামবাটি ভরে মুড়ি আর বড় বড় কয়েকটা নারকেলের নাড়ু দিয়ে গেলেন।

আমি খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম, এই তো ক'মাস আগে দোলনায় আগে কে বসবে তাই নিয়ে আমার আর আনন্দের ভেতরে লটারি হয়ে গিয়েছিল। দর্শক ছিলেন, মা, মধুশ্রী, সংগীতা আর পুষ্পশ্রী।

হেরে গিয়েছিলাম আমি। আনন্দ জিতে গিয়ে মহানন্দে দোলনায় একবার দোল খেয়েই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল উঠোনে। নরম কাদায় দাগ লেগেছিল কাপড়ে, আঘাত লাগেনি। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে উঠিয়েছিলাম। ও

হাসছিল। মধু মজা পেয়ে জোরে হাততালি দিচ্ছিল। বিয়ের কদিন পরেই ঘটেছিল ঘটনাটা।

সেই দোলনায় আজ আমি বসেছি। নিঃশব্দে জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে আর একজন।

আমি খাওয়া শেষ হলে বাটিটা নিচে রেখে দোলনায় বসে ধীরে ধীরে দুলতে লাগলাম। ওরা কেউ স্নান, কেউ রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পুষ্পশ্রীকে আসা অবধি দেখতে পাইনি। শুনলাম সে ওপাড়ায় এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।

দোলনার সামনে খিড়কির দরজাটি খোলা দরজার পরেই বাঁধা ঘাটের সিঁড়ি। পুকুরে থৈ থৈ জল। পাড় জুড়ে গাছগাছালি। তালগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে পুকুরের জলে। আমি সেদিকে তাকিয়ে স্মৃতির টুকরো টুকরো স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। স্মৃতিগুলো দূরের নয়, বড় কাছের।

নতুন জামাই স্নান করবে না চৌবাচ্চার সুগন্ধী জলে। সে ঝুঁকে পড়া একটা নারকেল গাছের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে পুকুরে। আমাকেও তাই করতে হবে।

সুতরাং নতুন জামাইয়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য আমাকেও সায় দিতে হলো। এরপর ডুব সাঁতার আর পাঁক তোলার প্রতিযোগিতা। দর্শক, সঙ্গীতাকে ধরে তিন বোন। সঙ্গীতা আমাকে একবার একান্তে পেয়ে ফিসফিস করে বলে দিল, তুমি কিন্তু কোনোটাতে জেতার চেষ্টা করবে না। বর জিতলে মধুর মুখখানা কেমন লাগে দেখব।

আমি মাথা নেড়ে জানালাম, বুঝেছি।

ডুব সাঁতারে ওপারে পৌঁছানোর আগেই আমি জলের ওপর ভেসে উঠলাম ভুস্ করে। কিন্তু আনন্দ কই।

সবাই চঞ্চল হয়ে পড়ল। সম্ভাব্য সময়টুকু পার হতেই মধু আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, ও কোথায় গেল রঞ্জনদা।

আমি তখন বিহ্বল। ক্রমাগত পুকুরে ডুব দিয়ে ওকে খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওরা পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে আমার ডোবা আর ওঠার দিকে চেয়ে আছে আকুল হয়ে।

হঠাৎ সঙ্গীতার গলার স্বরে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ভেজা গায়ে পেছন থেকে মধুর চোখ টিপে ধরেছে আনন্দ।

আমি দ্রুত সাঁতরে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলাম! ইতিমধ্যেই মার শুরু হয়ে গেছে। এবার আর পিঠে নয়, বুকে পড়ছে মধুর কিল। যত কাঁদছে তত মারছে।

পরে জানা গেল আনন্দ আগেভাগে প্ল্যান করেই ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। দুজনে ডুব দিয়েছি সোজা ওপারে উঠব। দর্শকেরাও তাকিয়ে আছে সিধে পুব দিকে। আনন্দ কিন্তু ডুব দিয়েই মাটি ধরে এগিয়েছে উত্তর দিকে। একটা

আমগাছের আধেক ছুঁয়ে আছে পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণ। ডালে পাতায় সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে পুকুরের ঐ অংশটি। কল্‌মিরও একটা আস্তরণ পড়েছে ঐদিকে।

আনন্দ নিঃশব্দে সবার চোখের আড়ালে উঠে পড়েছে ঐ কোণায়। তারপর পশ্চিমের বাগানের গাছগাছালির ভেতর দিয়ে ঘাটের কাছে চলে এসেছে। কেউ ওকে পেছন ফিরে লক্ষ্য করেনি। তখন সবার একাগ্র দৃষ্টি পূব দিকে, যেখানে আমি ডুবছি আর উঠছি আনন্দের খোঁজে।

আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। সূর্যের কুচিগুলো তখনও ঝিলিক দিচ্ছে পুকুরের জলে।

আমাকে চমকে দিয়ে মধুশ্রী বলল, কি ভাবছ রঞ্জনদা?

ও নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে, আমার দোলনার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে।

আমি বললাম, স্মৃতি সব সময় সুখের নয় মধু।

ও কি ভাবল জানি না। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, তোমার বন্ধুর জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা মনে আছে তো?

বললাম, ঐ স্মৃতিগুলোই তো আঘাত হয়ে বাজছে মনের মধ্যে।

মধু বলল, আমার কি মনে হয় জান রঞ্জনদা, ও কৌতুক করে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে এসে আমার চোখ দুটো টিপে ধরবে। ঠিক সেবারের মতো। আমি যখন আকুল হয়ে উঠলাম ওর জন্যে তখন ও পেছন থেকে এসে হাজির হলো।

একটু থেমে মধু আবার কান্নাভেজা গলায় বলল, রঞ্জনদা, রাত্রিদিন ওকে আমি আকুল হয়ে ডাকছি, ও কি শুনতে পাচ্ছে না?

এর উত্তর আমার জানা ছিল না, তাই পাথরের ভার নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

বিকেলে একা পেয়ে গেলাম পুষ্পকে। সে চা নিয়ে ঢুকেছিল আমার ঘরে। বয়স কম হলে কি হবে, দারুণ রসিকা পুষ্প। সারাক্ষণ কথার ফুলঝুরি ঝরে তার মুখ থেকে। কিন্তু পুষ্পের মুখে কোনো কথা নেই। দিদির শোক তার সমস্ত মুখে গভীর একটা ছায়া ফেলে দিয়েছে।

একান্তে পেয়ে পুষ্পের কাছে একটি কথা জানতে চাইলাম। মাকে দেখার পর থেকেই আমার মনে প্রশ্নটা জেগেছিল, কিন্তু শোকের প্রবাহে তার উত্তর আর খোঁজা হয়নি।

আচ্ছা পুষ্প, মায়ের কপালে সিঁদুরের যে টিপটা জ্বলজ্বল করত সেটা দেখলাম না তো।

পুষ্প বলল, সে আর বল না দাদা। জ্ঞাতিদের মেয়েরা এসে যখন ঘাটের পাটে বসে দিদির নোয়া খুলে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিচ্ছিল, তখন মা ছুটে গিয়েছিল বাইরের ঘরে। আমি আড়াল থেকে দেখলাম, মা লুটিয়ে পড়ল বাবার পায়ের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, চোদ্দ বছর বয়সে আমাকে তুমি

সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে এনে তুলেছিলে। আজ তুমি নিজের হাতে আমার মাথা থেকে সেই সিঁদুরের চিহ্ন মুছে দাও। মধুর সামনে আমি রোজ সিঁথি ভরা সিঁদুর নিয়ে ওর শূন্য সিঁথি দেখতে পারব না।

বাবা তখুনি নিজের ধুতির একটা কোণ আঙুলে জড়িয়ে মায়ের কপাল আর সিঁথি থেকে সিঁদুরের দাগ তুলে দিতে দিতে বলল, স্ত্রীর সম্পর্ক অতিক্রম করে আজ থেকে মাতৃত্বই হোক তোমার একমাত্র পরিচয়। মধুকে আবার তোমায় নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

শোক যেন একটি প্রবাহ। এক স্রোতের ঢেউ ভাঙতে না ভাঙতেই তার পেছনে এসে পড়ে অন্য এক ঢেউ। প্রফুল্লবাবুর বাড়ি থেকে শোকের তরঙ্গ পেরিয়ে কলকাতায় ঢুকতে না ঢুকতেই আর একটি শোকসংবাদ পেলাম, সেটি একটু ভিন্ন ধরনের।

হ্যারিসন রোডে দেখা হয়ে গেল আমাদের কলেজের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট গোপালবাবুর সঙ্গে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট অরুণবাবুও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

গোপালবাবু স্বাস্থ্যবান সুদর্শন পুরুষ। কথা কম বলেন, কিন্তু পরিপাটি তাঁর কাজ। অধ্যাপকদের তিনি যেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখেন আমরাও তেমনি তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে থাকি। বিশেষ উত্তেজনার কারণ ঘটলেও আমরা কখনও তাঁকে চেঁচামেচি করতে কিংবা উত্তেজিত হতে দেখি না। এটিকে আমি মনুষ্য চরিত্রের বিরাট একটি গুণ বলে মনে করি।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট অরুণবাবু অবিবাহিত, একটু অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। অধ্যাপকদের কেউ কোন কাজে অফিস ঘরে ঢুকলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, না না কিছু আসেনি, হবে না, হবে না।

উনি ভেবে নেন, অধ্যাপকরা অফিসঘরে ঢুকেছেন পাওনা টাকাকড়ি এসেছে কিনা জানতে।

অরুণবাবুর এ ধরনের আচরণে সকলেই অভ্যস্ত। কেউ কিছু মনেও করেন না। একটু পরেই অরুণবাবুর অন্যমূর্তি। হাহা করে অফিসঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। একেবারে নির্মল মন।

এই দুজন আনন্দময় মানুষের সঙ্গে কলেজের পথে দেখা হয়ে গেল অথচ কেউ মৃদু হেসেও আমার সঙ্গে কথা বললেন না দেখে আমি দারুণ আহত হলাম। এতদিন আমার ধারণা ছিল, ওঁরা সকলেই আমাকে পছন্দ করেন।

আমি কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম, এর মধ্যে কিছু ঘটল নাকি? এবার উপযাচক হয়ে আমি ওঁদের কাছাকাছি গিয়ে বললাম, কি খবর গোপালবাবু, সব ভাল তো?

ওঁরা দুজনে পথের ধারে সরে এসে দাঁড়ালেন।

গোপালবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ গলায় বললেন, স্যার এখুনি আমার ভাইপোকে দাহ করে ফিরছি। জরুরী কাজ আছে কলেজে, তাই আসতে হলো।

কলেজ থেকে দেশে যাওয়ার আগে আমি শুনে গিয়েছিলাম, গোপালবাবুর এক ভাইপো বাইরে থাকে। ভাল কাজকর্ম করছে। স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলে। তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন গোপালবাবু। মেয়েটি বেশ শিক্ষিতা এবং রুচি-সম্পন্না। কাগজের যোগাযোগ তবে বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হবার পরে পাত্রীপক্ষের সঙ্গে না।কি গোপালবাবুর পরিচয় নিবিড় হয়েছে।

এসব কথা আমি শুনেই গিয়েছিলাম। তাই ভাইপোকে দাহ করে এলাম, কথাটা শুনেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

আমি বিস্ময় মেশা ভাঙা গলায় বললাম, আপনার ভাইপো! কোন্ ভাইপোর কথা বলছেন ?

অরুণবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আর বলবেন না, বেচারা সংসার গড়তে চেয়েছিল, ভগবান তার সে সাধ পূর্ণ করতে দিলেন না।

আমার তখন সব বোঝা হয়ে গেছে। আমিও প্রায় আঁৎকে উঠেই বললাম, সে কি! সেই ছেলে, যার বম্বে থেকে কলকাতায় বিয়ে করতে আসার কথা ছিল!

গোপালবাবু প্রায় ভেঙে পড়েই বললেন, হাঁ সেই হতভাগ্য।

হয়ত এসব ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয় তবু ভেতরের কৌতূহলকে চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো গোপালবাবু ?

আসছিল ট্রেনে, হয়তো নতুন জীবনের স্বপ্নই দেখছিল। ঐ কামরার সহযাত্রীদের মুখ থেকে শুনলাম, ও দরজার হাতল ধরে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ ট্রেনের সামান্য ঝাঁকুনিতেই পড়ে যায়। একটা পা কাটা পড়লেও সে বেঁচেছিল। আমরা হাওড়াতে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তারপর যা হয়, দৌড়-ঝাঁপ, হাহাকার, হাসপাতাল, সবই হলো কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না তাকে।

যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, সে আমাকে বলছিল, বাঁচি আর মরি, মেয়েটিকে ভাল একটি ছেলে দেখে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো।

একটু থেমে গোপালবাবু বললেন, আপনি শুনলে স্যার আশ্চর্য হবেন, যে কদিন ও বেঁচেছিল, প্রতিদিন মেয়েটি হাসপাতালে এসে ওর কাছে বসে কথা বলে গেছে। উৎসাহ দিয়েছে। আজও ভোরবেলা মেয়েটি শ্মশানে এসেছিল। ওর বাবা মা বাধা দেননি। আমরা এইমাত্র তাকে বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে কলেজে আসছি। ও শুধু বলল, কাকু ওঁর আত্মার শান্তির জন্য আমি রোজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব।

আমার মনে হলো, ঐ মেয়েটির হৃদয়ের ছোঁয়ায় মৃত্যুর অবয়বে ফুটে উঠল মাধুর্যের দ্যুতি।

জীবনের ছোঁয়ায় যে মৃত্যুর মুখ থেকে তার ভয়ঙ্কর কালো মুখোশখানা খসে পড়ে যায় তার পরিচয় আমি পেয়েছি দুটি মানুষের দিকে তাকিয়ে। তাঁদের একজন পুরুষ অন্যজন নারী। মৃত্যু অনিবার্য এবং অদূরে বিচরণ করছে জেনেও তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। ভয়ের সামান্য ছায়াও তাঁদের

মুখকে আবৃত করেছে, এমন দৃশ্য কোনো অসতর্ক মুহূর্তেও আমার চোখে পড়েনি। শুধু জীবনের প্রতি তাঁদের অমিত ভালবাসা মৃত্যুকেও উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

দুজনেই ক্যানসারে আক্রান্ত। দুজনেই পাশাপাশি দুটি প্রদেশের দুই কলেজে অধ্যাপনা করেন। দুজনে পরস্পরের অপরিচিত কিন্তু আমার অনেক দিনের চেনা তাঁরা দুজনেই। মহিলাটি বার বার অপারেশানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছেন। দেহের ভেতরে বাহিরে একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর বাদ চলে গেছে। তবু কি অসীম শক্তি তাঁর! নিজের বলতে কেউ নেই। ছোট্ট সংসারের সমস্ত কাজ নিজের দুটো হাত দিয়েই সম্পন্ন করেন সরস্বতী গাঙ্গুলী। শেষ একটি বড় অপারেশানের পর কলেজের কাজেও ইস্তফা দিতে হয়েছে তাঁকে। অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয়েছে কিন্তু ব্যয়ের প্রবাহ সমান বেগবতী।

যেসব মেয়ে শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ওঁর ছোট্ট ডেরাটিতে গিয়ে হাজির হয় তাদের পড়া তৈরী করে দেন তিনি। বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করেন না, এমনকি সেবাও নয়। বড়জোর বলেন, সেবা, কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দাও তো। পায়ে এমন টান ধরেছে উঠে বসতে পারছি না।

অনেক সময় জ্বর ও যন্ত্রণায় চুপচাপ একাকে বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। তখন বিছানা থেকে উঠে একটু জল গড়িয়ে খাবারও ক্ষমতা থাকে না। দুদিন হয়ত নির্জলা উপবাসেই কেটে যায়। বন্ধুবান্ধব পালা করে আসতে চান, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু এতে সরস্বতীর ঘোরতর আপত্তি। তিনি বলেন, আমার পরমায়ুর যেটুকু সীমা, সেই সীমার ভেতর জীবনটাকে ভোগ করতে দাও আমার মতো করে। তোমাদের গল্প করার ইচ্ছা হলে চলে এসো। চায়ের ব্যবস্থা থাকবে, আমি যদি তৈরি করে দিতে না পারি, নিজেরা করে নিও। ব্যস্, এর বেশী নয়।

একটুখানি সুস্থবোধ করলেই হংসবাহিনী ছুটছেন দিকে দিগন্তরে। পরিচিত, মুখচেনা, সকলের বাড়িতেই ধাওয়া করছেন। তাঁদের সামনে তুলে ধরছেন পরিচিত সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির চাঁদার বই। ওতেই ওঁর আনন্দ, ওতেই ওঁর অসীম তৃপ্তি।

কলেজ থেকে চলে আসার সময় সহকর্মীরা টেপ রেকর্ডার উপহার দিয়েছিলেন। তিনি গানের ক্যাসেট কয়েকখানা রেখেছেন। বিছানায় শুয়ে অথবা বসে ক্যাসেট চালিয়ে শোনেন। কয়েকখানা গান তাঁর ভারী পছন্দের। সেগুলো বার বার শুনেও আশ মেটে না।

অতুলপ্রসাদের একটি গান যখন বেজে ওঠে তখন উনি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন না। উঠে বসে প্রিয় সমাগমের রোমাঞ্চ অনুভব করেন।

'আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বঁধু এলো আপন ঘর
ওগো অনেক দিনের পর।...'

বিশেষ গানটি শেষ হয়ে যায়, অন্য গান বেজে চলে। সরস্বতী গাঙ্গুলীর মন কিন্তু মগ্ন হয়ে থাকে প্রথম গানখানির কথা ও সুরের গভীরে।

আমি বারে বারে ওঁর ঘরে গিয়ে গানের সময় ওঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছি।

আর একখানা গান ওঁর বড় প্রিয়। সেখানি শুনতে শুনতেও ঐ একই অভিনিবেশ, একই মগ্নতা।

'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব ॥
কত-যে গিরি কত-যে নদী-তীরে
বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব ॥...'

ঈশ্বরের হাতের বাঁশিটির মতো সরস্বতী গাঙ্গুলীর মৃত্যুহীন প্রাণকে আমি বার বার মরণসাগরের কূলে বসে বেজে উঠতে শুনেছি।

দ্বিতীয়জন থাকতেন ভুবনেশ্বরে। অতি সম্প্রতি অস্তাচলের পারে অন্তর্হিত হয়েছেন। ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ডি. লিট রিজিওন্যাল কলেজ অব এডুকেশানের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের মানুষ হলেও ইংরাজী সাহিত্যে সমান দক্ষতা ছিল তাঁর। বহু গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি।

জীবনে অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর অপরিসীম। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর পিতৃদেবকে বললেন, আমি কলকাতায় থেকে পড়ব ভেবেছি।

পিতৃদেব উত্তর দিলেন, তুমি রেজাল্ট ভাল করেছ, অবশ্যই কলকাতায় পড়তে যেতে পার। আমি ধনী না হলেও তোমাকে মেসে রেখে পড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি। তবে তোমার ছোট ভাইগুলোকে আর খরচ করে স্কুলে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হবে না।

অতএব কলকাতা যাওয়া হলো না। সেই বয়সে সংসারের হাল ধরতে হলো। অচিরেই একটি লক্ষ্মী-প্রতিমা বউও এলেন সংসারে। চারদিক থেকে বন্ধন, ঘোরতর সংসারী। পরপর ভূমিষ্ঠ হচ্ছে পুত্রকন্যারা।

ধীরে ধীরে ভায়েরা দাঁড়াল নিজেদের পায়ে। সংসার এখন মোটামুটি সুস্থির। মা ও বৌদির যুগল ভূমিকা পালন করছেন মমতাময়ী স্ত্রী। লোকলৌকিকতা, আত্মীয়-পরিজন সমাগম লেগে আছে সারাক্ষণ। বৃহৎ পরিজন পরিব্যাপ্ত সংসার। কঠিন শ্রমেও আনন্দের মধুর হাসিটি গৃহিণীর মুখে মাখানো। সেবায়, সান্ত্বনায়, স্নেহে, শ্রমে অদ্বিতীয়া নারীটিকে পাশে পেয়ে পরিতৃপ্ত সংসারী তখন বিষ্ণুপদবাবু।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো, কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে গেছে। ধরিত্রীর বুক চিরে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটি উত্তপ্ত নিঃশ্বাস বিষ্ণুপদবাবুর বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। তিনি বুঝতে পারলেন সাংসারিক নিশ্চিন্ততাই সব নয়। আরও কিছু পাওয়ার ছিল তাঁর, তিনি তা পাননি।

সে পাওয়ার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর তরুণ বয়সেই। হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললেন রুদ্ধ ঐ দ্বারটা বিয়াল্লিশ বছরের এক তরুণ। হাঁ, তারুণ্যের সমস্ত শক্তি তখন ঐ বিয়াল্লিশ বছরের মানুষটির দেহে মনে সঞ্চারিত।

একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দ্বারগুলো খুলতে খুলতে এগিয়ে গেলেন। শেষে মূল্যবান গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ পেলেন, পি. এইচ. ডি, ডি. লিট ডিগ্রি।

এরপর মেদিনীপুর থেকে শেষ জীবনের সংসারটিকে সরিয়ে নিলেন ভুবনেশ্বরে। রিজিওন্যাল কলেজ অব এডুকেশানে অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর আসল কাজটি ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা। এ কাজের জন্য তিনি ভুবনেশ্বর মিউজিয়ামের প্রাচীন পুঁথি বিভাগটিকে তোলপাড় করে ফেললেন। মধ্যযুগে ওড়িয়া কবিরা আগ্রহ নিয়ে বঙ্গদেশে আসতেন। বাংলা ভাষা শিখে নিতেন, বাংলা সাহিত্যের কাব্যকাহিনী থেকে সংগ্রহ করতেন নানা ধরনের উপাদান। তাঁরা সেইসব কাহিনীর সঙ্গে নিজেদের কাব্যভাবনা মিশিয়ে যেসব সাহিত্য সৃষ্টি করতেন তা কিন্তু লেখা হতো বাংলাভাষায়। তাঁরা বাংলা ভাষাটি শিখেছিলেন, কিন্তু তার হরফগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেননি। তাই তাঁরা তাঁদের সৃষ্টি কর্মগুলিকে লিপিবদ্ধ করতেন ওড়িয়া হরফে। ডক্টর পাণ্ডা ওড়িয়া ভাষা এবং হরফ দুটোই জানতেন। গবেষণার কাজে ওড়িষ্যা মিউজিয়ামের ভেতর ঢুকে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐ অমূল্য জিনিসগুলি আবিষ্কার করেন। প্রায় দেড়শো পুঁথি উনি নাড়াচাড়া করেছেন। এর ওপর একাধিক গবেষণা পুস্তক রচনা করে তিনি সুধী সমাজকে উপহার দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর নিরলস গবেষণার কাজ আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়।

মানুষটি সদানন্দময় এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। বসুধা তাঁর কুটুম্বে পূর্ণ। একবার তাঁর সঙ্গে যাঁরই ক্ষণকালের জন্যেও দেখা হয়েছে অনিবার্যভাবে তিনি চিরকালের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছেন। দেশবিদেশের অনেক গবেষক এবং সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। তাঁরা ডক্টর পাণ্ডার উত্তপ্ত হৃদয়ের স্পর্শ থেকে কখনও নিজেদের সরিয়ে নিতে পারেননি।

জনসংযোগ ছিল তাঁর অসাধারণ। গবেষণা ও অধ্যাপনার ফাঁকে তিনি সামান্য অবসরগুলি চিঠি লিখে ভরাতেন। তাঁর শত শত চিঠি ভোরের পাখিদের মতো উড়ে চলে যেত দিকে দিকে। এই প্রসঙ্গে আর এক অনুজপ্রতিম অধ্যাপকের কথা আমার মনে পড়ছে। তিনিও ইতিহাস নিয়ে গবেষণা পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁরও জনসংযোগ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করার মতো। দু'বার পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণ করে এসেছেন আন্তরিক অনুরাগের উত্তাপে ভরা পত্র-সংযোগের মাধ্যমে। অবশ্য অধ্যাপক কানাইলাল চ্যাটার্জী প্লেন ভাড়ার অনেকটা অর্থই যোগাড় করে নেন, বিদেশে বিশেষ বিশেষ সেমিনারে তাঁর পেপার পড়ার সুবাদে। প্রিস্টিজ পারসোনালিটির জন্য ডক্টর চ্যাটার্জীর মুহূর্তে সবার হৃদয় হরণ করে নেবার অসাধারণ এক ক্ষমতা আছে। ছোট বড়

সকলের সঙ্গে তাঁর সমান আত্মীয়তা। আর একটি বিশেষ গুণ তাঁকে সবার প্রিয় ও শ্রদ্ধেও করে তুলেছে। কারুর অসুস্থতার খবর কাকপক্ষীর মুখে পেলেই কানাইলাল হাজির। সারা কলকাতার বিশিষ্ট ডাক্তার বদ্যি, হাসপাতালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সাধ্যমত সাহায্য করছেন, দরকার মতো হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে রোগীর বেডের কাছে হাজির থাকছেন।

ফোনে কানাইলালকে শুধোলেই হল, কেমন আছ ভাই ?

ফাইন।

(যিনিই ফোন করুন না কেন, একবার যাঁর কণ্ঠ শুনেছেন কানাইলাল তিনি প্রথম বাক্যালাপেই ধরা পড়ে গেছেন কানাইলালের শ্রবণেন্দ্রিয়ে।)

ভারী অসুবিধেয় পড়ে গেছি।

কি হলো দাদা ?

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর একটা উপন্যাস লিখব ভাবছি, বইপত্র কি পড়া যায় ?

ডক্টর মজুমদারের 'সুবর্ণদ্বীপ'।

পাই কোথায় ?

আপনার নাকের ডগায় গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী। ওখানে পেয়ে যাবেন। ইংরাজিতে লেখা কয়েক ভলিউম। পাতা খসে যাবার যোগাড়। বাড়ি আনতে দেবে না। কার্ড করুন, ঢুকে পড়ুন, যত খুশি নোট নিন।

বাঁচালে ভাই।

তারপরেও অসুবিধেয় পড়লে অধমকে স্মরণ করবেন।

হাঁ, যাঁর কথা বলতে বলতে কানাইলালের কথা এসে গেল, তাঁর কথা দিয়েই শেষ করি।

আমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ। সবাইকে ভুবনেশ্বরে তাঁর ছোট্ট কোয়ার্টারটিতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন ডক্টর পাণ্ডা।

সারা বছর অতিথি অভ্যাগতের সমাগমে তাঁর কোয়ার্টারটি কলরব-মুখরিত হয়ে থাকত।

বিদেশিনীরা ডক্টর পাণ্ডার মমতাময়ী স্ত্রীকে ভারী পছন্দ করতেন। তাঁরা অনর্গল শ্রীমতী পাণ্ডার সঙ্গে গল্প করে যেতেন।

ডক্টর পাণ্ডা বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে গল্প থামিয়ে হয়ত উঠে এলেন পাশের ঘর থেকে। কি, গল্প করছে ওরা এত কলরব করে, জানার কৌতূহল। কেউ কারু ভাষা জানে না, তবে কিসের আলাপন।

এক বিদেশিনীকে প্রশ্ন করে বসলেন, কি এত কথা হচ্ছে তোমাদের, কেউ তো কারু ভাষা বোঝ না ?

বিদেশিনীর উত্তর, আমরা হৃদয়ের ভাষায় কথা বলছি। ও ভাষা সব দেশের সব মানুষেরই এক। বুঝতে কোনো অসুবিধেই নেই।

সাবাস, বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন ডক্টর পাণ্ডা।

সেই চির কর্মব্যস্ত অসাধারণ আনন্দময় মানুষটি হঠাৎ ধাক্কা খেলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ডাক্তার রায় দিলেন, ব্যাধি দুরারোগ্য। অপারেশান ইত্যাদি করে কিছুকাল হয়তো অনিবার্য মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায়।

অতএব কয়েকবার ছুরি চালানো হলো মুখের মধ্যে। নিচের চোয়াল বাদ চলে গেল। একেবারে পালটে গেল মুখ। কিন্তু হার মানার পাত্র নন ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। মুখের অনাবিল হাসিটুকু এখন খেলা করতে লাগল দুটি চোখের তারায়। কণ্ঠস্বরে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

চিঠি আসতে লাগল বন্যার স্রোতের মতো। উদার আমন্ত্রণ। নবকলেবর ধারণ করেছি, তোমরা দেখে যাও।

মৃত্যু শিয়রে জেনেও নিজেকে নিয়ে সেই আগের মতই রঙ্গরসিকতা। বেদনার্ত স্ত্রীর মুখে একটুখানি হাসি ফোটাবার জন্য কত প্রয়াস, কত ছলনার জাল বোনা।

কেবল একটি কথা মনে হলেই অদম্য মানুষটি কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। এত কাজ শুরু করেছেন, একি তিনি শেষ করে যেতে পারবেন! তাই আরও বেশী সময় দিতে লাগলেন কাজে। পর পর কয়েক ভলিউম বই বেরিয়ে গেল। কি গভীর আনন্দের ছবি তখন খেলা করতে লাগল তাঁর চোখের তারায়!

শুরু হল যন্ত্রণা। দেহ, মন দুটোকেই আক্রমণ করে বসল। দেহের যন্ত্রণা হলো অসহনীয়। তার ফলে লেখার গতি হলো মন্থর। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল মনের যন্ত্রণা। আমি চলে যাব, অথচ আমার শুরু করা কাজ থেকে যাবে অসম্পূর্ণ, এতে আমি মরেও শান্তি পাব না।

সে সময়ের একটি চিঠিতে লিখলেন, দুটি ক্যাপসুল খেলে সারাদিনে দু-ঘণ্টার মতো যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাই। একদিনে দুটির বেশী ক্যাপসুল গ্রহণ করা বারণ। বাইশ ঘণ্টা যন্ত্রণা ভোগের পর অন্ততঃ দুঘণ্টা নিশ্চিন্ত। এই অমূল্য সময়টুকু আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য নিদ্রার প্রলোভন আর ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। কিন্তু আমি ঐ দুটি ঘণ্টা সময়কে যখের ধনের মতো আগলে রাখি। এখন সময় যে আমার কাছে কতখানি দামী তা হীরে মণি মাণিক্য আর সোনাদানা দিয়ে বোঝানো যাবে না। ঐ সময়টুকু আমি নিবেদন করি দেবী সরস্বতীর বন্দনায়। কি হবে আমার ঐটুকু নিদ্রায়। কাজগুলো দ্রুত শেষ করে একেবারে ঘুমবো। যন্ত্রণাহীন অনন্ত নিদ্রা। তখন তোমাদের কারু ডাকে আর জেগে উঠব না।

সেদিন দয়ালজীর বসার ঘরে ঢুকে দেখি প্রায় একইরকম দেখতে তিনজন অবাঙালী ভদ্রলোক বসে দয়ালজীর সঙ্গে কথা বলছেন। দয়ালজী দারুণ খোসমেজাজে গল্প করছেন আর ওঁরা তিনজন উত্তর দিচ্ছেন বিনয় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে।

ওঁদের বোধহয় চলে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি চেয়ারে বসার সঙ্গে-সঙ্গেই ভদ্রলোকেরা উঠে দয়ালজীর পায়ের ধুলো নিলেন, তারপর বাইরে

বেরিয়ে গেলেন।

আমি বললাম, দাদা এই তিন ভদ্রলোকের নিশ্চয় কোনো রক্তের সম্পর্ক আছে।

উনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি করে বুঝলেন ?

তিনজন প্রায় একইরকম দেখতে, বয়সের কিছু কিছু তফাৎ আছে।

ঠিকই ধরেছেন, ওরা তিন ভাই। এদের একটু ইতিহাসও আছে।

টুকরো ইতিহাসটুকু শোনার জন্যে আমি দয়ালজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

দয়ালজী বললেন, এখন ভারতের প্রায় সব বড় বড় শহরে এই তিনটি ভাইয়ের বইয়ের দোকান। আগ্রাতে হোটেলও করেছে ওরা। এক ভাই থাকে আগ্রায়, আর এক ভাই আসামে, ছোট ভাই থাকে বম্বেতে। ওরা তিন ভাই কিন্তু সবকটা দোকানে ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম দেখাশোনা করে।

ওঁদের দেশ কোথায় ? ওঁরা কি আপনার স্বজাতীয় ?

হাঁ ওরাও ক্ষেত্রী। পার্টিশানের পর মুলতান থেকে চলে আসে। একদিন তিন ভাই আমার কাছে এসে হাজির। বলল, আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে চাচাজী।

আমি দয়ালজীকে বললাম, এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয়ের সূত্রটা কি ?

দয়ালজী বললেন, আমি যখন রুমাল বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াতাম তখন ওদের সঙ্গে পরিচয়। ওদের চাচার দোকান ছিল মুলতানে। সেখানে আমার রুমাল রাখত ওরা। সেই দোকানেই আমি ওদের তিন ভাইকে দেখেছি। তখন বয়স অল্পই ছিল।

একটু থামলেন। মনে হলো দয়ালজী স্মৃতির পর্দায় পুরোনো দিনের ছবি দেখছেন। আবার বলতে লাগলেন, ঐ পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরেই ওরা তিনটি ভাই আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। ওদের বললাম, বল আমি তোমাদের কী সাহায্য করতে পারি ?

ওদের বড়ভাই বলল, বিশ হাজার টাকা ক্যাশ আর তিন মাসের ক্রেডিটে বিশ হাজার টাকার বই চাই।

ওদের এই সোজাসুজি কথা বলার ধরন আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি যখন ওদের চাচার দোকানে যেতাম, তখন ওরা আমাকে কি করে যে খাতির করবে তা বুঝে উঠতে পারত না। এদিক ওদিক দৌড়ে তিনটি ভাই-ই মেঠাই, শরবৎ আর মিঠে পান এনে দিত।

আমি ওদের বললাম, বেশ তাই পাবে তোমরা। মন দিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু কর।

ওদের বড়ভাই বলল, চাচাজী আপনাকে আর একটা অনুরোধ করি।

বল।

ও বলল, আমাদের লাভের হাফ শেয়ার আপনাকে নিতে হবে। এটা লেখাপড়ার ভেতর থাকবে। দোকান যদি কখনো বড় হয় তাহলেও আপনি

লাভের হাফ-শেয়ার পেয়ে যাবেন।

আমি রাজী হলাম না। এখন ওরা ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছে। কিন্তু আমার প্রথম দিনের সাহায্যের কথা ওরা ভোলেনি। বছরে একবার কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

আমি হাসতে হাসতে আজই ওদের বলছিলাম, কেন সেদিন হাফশেয়ার নিতে চাইনি বল তো ?

ওরা হেসে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

তাহলে আজ যে সম্ভাবটুকু তোমাদের সঙ্গে আছে, সেটা আর থাকত না। তোমরা এমন করে বছরে একবার চাচাজী বলে আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসতে না। ভাবতে, একটা দলিলের বলে চাচাজী আজ বসে বসেই লাখ লাখ টাকা পাচ্ছে। আমি তোমাদের এই ভালবাসাটুকু কোটি টাকার চাইতে দামী বলে মনে করি।

একবার এই সুন্দর মানুষটিকে আমি ভয়ংকর রুদ্র হতে দেখেছিলাম। তখন কালী পুজোর চাঁদা আদায়ের খুব দাপট ছিল। এক একটা বিশেষ দল আশপাশের দোকানদারদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে অনেক টাকা তুলত।

তখন চারটে। আমি বসেছিলাম ওঁর কাছে। জনা পাঁচেক মস্তান টাইপের লোক কর্মচারীদের বাধা না মেনে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল দয়ালজীর ঘরে।

দয়ালজী অবাক হয়ে তাকালেন ওদের দিকে।

কী চাই আপনাদের ?

কালী পুজোর চাঁদা।

আপনারা ওপরে আমার ভাইপোর সঙ্গে দেখা করুন, ও-ই আপনাদের চাঁদার ব্যবস্থা করে দেবে।

একজন রূঢ়ভাবে বলল, এ দোকানের মালিক কে ?

উনি বললেন, লোকে তো আমাকেই জানে।

একজন বলল, আবার রসিকতা হচ্ছে।

যার কাছে চাঁদার রসিদ বই ছিল সে খচখচ করে একটা অঙ্ক বসিয়ে দয়ালজীর টেবিলে ফেলে দিল। বলল, এটা চেকে নয়, ক্যাশে চাই।

আমি দেখলাম, অঙ্কটা দশ হাজার।

দয়ালজীর কপালের রেখা দু-একবার তরঙ্গিত হলো। উনি চাঁদার রসিদটাকে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, এখুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমার দোকান থেকে এক পয়সাও চাঁদা পাবে না। ভদ্রলোক ছাড়া আমি কাউকে চাঁদা দিই না।

মস্তানদের একজন খিঁচিয়ে উঠল, বলে কিরে, একে তুলে নিয়ে যাই চল।

দয়ালজী উঠে দাঁড়ালেন। হাঁক দিয়ে পাশের ঘরের একজন কর্মচারীকে বললেন, সামনের কলাপ্সিবল গেটটা বন্ধ করে দিন।

এরপর মস্তানগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, তোমরা যদি

সত্যিকারের মায়ের দুধ খেয়ে থাক তাহলে এই বন্ধ ঘরের ভেতর এই বুড়োর সঙ্গে লড়াই কর। যদি হিম্মৎ দেখাতে পার তাহলে এর ডাবুল টাকা আমি তোমাদের দেব।

বাঘের থাবার মতো দুখানা কুস্তিলড়া হাত নিয়ে চওড়া বুকওয়ালা মানুষটা ঐ মস্তানগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

গতিক যে সুবিধের নয় সেটা টের পেয়ে গিয়েছিল কাওয়ার্ডগুলো। তারা সুড়সুড় করে কোলাপসিবল গেটের দিকে এগোতে লাগল। কর্মচারীরা সঙ্গে সঙ্গে গেটটা খুলে দিলে ওরা হাওয়া হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে দয়ালজীর উত্তেজনা কমে গেল। উনি বললেন, আমি শুনেছি, প্রতিবছর এই ছোঁড়াগুলো চাঁদার অঙ্ক দ্বিগুণ বাড়িয়ে চলেছে। কেউ ভয়ে কোনো কথা বলে না। অথচ সকলেই মনে মনে ক্ষুব্ধ আর বিব্রত। একবার মনে সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারলেই এইসব মস্তানরা আর কাউকে কোনোদিন ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

সেদিন দয়ালজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাস ধরব বলে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি এমন সময় দেখি আমার এক পুরানো বন্ধু হেঁটে চলেছে।

দেবপ্রিয়! দেবপ্রিয়!

প্রেসিডেন্সীর দিকের ফুটপাথ ধরে ইউনিভারসিটির দিকে হাঁটছিল যে মানুষটি সে থমকে দাঁড়াল। আমি ট্রাম লাইন পেরিয়ে গিয়ে দেবপ্রিয়কে ধরলাম। ও একমুখ হেসে আমার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল।

কোথায় ছিলি তুই এতদিন? সেই যে শিয়ালদা স্টেশানে শেষবারের মতো দেখা, তারপর একদম হাওয়া!

তুই কেমন আছিস রঞ্জন?

দেখে কি বুঝছিস?

দেবপ্রিয় হেসে বলল, ঠিক আগের মতো, একটুও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু করছিস কি?

একটা কলেজে ঢুকে পড়েছি। মোটামুটি অন্নসংস্থান হচ্ছে। এখন বল, কোথায় চলেছিস?

জি. সি. লাহায় কিছু রঙ তুলি কেনার মতলব।

ছবি আঁকা-টাকা বেশ চলছে বল?

কেন, দেখিসনি? বছর দুয়েকের ভেতর কয়েকটা এগজিবিশান হয়ে গেল, কাগজেও বেরিয়েছিল।

ভাই নানা ধান্দায় ঘুরি, কাগজ আর খুঁটিয়ে পড়া হয় কই।

দেবপ্রিয় বলল, তুই এখন যাবি কোন দিকে?

এই কাছেপিঠে কোন একটা শাড়ির দোকানে ঢোকার মতলব ছিল। বউ দুদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছে।

তোর বউয়ের পতিভক্তির প্রশংসা করতে হয়, নিজের শাড়ি নিজে না কিনে তোর পছন্দের ওপর ভরসা করে বসে আছে।

বললাম, তাহলেই হয়েছে আর কি ! এটি আসলে পাড়ার একটি পরিচিত মেয়ের বিয়ের জন্য বরাদ্দ শাড়ি। সে যা হোক, কতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কি কথা হয়। চল, 'ওয়াই. এম. সি. এ.'-র রেস্টুরেণ্টে বসে আড্ডা মারি।

দেবপ্রিয় কাজের অজুহাত দেখাল না, সোজা আমার সঙ্গে রেস্টুরেণ্টে ঢুকে পড়ল।

দুজন মুখোমুখি বসেছি। দু'প্লেট খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। দেবপ্রিয় তার ছবির কথা বলে চলেছে। আমি শুধু চেয়ে আছি দেবপ্রিয়ের মুখের দিকে। কি আশ্চর্য পরিবর্তন ! শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তখন বিধ্বস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত এক যুবককে শেয়ালদা স্টেশানে ট্রেনের অপেক্ষায় দেখেছিলাম। আজ দেবপ্রিয়ের দিকে তাকিয়ে খুশী আর তৃপ্তিতে মনটা ভরে উঠল। ঝকঝক করছে মুখ, মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই। কথাবার্তায় যে অসংলগ্ন ভাবটি দেখেছিলাম তা এখন একেবারেই অনুপস্থিত।

খাবার আর কফি দিয়ে গেল বেয়ারা।

খেতে খেতে কথা হচ্ছে। বললাম, ছবি নিয়ে মেতে আছিস না কিছু কাজকর্মও চলছে ?

দেবপ্রিয় বলল, আর্ট ইণ্টারন্যাশনালের ডিজাইন সেকশানে রয়েছি। তাছাড়া ছবি আঁকার ভূত সারাক্ষণ মাথায় চেপে বসে আছে। যা রোজগার করি তার অনেকটাই খরচ হয়ে যায় ছবির সরঞ্জাম আর আর্টবুক কেনায়।

কথায় কথায় ও বিদেশী আর্টিস্টদের প্রসঙ্গ এনে ফেলল। তাঁদের এক একজনের আঁকার রীতিপদ্ধতি, রং ব্যবহারের কৌশল, ভাবনার গভীরতা ইত্যাদি নিয়ে ক্রমাগত বলে যেতে লাগল। আমি গালে হাত ঠেকিয়ে মুগ্ধ শ্রোতার মতো চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। ও আমার মতো একজন উৎসুক শ্রোতা পেয়ে ওর শিল্প-ভাবনার ঝুলিটিকে উজাড় করে দিতে লাগল।

আমি চেয়েছিলাম ওর দুটো চোখের দিকে। দু'চারটে কথা কানে বাজছিল, কিন্তু আমার মন চলে গিয়েছিল স্মৃতির পুরানো পথ ধরে। দেবপ্রিয়ের আজকের এই উজ্জ্বল স্বপ্নালু দুটো চোখে সেদিন ঝড়ের মুখে পড়ে যাওয়া অসহায়, দিগ্‌ভ্রান্ত একটি পাখির চোখের ছায়া দেখেছিলাম। কি হতাশ, ভয়ার্ত সে চোখের চাহনি !

বি. এ. অনার্সে কয়েকটামাত্র নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাশটা পেল না দেবপ্রিয়। আমরা অনেক বোঝালাম কিন্তু ও কিছুতেই এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলো না। বলল, যে কোন রকম একটা ফার্স্ট ক্লাশ আমার চাই।

অসাধারণ আঁকার হাত ছিল ওর। ঢুকে পড়ল আর্ট কলেজে।

হাঁ, তার কথা রেখেছিল দেবপ্রিয়। ফার্স্ট হতে পারেনি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিল সে ফাইন আর্ট-এ। সে সময় আমরা ক'বন্ধু ওকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, আর উপহার দিয়েছিলাম, একটা পেখম মেলা পেতলের ময়ূর।

তারপর যে যার চাকরির ধান্দায় ঘুরে বেড়িয়েছি। মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে পরস্পরে। সংবাদ বিনিময়ের পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি আবার। কেউ কিছু একটা পেয়ে গেলে নিজেদের হতাশা ভুলে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি আন্তরিকভাবে।

দেবপ্রিয়র সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কম ঘটত। কিন্তু দেখা হলেই তার চোখেমুখে হতাশার ছবি ফুটে উঠতে দেখতাম। চাকরি পেতে গেলে যতটা চেষ্টা চরিত্রের দরকার তা দেবপ্রিয়ের ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠত না। কাকে ধরলে কোথায় পৌঁছনো যেতে পারে, এ বোধটাই ছিল না তার। ছবি আঁকা শিখবে, এমন দু'একটি ছাত্রও সে যোগাড় করতে পারেনি।

দুচারটে ব্যানার এঁকে কয়েকটা করে টাকা পেত, তাই দিয়ে কোনো রকমে চলতে তার গ্রাসাচ্ছাদন। ছবি আঁকার তীব্র একটা ইচ্ছা বুকে চেপে বেড়াত সে, কিন্তু স্থায়ী কোনো অর্থাগমের পথ না পেয়ে তার ইচ্ছা পূরণ হতো না।

হঠাৎ একসময় একটা অদ্ভুত ভয়ের শিকার হয়ে পড়ল সে। কি করে যে তার মানসিক অবস্থা এ পর্যায়ে এসে পেঁছিল তা বোঝার মতো বুদ্ধি ছিল না আমাদের।

তার মনে হত, যে ট্রামটা সাঁ সাঁ শব্দ তুলে সারা শরীরটাকে কাঁপাতে কাঁপাতে এগিয়ে আসছে সেটা তার কাছে আসামাত্রই ওভার হেড তারটা ছিড়ে পড়বে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারবে তাকে। স্টপেজে এসে শব্দ তুলে ঝাঁকানি খেয়ে ট্রামটা থামা মাত্রই সে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠত। লোকে হুড়মুড়িয়ে ট্রামে উঠতে গিয়ে তাজ্জব বনে তাকাতো তার দিকে।

কেবল ট্রামে নয়, ট্রেনে চেপে কোথাও যাবার সময়েও ঐ একই দশা। পাশ দিয়ে কোন ট্রেন যদি বাঁশি বাজিয়ে ঝমঝম্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যেত তাহলে পাশে বসে থাকা লোকটিকে সে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে অবাক করে দিত। সেই মুহূর্তগুলি কেটে গেলে দেবপ্রিয় একেবারে স্বাভাবিক। তার আগের আচরণের জন্য মুখে ফুটে উঠবে সলজ্জ হাসি। সে পাগল নয়, তবু অদ্ভুত একটা ভয়ের শিকার হয়ে যায় মুহূর্তে। আবার মেঘ কেটে যেতেও সময় লাগে না।

একদিন পথ চলতে চলতে দূর থেকে ভেসে আসা গোলমালের একটা আওয়াজ শুনতে পেল দেবপ্রিয়। অমনি সে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা ল্যাম্প পোস্টের ধারে। হঠাৎ তার মনে হলো, কতকগুলো লোক ছোরাছুরি উঁচিয়ে তাকে ঘিরে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ ভয়ে গলা বন্ধ হয়ে গেল তার, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। ব্যস, কয়েক মুহূর্ত, তার পরেই একদম স্বাভাবিক। উঠে হেঁটে চলে গেল।

ঘুমের ওষুধ খেয়েছে সে অনেক, ডাক্তার বদ্যি করেছে সাধ্যমত। শেষে একজন বিখ্যাত মানসিক চিকিৎসককে দেখাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন দেখানোর পর একদিন ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার মনে হলো, বাড়িটা কত তলা তা তো কোনোদিন সে খেয়াল করে দেখেনি। যেই মাথা

তুলে বাড়ির ছাদ অবধি দেখতে গেছে অমনি মনে হলো সমস্ত বাড়িটা দুলছে। এখুনি ভেঙে পড়বে তার ওপর। সে অমনি মাথা চেপে একটা আর্ত চীৎকার তুলে রাস্তার দিকে ছুটে পালাল।

মনের এমনি এক অবস্থায় একবার সে যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রী দেখতে গিয়ে উত্তরকাশীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যমুনোত্রী দেখা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু গঙ্গোত্রীযাত্রা আর ভাগ্যে ঘটল না। সে যাত্রায় উত্তরকাশী ট্যুরিস্ট বাংলোর ম্যানেজার রাধাবল্লভজীর সেবায় সুস্থ হয়ে হরিদ্বারে নেমে আসতে হয়েছিল তাকে।

সেই সময় আকস্মিকভাবে শেয়ালদা স্টেশানে দেবপ্রিয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আর তার মুখ থেকেই আমি জানতে পারি তার হিমালয়-যাত্রা আর অসুস্থতার খবর।

দেবপ্রিয় আমার দিকে সুন্দর একখানা কার্ড এগিয়ে ধরতেই আমি স্মৃতির সুতোয় ছেদ টেনে ওর কার্ডখানা ধরে নিলাম। পড়ে দেখলাম, গঙ্গার উৎসমুখ থেকে সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত গঙ্গাতীরের সবকটি তীর্থভূমির ছবি এঁকেছে ও। তারই এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে বিড়লা অ্যাকাডেমীতে।

ও আমার হাত থেকে আবার কার্ডখানা চেয়ে নিয়ে বলল, তোর শ্রীমতীর নামটা বল?

বললাম, সঙ্গীতা।

ও আমার নামের সঙ্গে সঙ্গীতার নামটাও যুক্ত করল। তারপর কার্ডখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, যুগলে আসিস কিন্তু।

মাথা নেড়ে জানালাম, অবশ্যই যাব।

হঠাৎ একটা ভাবনা মাথায় এল। বলেই ফেললাম দেবপ্রিয়কে, শেষবার শেয়ালদায় তোর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তুই বলেছিলি অসুখটা হঠাৎ আক্রমণ করায় তুই আর গঙ্গোত্রী যেতে পারিসনি। উত্তরকাশী থেকে ফিরতে হয়েছিল তোকে। তাহলে তুই গঙ্গার উৎসমুখের ছবি আঁকলি কি করে?

দেবপ্রিয়ের মুখখানা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গভীর গলায় সে বলল, আমি আবার হিমালয়ের টানে ঐ অসুস্থ মন আর শরীরটাকে টেনে নিয়ে উত্তরকাশীতে পৌঁছই। সেখান থেকে গঙ্গোত্রী হয়ে গোমুখ পর্যন্ত চলে যাই।

একটু থামল দেবপ্রিয়। একসময় সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে সেই শেয়ালদা স্টেশানে দেখেছিলি আর আজ দেখলি, কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে কি?

আমি আবেগে ওর হাতখানা ধরে বললাম, তখন তোকে ঝড়ে বিধ্বস্ত একটা ন্যাড়া গাছের মতো দেখাচ্ছিল আর এখন তুই ষোল আনার ওপর একেবারে বিশ আনা ফিট। সবুজ, সতেজ একটা শালগাছ। একটুও বাড়িয়ে বলছি না ভাই, আমার কি যে ভাল লাগছে আজ তোকে দেখে কি বলব।

ও আমার হাতখানা জোর করে চেপে ধরে বলল, আমার সেই হিমালয় ভ্রমণের সংগী হয়েছিল এক দেবকন্যা। তার সান্নিধ্যে আমি আজ যেন এক নতুন মানুষ হয়ে জন্মেছি।

আমি সাগ্রহে ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকিয়ে আছি দেখে ও বলল, আজ দেখা যখন হয়েছে তখন সব তোকে বলব ভাই।

আমি সংগে সংগে খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে দেবপ্রিয়কে বললাম, এখানে আর নয়, চল কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি, সেখানে শুনব তোর দেবকন্যার কাহিনী।

আমি আর দেবপ্রিয় এক চিলতে ঘাসের জমিন খুঁজে নিয়ে বসে পড়লাম পাশাপাশি সাঁঝের বাতি জ্বলে উঠেছিল। আকাশের বুকে থমকে থাকা একটুকরো মেঘের গায়ে শেষ সূর্যের রঙটুকু তখনও মুছে যায়নি। দেবপ্রিয় শুরু করল তার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ওর কাহিনী যখন শেষ হলো তখনও আমার মনে হলো, আমি কলকাতা মহানগরীর বিশেষ এক পরিচিত জায়গায় বসে নেই। দেবপ্রির আর সেই তরুণী কন্যাটির সংগে সংগে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

দেবপ্রিয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখন প্রায় সাড়ে আটটা, শাড়ির দোকান কি আর খোলা পাবি? আমার কথা শুনতে গিয়ে বউয়ের বকুনি খেতে হবে তোকে।

বললাম, হোক, তবু এ কাহিনী না শুনলে জীবনের একটা বিশেষ অভিজ্ঞতার বস্তু অনাস্বাদিত থেকে যেত।

আমরা উঠে পড়লাম। দেবপ্রিয় আবার মনে করিয়ে দিল, শ্রীমতীকে নিয়ে আসিস কিন্তু এগার্জিবিশানে।

বললাম, অবশ্যই আসব।

বাসায় ফিরলাম প্রায় দশটা বাজিয়ে।

দরজা খুলে দিয়েই সংগীতা বলল, আমি জানতাম আজও শাড়ি আসবে না। এত দেরী দেখে ঠিকই ভেবেছি, কোথাও জমে গেছ। এদিকে সন্ধ্যায় আসবে বলে চপ ভেজে রেখেছিলাম, এখন একেবারে ঠাণ্ডা, যার যেমন কপাল।

বললাম, ঐ ঠাণ্ডাই দাও না একটা, চায়ের সংগে খাই।

এখন চা, কটা বেজেছে খেয়াল আছে?

বললাম, চয়ের কোনো সময় অসময় নেই।

সংগীতা বলল, আমি খিচুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছি, ঐ চপগুলো গরম করে দেব, তখন খাবে। কিন্তু কি এমন গল্পে তুমি মজে গেলে যে এত রাত হলো?

বললাম, সে গল্প এত সহজে শোনা যাবে না। আমি হাত মুখ ধুয়ে এসে বসছি তোমার রান্নাঘরে, প্লেটে তুলে একটু করে খিঁচুড়ি দেবে আর আমি গল্প বলতে থাকব। রাত কাবার হয়ে যেতে পারে কিন্তু।

এমন কি গল্প গো?

শুনলেই বুঝবে।

আমি হাত মুখ ধুয়ে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলাম রান্নাঘরের দরজার পাশে। সংগীতা আমার হাতে এক কাপ চা আর একটা গরম চপ ধরিয়ে দিয়ে বলল, খাও। খিঁচুড়ি কিন্তু সেই রাত এগারোটায় পাবে।

'তথাস্তু' বলেই চপে একটা কামড় দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, আমার এক বন্ধুর কথা একসময় বলেছিলাম তোমাকে, যে নানা রকম ভয়ের শিকার হয়ে যেত। মনে আছে তার কথা ?

হাঁ হাঁ, সেই যে ট্রামের ওভার হেড তার ছিঁড়ে পড়বে মনে করে···।

ঠিক বলেছ। এতদিন পরে সেই দেবপ্রিয়র সঙ্গে দেখা। সেই অসুখের চিহ্নমাত্র নেই। একেবারে সকালের আলোর মতো ঝকঝক করছে।

কোন চিকিৎসায় ভাল হলো ?

না, কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় নয়।

তবে ?

সেটাই তো গল্প। একবার দেবপ্রিয় হিমালয়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন উত্তরকাশীর ট্যুরিস্ট বাংলোর ম্যানেজার তাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আবার যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল আর জীবনটা অসহ্য বলে মনে হলো তার তখন সে গঙ্গোত্রী আর গোমুখ যাবার পরিকল্পনা করে উত্তরকাশীর সেই ম্যানেজার রাধাবল্লভ যোশীকে চিঠি লিখল।

যোশীজী সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দিয়ে জানালেন, নির্ভাবনায় চলে আসুন, দেবভূমির হাওয়ায় সব রোগই নিরাময় হয়ে যাবে।

চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে অদ্ভুত একটা বল পেল দেবপ্রিয়। সে চলে এল উত্তরকাশীতে।

যোশীজী তাকে সাহস দিয়ে বললেন, চলে যান গোমুখ অবধি কোনো ভাবনা নেই।

গঙ্গোত্রী থেকে এতখানি পথ পায়ে হেঁটে একা যেতে হবে ভেবে চিন্তায় পড়ল দেবপ্রিয়। যোশীজী বললেন, আবার কি ভাবছেন ?

দেবপ্রিয় সোজাসুজি বলে ফেলল তার অসুবিধের কথা। একা চলতে চলতে খাদের দিকে তাকাতে গিয়ে যদি অসুখটা ধরে ফেলে।

যোশীজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভাবনা নেই, গাইড দিয়ে দেব।

ভোরবেলা গাড়ি ছেড়েছিল গঙ্গোত্রীর যাত্রী নিয়ে।

দেবপ্রিয় যাত্রার কয়েক সেকেণ্ড আগেও জানত না কে তার গাইড। গাড়ি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার পাশে খালি সীটটাতে এসে বসেছিল যে মেয়েটি তার দিকে খানিকসময় বোকার মতো চেয়েছিল দেবপ্রিয়।

মেয়েটি মিষ্টি এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে বলেছিল, আপনিই তো মিঃ দেবপ্রিয় চৌধুরী। যোশী সাহেব আমাকে আপনার গাইড নিযুক্ত করেছেন। আমি মালবী অগ্নিহোত্রী। আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন।

সহাস্যে মাথা নেড়েছিল দেবপ্রিয়।

ঝকঝকে তরুণী, উজ্জ্বল মুখচোখ। চিবুক আর ঠোঁটের রেখায় অদ্ভুত একটা প্রত্যয়ের ছাপ। প্রায় সমবয়সী। আলাপ জমে উঠতে কিংবা আপনি থেকে তুমিতে নামতে খুব বেশী সময় লাগেনি।

প্রকৃতির টুকরো টুকরো ছবি দেখতে দেখতে, হাল্কা হাসি আর কথার জাল বুনতে বুনতে ওরা লংকায় এসে পৌঁছেছিল।

দীর্ঘ পাহাড়ী পথ পার হতে একটুও ক্লান্তি বোধ করেনি দেবপ্রিয়। আপন জনের মতো আলাপে গানে মালবী ভরিয়ে রেখেছিল সারাটা পথ।

মালবীর এই স্বচ্ছন্দ মেলামেশাই শামুকের মতো গুটিয়ে থাকা দেবপ্রিয়ের মনে ধীরে ধীরে একটি নিটোল মুক্তোর জন্ম দিয়েছিল।

লংকায় বাস থেকে নেমে পড়েছিল মালবী। বলেছিল, এসো, চড়াই উৎরাই করে আমরা ভৈরব ঘাটি পার হই।

দারুণ প্রস্তাব, বলতে বলতে জুতোয় আওয়াজ তুলে উৎরাইতে নেমে পড়েছিল দেবপ্রিয়।

বড় বড় পাইনের ভেতর দিয়ে ছায়ামাখা পথ। দু'এক টুকরো আলোর কুচি ছড়িয়ে পড়েছে এখানে ওখানে। নির্জন পথে শুধু দুজনের পদশব্দ।

একটা বাঁক ঘোরামাত্রই চমৎকার একটি দৃশ্যের সঙ্গে কিছু শব্দ ভেসে এল। মালবী থমকে দাঁড়াল। হাওয়ায় উড়ছিল তার উত্তরীয়। নীল একটা জলধারা দুরন্ত গতিতে বয়ে আসছিল পাইন অরণ্য চিরে।

মালবী নিচের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ ভাগীরথীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীলবসনা সুন্দরী।

মালবীর মুখ থেকে খসে পড়া শব্দ ক'টা অদ্ভুত এক যাদুর জগৎ সৃষ্টি করে দিল। পাহাড়ে পাহাড়ে, পাইনের বনে, জলে স্থলে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল সে শব্দ-তরঙ্গ। দেবপ্রিয় অনুভব করল, তার রক্তের ভেতর ভরা কোটালের জোয়ার ঢুকে পড়েছে।

মালবী সেই মুহূর্তে দেবপ্রিয়ের চোখে মুখে কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে থাকবে, সে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলেছিল, চল আমরা ব্রীজ পেরিয়ে ওপারে যাই।

দেবপ্রিয়ের মনে হচ্ছিল যেন তার হাতের ভেতর মালবীর হাতের উত্তাপ-টুকু ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে। সে উত্তাপ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল তার সারা শরীরে।

এমনি একটা অনুভূতি হয়েছিল দেবপ্রিয়ের চিরবাস পেরিয়ে যাবার সময়ে। চির-পাইনের বনরেখা সেখানে ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছিল খাদের মধ্যে। দুরন্ত গতিতে বয়ে চলেছিল ভাগীরথী। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো, পুরো খাদটা উঠে এসেছে ওপরে। তার সামনেই চির-পাইনের বন। ভাগীরথী নুড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে ছুটে চলেছে। সে জলে পা ডোবাবে বলে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি চীৎকার করে পেছন থেকে তাকে টেনে ধরল মালবী। সে সেই মুহূর্তে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে

ফেলেছিল। মালবীর দুটো হাতের ভেতর সে বন্দী হয়েছিল কতক্ষণ। মালবীর সারা শরীর কাঁপছিল তখন। কিন্তু কেন? মুহূর্তকাল আগে সে খাদে পড়তে যাচ্ছিল, সেই উত্তেজনাই কি মালবীর শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল, না অন্য কিছু?

অপরাহ্ণের শেষ উত্তাপটুকু ঢেলে দিচ্ছিল বিদায়ী সূর্য। চলে যাবার আগে চরাচরের বুক থেকে মুছে নিতে চায় মৃত্যুর শীতলতা। কিন্তু গাঢ় অন্ধকার একটু পরেই শবের দেহে বিছিয়ে দিল শেষ আস্তরণ। দেবপ্রিয়ের মনে হলো ধীরে ধীরে সে একটা শবে পরিণত হতে চলেছে। বরফের তৈরী একটা মূর্তি।

ঠিক এমনি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিং' সে ভুজবাসে গভীর রাতে। লালবাবার আশ্রমে কোনো ঠাঁই ছিল না। সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোর কাজ শেষ হয়নি। ছাদ ঢালাই হলেও খাঁ খাঁ দরজা জানালা। তবু আশ্রয় নিয়েছিল ওরা দুজন সেই বাংলোতে। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। বরফে ঢাকা পাহাড় পর্বত। সামনে তুষার-শুভ্র ভাগীরথী পিক। গোমুখ থেকে বরফের চাঙড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে জলধারা, ছুটে চলেছে গঙ্গোত্রীর দিকে। বিকেলের শেষ আলোয় গোমুখের জল স্পর্শ করেছিল ওরা।

সন্ধ্যে থেকে ঝড়ের শন শন আওয়াজ। বরফের ঝড়, কি জলের পশলা নিয়ে হাওয়ার হাঁকাহাঁকি তা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে প্রচণ্ড শীতে হাড়মজ্জা জমে যাবার যোগাড়।

মাঝরাতে শুরু হলো কাঁপুনি। দেবপ্রিয়ের মনে হলো, কতকগুলো তীক্ষ্ম ছুরি কে যেন গেঁথে দিয়েছে তার শরীরে। সমস্ত শরীরটা নিথর হয়ে যাবার আগে আক্ষেপে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মালবীর। সে দেবপ্রিয়ের অবস্থাটা মুহূর্তে বুঝে নিয়েছিল। নিজের কম্বল খানা প্রথমে জড়িয়ে দিয়েছিল দেবপ্রিয়ের গায়ে, কিন্তু তাতেও বাগ মানেনি কাঁপুনি। দাঁত দাঁত লেগে যাচ্ছিল তার। অসাড় হয়ে আসার আগে সারা শরীরটা খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল।

মালবী সেই মুহূর্তে তার বুকের সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দিয়েছিল দেবপ্রিয়ের নিথর হয়ে আসা শরীরে। নারীর সংকোচ লজ্জার কথা ভাবার সময় ছিল না তখন মালবীর।

আশ্চর্য সম্মোহন ছিল সে স্পর্শে। একটা অদ্ভুত উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল দেবপ্রিয়ের দেহের অণুতে পরমাণুতে। অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল মালবী।

ফিরে আসার পথে গঙ্গোত্রীর শিলাস্তূপে হাত ধরাধরি করে বসেছিল দুজনে। প্রবল উচ্ছ্বাসে সূর্যকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল গঙ্গা। কুয়াশার সৃষ্টি করছিল রাশি রাশি বায়ু তাড়িত জলকণিকা। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুঁয়ে জেগে উঠেছিল ইন্দ্রধনু।

দেবপ্রিয় মালবীর হাতখানা নিজের ললাটে ছুঁইয়ে নিয়ে বলল, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার সমস্ত অসুস্থতা চিরদিনের মতো নিরাময় হয়ে গেল মালবী।

হাত সরিয়ে নিল না মালবী, শুধু বলল, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা দেবপ্রিয়।

সেই মুহূর্তে নিজের প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি দেবপ্রিয়। সে মালবীর হাতে চুম্বন এঁকে বলল, এ দুটি হাতকে কি আমি চিরদিনের করে ধরে রাখতে পারি না মালবী ?

কথা কটি উচ্চারণ করে আবেগে কাঁপছিল দেবপ্রিয়।

মালবী অতি কোমল গলায় বলল, তুমি আমার পথিকবন্ধু। দেবপ্রিয়, সারা জীবন তোমাকে আমি ভুলব না। সেবাব্রতকে আমার ধর্ম করে নিয়েছি, সংসারের নীড় রচনা আমার জন্য নয়।

হরিদ্বারের বাস ধরে চলে যাবার সময়ে মালবী দেবপ্রিয়ের হাত ধরে আবার বলেছিল, আমাকে বন্ধু বলে মনে রেখ। তীর্থের দেবতা তোমাকে সুস্থ করে তুলুন, এই প্রার্থনা জানিয়ে যাব চিরদিন।

নিজেকে সেই মুহূর্তে বড় ছোট বলে মনে হলো দেবপ্রিয়ের। পাহাড়ী শহরে তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বলে উঠেছে। দেবপ্রিয় পায়ে পায়ে এসে ঢুকল ট্যুরিস্ট বাংলোতে। সে মালবীর সঙ্গে হরিদ্বারেই নেমে যেতে পারত কিন্তু যেতে পারল না। তার মনে হলো যোশীজীকে তার অপরাধের কথা না বলে সে কোথাও যেতে পারবে না।

অফিস ঘরে যোশীজী ছিলেন না। সে খোঁজ নিয়ে জানল, বাংলোর সংলগ্ন কোয়ার্টারে গেছেন তিনি। উত্তেজনা তখন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল দেবপ্রিয়কে। সে অফিস ঘরে অপেক্ষা না করে চলে গেল ম্যানেজারের কোয়ার্টারে।

বসার ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন যোশীজী। দেবপ্রিয়কে দেখে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে আসুন আসুন। আরও আগে এক্সপেক্ট করছিলাম। মালবী হরিদ্বারে নেমে গেছে নিশ্চয়ই।

মাথা নেড়ে দেবপ্রিয় জানাল, যোশীজীর অনুমান সত্য।

তবে আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা না করে উত্তরকাশী ছাড়বেন না তা আমি জানি।

কথা কটি বলেই রাধাবল্লভজী অন্দরে ঢুকে গেলেন। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বললেন, আজ আপনি আমার অতিথি, এই ঘরেই থাকবেন। সারা বাংলো ট্যুরিস্টে বোঝাই।

রাধাবল্লভজীর কাছে কথাগুলো না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিল না দেবপ্রিয়। উদ্‌ভ্রান্ত চোখমুখের ছবি।

আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। না বলে শান্তি পাচ্ছি না।

রাধাবল্লভজী কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন দেবপ্রিয়ের মুখের দিকে।

আমি জানি আপনি কি বলতে চান।

আশ্চর্য হলো দেবপ্রিয়। মালবী তারই চোখের সামনে বাসে উঠেছে। বাস

ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে হাতখানা বের করে পতাকার মতো নেড়েছে কয়েকবার, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়ের বাঁকে। তার সঙ্গে যোশীজীর তো কোনভাবেই যোগাযোগ সম্ভব নয়।

দেবপ্রিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে যোশীজী মৃদু হেসে বললেন, মালবীর বিষয়ে কিছু বলবেন তো ?

সত্যি অবাক হবারই কথা দেবপ্রিয়ের। ও শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

আপনার বলার আগে আমাকে কিছু বলতে দিন, হয়ত আর কিছু বলার দরকারই হবে না আপনার। এখন কোন কিছু শুরু করার আগে আপনি হাতমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে নিন। আমি ততক্ষণ ট্যুরিস্ট বাংলোর একটু তদারকী করে আসি।

দেবপ্রিয়ের একটু হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। দারুণ একটা অপরাধবোধে ভুগছিল সে, এখন একজন সহজ অন্তরঙ্গ মানুষের সঙ্গ পেয়ে নিজেকে অনেকখানি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ফিরে এলেন যোশীজী। ঘরে ঢুকেই বললেন, কোমর অব্দি কম্বল টেনে নিয়ে খাটিয়ায় জমিয়ে বসুন। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে।

যোশীজীও তাঁর নিজের খাটিয়ায় মৌজ করে বসে কথা শুরু করলেন।

অনেক ছোটবেলা থেকেই একটা আগুনের শিখা মালবীর ভেতর দেখা যেত। মফস্বল শহরের একটা স্কুলে ঢোকার মুখে ও একদিন একটি অন্ধ ভিখিরীকে দেখতে পায়। স্কুল ছুটির পর মেয়েরা মেতে উঠল নানান খেলায় কিন্তু মালবী ছুটে গেল ঐ ভিখিরীর কাছে। সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলার চেষ্টা করছিল।

মালবী তার হাত ধরে বলল, কোথায় যাবে তুমি ?

শহরের শেষপ্রান্তে একটা খাল। খাল দিয়ে তখন আর জল বইত না, কেবল নুড়িতে ভর্তি। ঐ খালের ওপারে চাষাভুষোদের বসত এলাকা। ওখানেই একটা গাছতলায় ছিল ভিখিরীটির সংসার। সে মালবীকে তার ডেরা আর যাত্রাপথের হদিসটা দিয়ে দিল।

মালবী বলল, চল আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

গলার স্বর শুনে ভিখিরী বুঝেছে মেয়েটি ছেলেমানুষ। তাই সে কিছুতেই রাজী হতে চায় না, মালবীও নাছোড়। সে অন্ধ মানুষটিকে নুড়িভর্তি খাদটা পার করে দিয়ে আসবেই। শেষে তার জেদই বহাল রইল। সে ভিখিরীর হাত ধরে ঐ খালটা পার করে দিয়ে এল।

এরপর রোজই চলল ঐ খেলা। বন্ধুরা খেলতে ডাকলেও সে তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারত না। অন্ধটিকে সাহায্য করতে পারলে সে ভারী তৃপ্তি পেত।

কথাটা একদিন বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেল। ইস্কুলে খেলাধুলো না করে সে যে নতুন একটা কাজ বেছে নিয়েছে এজন্য প্রচণ্ড বকুনি খেতে হলো মায়ের কাছে।

রাধাবল্লভ এবার হেসে বললেন, মালবীর মুখে শুনেছি, সেদিন তাকে বকুনির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন তার বুড়ো দাদু। তিনি বলেছিলেন, বৌমা ওকে বকছ কেন? ওর ভেতর আগুন আছে। আমরা অগ্নিহোত্রী। আমাদের পূর্বপুরুষরা যুগযুগ ধরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন। মানুষ সেই পবিত্র আগুন নিয়ে গিয়ে তাদের কাজে লাগাত। কিন্তু তোমার মেয়ের ভেতর ঐ পবিত্র আগুনের ফুল্‌কিটুকু থেকে গেছে।

দু'কাপ চা নিয়ে এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর ট্রে রেখে দিয়ে দেবপ্রিয়ের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করলেন।

দেবপ্রিয় উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি নমস্কার করতেই রাধাবল্লভ বললেন, ইনি শ্রীমতী সত্যভামা, আমার সহধর্মিনী। অগ্নিসাক্ষী করে এঁকে গ্রহণ করেছি।

সত্যভামা মুখ টিপে বললেন, কি যা তা বলছ?

তুমি কি আমার সহধর্মিনী নও?

সত্যভামা সেদিক দিয়ে গেলেন না। মুখে শুধু শুধু একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। দেবপ্রিয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর পাল্লায় যখন পড়েছেন তখন গল্পে গল্পে রাত কাবার হয়ে যাবে। আমারও রান্নার কিছু বাকী আছে। আপনারা ততক্ষণ গল্পসল্প করুন।

সত্যভামা চলে গেলেন। দেবপ্রিয়ের মনে হলো, যোশী-দম্পতির সংসারটি বেশ সুখের।

রাধাবল্লভ আবার কথা শুরু করলেন, মালবীর আর একখানা কীর্তির কথা শুনুন।

তখন ও কলেজে ঢুকেছে। বান্ধবীদের সঙ্গে হৈচৈ করে ঘুরে বেড়ায়। লেখাপড়া আর খেলাধুলো দুদিকেই ওর সমান দক্ষতা। ঝকঝকে চেহারা আর স্পষ্ট পরিষ্কার কথাবার্তায় অল্প দিনের ভেতরেই ও কলেজের মধ্যবিন্দু হয়ে উঠল।

একদিন এক বান্ধবী তার গাঁয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন করল ওদের কয়েক-জনকে। সংস্কারপন্থী মা কিছুতেই একা মেয়েকে ছেড়ে দিতে চান না। বিধবার একটিমাত্র মেয়ে, কোথায় কি কথা রটবে তাই ভয় পাচ্ছিলেন। এবারও দাদুই নাতনীকে উদ্ধার করলেন। তিনি বললেন, আগুন যখন জ্বালিয়েছ মা, তখন ঘর পোড়ার ভয় পেলে চলবে কেন? যে আগুন ঘর পোড়ায় সে আগুন নইলে যে আবার চলে না। সাবধান হওয়া ভাল তবে অতি সাবধানের বিপদ কম নয়।

বান্ধবীরা জুটে হল্লা করতে করতে ট্রেনে চড়ে চলল গাঁয়ের দিকে। ট্রেন থেকে নেমে মেঠো রাস্তা ধরে, আলপথ ডিঙিয়ে, তালগাছের পাশ কাটিয়ে পুকুরপাড় বরাবর হাঁটতে লাগল ওরা।

অদূরে একটা ইস্কুল। ছেলেরা খেলা করছিল মাঠে। প্রাইমারী স্কুল-টুলই হবে। সাত আট বছরের সব ছেলে।

একদল লিলিপুট একটা কুঁয়োর ধারে কসরৎ করছিল। মালবীদের দলটা

দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেরা কুঁয়োর দড়িটা খুলে নিয়ে বালতিটা নামাচ্ছিল বলে মনে হলো।

অনেকগুলো ছেলে দড়িটাকে টেনে ধরে আস্তে আস্তে নামাচ্ছে কেন ?

হঠাৎ ঝুপ করে জলে কোনো ভারী বস্তু পড়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা। অমনি ছেলেগুলো পিলপিল করে দৌড়ে ভাগল।

মালবীরাও কুয়োর ধারে দৌড়ল। গিয়ে দেখে, ওপরে দড়ির চিহ্নমাত্র নেই, ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ ঘুরে ঘুরে উঠে আসছে।

মালবী চীৎকার করে উঠল, নিশ্চয়ই কোন একটা ছেলে জলে পড়ে গেছে, এখুনি ওকে কুয়োর থেকে তোলা দরকার, নইলে তলিয়ে যাবে।

কয়েকজন চীৎকার করে ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল।

মুহূর্তে কি হলো মালবীর কে জানে, সে তার শরীরে জড়ানো শাড়িখানা টেনে খুলে ফেলল। চর্ চর্ শব্দে দুভাগে চিরে ফেলল সেটা। পলকে দুটো ফালি পাকিয়ে গিঁট বেঁধে নিল। বন্ধুদের একটা প্রান্ত ধরিয়ে দিয়ে বলল, শক্ত করে ধরে থাক, আমি নেমে যাচ্ছি।

ব্যাপারটা যত সহজে বলা গেল, কাজটা কিন্তু তত সহজ ছিল না। অসীম মনের জোর না থাকলে শুধু শরীরের শক্তিতে একটি মেয়ের পক্ষে গভীর কুয়োর ভেতর থেকে একটা ছেলেকে পিঠে করে বয়ে আনা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ডুবন্ত একটি ছেলের জন্য তার মনের মধ্যে গভীর একটা আকুতি কাজ করছিল, তা না হলে প্রথম যৌবনে কোনো মেয়ের পক্ষেই সবার সামনে এমনভাবে লজ্জা ত্যাগ করা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

কিছুক্ষণের ভেতরই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, আর কুয়োতলায় ভিড় করে এল গাঁয়ের লোকজন।

জলে সর্বাঙ্গ ভিজে মালবীর দেহখানা তখন পাথরে গড়া একটা মূর্তির মতো হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় সে তখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। বন্ধুরা ওর কীর্তি দেখে একেবারে বিহ্বল। এতগুলো লোকের মাঝখানে মালবী তার ব্যাগ খুলে সালোয়ার কামিজ বের করল। বন্ধুদের ইঙ্গিতে বলল, তোরা আমাকে ঘিরে দাঁড়া।

পোশাক বদলে ও হাসতে হাসতে বান্ধবীদের বলল, যা একখানা এন. সি. সি. র কসরৎ করা গেল না, সরকার জানতে পারলে আমার গলায় থালার মতো একটা মেডেল ঝুলিয়ে দেবে। চল, ডেরায় পেঁৗছে গরম গরম চা খাই।

মনে হলো, নতুন কিছুই ঘটেনি, ওটা যেন মালবীর দৈনিক রুটিনের ভেতর একটা।

গ্রামের কিছু মানুষ কিন্তু এটা নিয়ে জল ঘোলা করতে ছাড়ল না। কয়েকজন গেঁয়ো বুড়ো কথাটা বলতে এসেছিল মেয়েদের। তারা বলছিল, আব্রুই মেয়েদের ভূষণ। আব্রু গেল তো রইল কি।

এসব কথায় লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, লোকগুলোকে কোন আমলই

দিল না মালবী।

দেবপ্রিয়র গলায় বিস্ময়, অদ্ভুত মেয়ে তো! একেবারে আগুন দিয়ে তৈরী। কিন্তু যোশী সাহেব, এই অগ্নিকন্যাটির সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কি করে?

সে ওর জীবনের একটা বড় রকমের উপাখ্যান। আর সেই উপাখ্যানের সূত্র ধরেই আমার সঙ্গে ওর আলাপ।

দেবপ্রিয় বিশেষ কৌতূহল নিয়ে ওঁর দিকে চেয়ে আছে দেখেই উনি বললেন, শুরু করার আগে আর একবার গলাটা ভিজিয়ে নিতে হয়।

অন্দর মহলের দিকে মুখ বাড়িয়ে হাঁক পেড়ে বললেন, অতিথির জন্যে আর এক কাপ চা পাওয়া যাবে কি?

কিছুক্ষণের ভেতরেই ধোঁয়া ওঠা দু'কাপ চা ট্রেতে বসিয়ে শ্রীমতী যোশী ঘরে এসে ঢুকলেন। মৃদু হেসে বললেন, চাটা ভাইসাহেবের দরকার না তোমার?

যোশী হেসে বললেন, শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েরই।

শ্রীমতী যোশী অন্দরে প্রবেশের আগে বলে গেলেন, তৃতীয়বার চায়ের ফরমায়েস করার আগেই রাতের খাবার তৈরী হয়ে যাবে।

যোশী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, সেবার জানুয়ারীতে প্রচণ্ড শীত। উত্তরের হাওয়ায় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ উড়ে আসছে। সন্ধ্যের মুখে আমি বাজার থেকে টুরিস্ট লজেব দিকে আসছিলাম, এমন সময় একটি উদ্‌ভ্রান্ত তরুণীকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলতে দেখলাম।

আমাকে দেখে অসংকোচে ও এগিয়ে এসে বলল, রাতের মতো একটা আশ্রয়ের খোঁজ দিতে পারেন? বেশী টাকা পয়সা কিন্তু আমার হাতে নেই। সাধারণভাবে মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই।

ওর সোজাসুজি কথা বলার ভঙ্গীতে আমি আকৃষ্ট হলাম। বললাম, দু-রকম আশ্রয়ের খোঁজ দিতে পারি আমি। একটি ব্যয়সাধ্য, অন্যটি নিখরচায়।

ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, দুটোর কোনটাই আমার চলবে না। প্রথমটিতে ঢোকার সামর্থ্য আমার নেই, দ্বিতীয়টি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বললাম, তাহলে কিন্তু এই ভয়ংকর শীতের রাতে আপনাকে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে।

ও বলল, কি আর করা যায়, ভাগ্যে লেখা থাকলে তাই হবে। এ অঞ্চলটা আমার অচেনা। বাস থেকে নেমেই হাঁটছি। একটা রাত কাটাবার মতো পাহাড়ী গুহাটুহার সন্ধান দিতে পারেন?

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, ট্যুরিস্ট লজে অনেকগুলো জায়গা খালি থাকলেও আপনাকে আমি দিতে পারব না। সে সব ঘরের চার্জ বেশী। আপনার ততখানি রেস্ত নেই। এখন আমার কোয়ার্টারে আপনার জায়গা হতে পারে। রাতটা আমায় স্ত্রীর সঙ্গে যদি এক শয্যায় কাটাতে পারেন তাহলে একটা ব্যবস্থা হয়। বিনি পয়সায় থাকতে যদি সম্মান হানি ঘটে তাহলে খাবার

সময় আপনার যথাসামর্থ্য আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে যাবেন।

ওর মুখচোখ দেখে মনে হলো, ও যেন অকূলে কূল পেয়েছে। কেবল আশ্রয় নয়, একটা ভয়হীন নির্ভরতা।

সেবার একটানা সাতদিন আমারই কোয়ার্টারে কাটাল মালবী। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভারী একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওর। মনে হলো মালবীর বিপর্যস্ত মন কিছুটা শান্তি পেয়েছে।

এই দুর্যোগটা শুরু হয়েছিল ওর এম. এ. পড়ার দিনগুলোতে। সে কাহিনী সে বলেছিল তার ভাবীজীর কাছে। এ সময়টা ওর জীবনে বড় দুঃসময় ছিল। মা আর দাদু দুবছরের ভেতরই পর পর ওকে ছেড়ে চলে যান। তবে যে দুর্যোগের কথা আমি বলছি সেটা ওর পারিবারিক কোনো অঘটন নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

রাধাবল্লভ মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, মা আর দাদুর মৃত্যুটা ওকে বড় বেশী নাড়া দিয়েছিল। ওর পারিবারিক সঞ্চয় খুব একটা বেশী না। তাহলেও সচ্ছলভাবে দিনগুলো কেটে যেত। সেদিক থেকে ওর ভাবনার কিছু ছিল না। পড়াশোনা বন্ধ করে দেবার প্রশ্নও তাই ওঠেনি।

রাধাবল্লভ একটু থেমে বললেন, ওর সঙ্গে একই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ত সরমা, ওর ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবী। পড়া শেষ করার আগেই সে একটি সুদর্শন তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার। একটা প্রাইভেট ফার্মের ছোট সাহেব।

মালবীর বাড়িটা হয়ে উঠল সরমা আর তার প্রেমিক অরুণপ্রকাশের নিভৃত আস্তানা। আর মালবীকে কেন্দ্র করেই যেন তাদের সমস্ত আনন্দের আয়োজন।

শেষ পর্যন্ত সরমা আর অরুণপ্রকাশের বিশেষ অনুরোধে ওদের ঘটকালিটা করতে হয়েছিল মালবীকেই। অবশ্য এ ব্যাপারে দুই পরিবারের সম্মতি পেতে কোনো অসুবিধেই হয়নি।

বিয়ের পর সরমাদের কোয়ার্টারে দেখা করতে যেত মালবী। দু' বান্ধবীতে মিলে পড়াশোনাও করত। দিনে দিনে সরমার ছোট্ট পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল অবিচ্ছেদ্য।

ঠিক পরীক্ষার মুখোমুখি মালবীর বান্ধবী সরমা সন্তানসম্ভবা হলো। তার আর পরীক্ষা দেওয়া হয়ে উঠল না। মালবী নানাভাবে তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নানা ধরনের কমপ্লিকেশন দেখা দিতে লাগল।

পরীক্ষা দিতে না পারায় চাপা একটা যন্ত্রণা ছিল সরমার মনে। তার ওপর শরীরের অসুস্থতা তাকে অস্থির করে তুলল।

অন্যদিকে মালবী নিজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু সরমার দেহমনের বিপর্যয়ের কথা সে ভোলেনি। এক সময় সে ভেবেছিল, একটা বছর না হয় সেও ড্রপ করবে সরমার জন্য। তাতে হয়ত সরমা মনে মনে কিছুটা শান্তি

পেতে পারে। কথাটা সে গোপনে অরুণপ্রকাশকে বলেও ছিল, কিন্তু অরুণ-প্রকাশ তার এই পরিকল্পনাকে একেবারেই আমল দেয়নি।

প্রতিদিন মালবী রুটিন মাফিক বান্ধবীর কাছে আসে। সেবায়, গল্পে তার অশান্ত মনটাকে সুস্থির করার চেষ্টা করে।

পঁচিশে ডিসেম্বর, ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে চার্চ থেকে। সরমা জন্ম দিল একটি পুত্রসন্তানের। কয়েকদিন পরে নার্সিং হোম থেকে সুস্থ শরীরে নিজের ঘরে এলো নবজাতকটি, কিন্তু জটিল স্ত্রী রোগের শিকার হতে হলো সরমাকে, সে আর ঘরে ফিরতে পারল না।

এই দিনগুলোতে নিজেকে স্থির রাখা বড় কঠিন ছিল মালবীর পক্ষে। কয়েকটা দিন সে নড়েনি নার্সিং হোম থেকে। রাতে সরমার কেবিনের পাশে নার্সের সঙ্গে চেয়ারে বসে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু এতখানি সদিচ্ছা আর সেবা দিয়েও সে ধরে রাখতে পারেনি তার বন্ধুকে।

এদিকে উদ্‌ভ্রান্ত সরমার স্বামী, অসহায় একটি শিশু। এদের লক্ষ্য করার মতো অতিরিক্ত লোকের অভাব। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠল যে মালবীকেই শেষ পর্যন্ত হাল ধরতে হলো।

মালবীর চরিত্রে একটা বড় শক্তি ছিল, যে কোনো কাজে গভীর নিষ্ঠা। সে সরমার শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। বান্ধবীর উদ্‌ভ্রান্ত স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে পাঠাতে লাগল তার রোজকার কাজকর্মে।

তিন তিনটে বছর এমনি করে কাটল মালবীর। শিশুটিও ইতিমধ্যে বড় হয়ে উঠে নার্সারীতে যেতে শিখেছে। অনেকখানি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে সরমার স্বামী। কিন্তু সমাজ ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখল না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত একজন বিপত্নীক যুবকের ঘরে একজন যুবতীর রোজ যাওয়া আসা, সে কি শুধু বান্ধবীর ছেলের টানে? এতখানি নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি সম্ভব?

সরমার বাপের বাড়ি থেকেও বিরূপ মন্তব্য শোনা যেতে লাগল। মালবীর সঙ্গে সরমার স্বামীর পূর্ব পরিচয়ের কথাও উঠল। আর কেন, পথের বাধা যখন সরে গেছে তখন ছেলেকে লালনপালনের ভণিতা না করে যুগলমিলনে বাঁধা পড়লেই হয়।

দুজনের কানেই ভেসে আসছিল কথাগুলো। সরমার স্বামী বিচলিত হয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত।

একদিন মুখোমুখি বসেছে দুজনে, ছেলেটি খেলা করছে, হঠাৎ সরমার স্বামী অরুণপ্রকাশ মুখ খুলল, আমাদের জড়িয়ে মিথ্যে রটনাগুলো তোমার কানে গেছে নিশ্চয়ই।

মালবী ছেলের হাত থেকে ফস্‌কে যাওয়া বলটা কুড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বিধাতা পুরুষ যখন দু'দুটো কান দিয়েছেন তখন না শুনে উপায় কি।

অরুণপ্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, সমালোচকদের মুখ যখন বন্ধ করা যাবে না তখন সমাধানের একটা পথ আমাদের বের করতে হবে আর সেটা যত

তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

মালবী ছেলেটির সঙ্গে খেলা করতে করতে বলল, মঙ্গল অমঙ্গলের ধারণা সবার থেকে আমার একটু আলাদা অরুণপ্রকাশ। সে যা হোক, সমাধানের কোনো সহজ পথ তুমি বের করতে পেরেছ কি ?

অরুণপ্রকাশ বলল, কয়েকদিন থেকে আমি তোমাকে একটা কথা জানাতে চাইছি কিন্তু কিভাবে সেটা জানাব তা ভেবে উঠতে পারছি না।

এবার অরুণপ্রকাশের মুখোমুখি এসে বসল মালবী। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখতে চাইছ তো ? আর এটাই তো সহজ সমাধানের পথ, তাই না ?

অরুণপ্রকাশ মাথা নেড়ে জানাল, ঠিক তাই।

মালবী বলল, যে কোনো মেয়ের পক্ষেই এই পরিস্থিতিতে তোমার মতো একটি পুরুষকে গ্রহণ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আমার ভাবনার পথটা একটু আলাদা রকম। সবার সঙ্গে সেটা মেলে না।

অরুণপ্রকাশ ওর কথাটা ধরতে পারছিল না। সে সন্ধানী চোখ মেলে চেয়েছিল ওর দিকে, যদি কোনো খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ওর মনের ভেতর-টুকু দেখে নেওয়া যায়।

মৃদু হেসে মালবী বলল, আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। সমাজের সমালোচনা কি সরমার স্মৃতিকে এত সহজে মুছে দিতে পারবে তোমার মন থেকে ?

অরুণপ্রকাশ বলল, সরমাকে আমি ভালবেসেছিলাম মালবী, তার স্মৃতি তো মোছার নয়।

তবে তুমি আমাকে গ্রহণ করতে চাইছ কেন ? এতে আমি কিংবা সরমা কেউই সুখী হব না। জীবিত অবস্থায় যে কখনো ভাবতে পারেনি তার স্বামী অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করেছে, মৃত্যুর পর তার আত্মা কি করে আমাদের মিলনকে মেনে নেবে ? তার প্রিয় বান্ধবী হয়ে কি করেই বা আমি তার আত্মাকে কষ্ট দেব! অবশ্য আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে।

অরুণপ্রকাশ কাতর গলায় বলল, ছেলেটার কথা ভেবেও কি আমার সামান্য প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া যায় না মালবী ? এতে সমাজের মুখও বন্ধ হয়ে যাবে।

ছেলের প্রসঙ্গ উঠতেই মুখখানা কেমন ম্লান হয়ে গেল মালবীর। বেশ কিছু সময় সে কোনো কথা উচ্চারণ করতে পারল না। পরে এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আয়ার সঙ্গে ওকে পার্কে পাঠিয়ে দাও। আমি একটু বেরুচ্ছি। আজ আর ফিরতে পারব না।

মুঠিতে চিবুক ঠেকিয়ে মুখ নিচু করে বসে রইল অরুণপ্রকাশ। মালবী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

তারায় ভরে ছিল বাইরের আকাশ, তবু ঝড় বইছিল। সারা রাত চোখ বন্ধ করতে পারেনি মালবী। প্রচণ্ড ঝড়ে তার ভাবনার শক্ত ভিতগুলো থর-থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

শেষ রাতে মালবী প্রার্থনায় বসেছিল। সে তার পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে বলেছিল, ঝড়ে জলে প্রবল দুর্যোগে তোমরা যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিয়ে রাখতে আগুন। সেই পবিত্র আগুন এতকাল আমি জ্বালিয়ে রেখেছি আমার ভেতরে। তোমরা আমাকে শক্তি দাও, প্রবল ঝড়েও যেন সে পবিত্র আগুনকে আমি রক্ষা করতে পারি।

পরের দিন অরুণপ্রকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মালবী। গলা একটুও কাঁপল না। মনে হলো যেন আগুনের জিভ দিয়ে ও সত্যকে উচ্চারণ করছে।

তুমি আমাকে ক্ষমা কর অরুণপ্রকাশ, তোমাকে গ্রহণ করলে সমাজের মিথ্যেটাই সত্য হয়ে উঠবে। যা সত্য নয় তাকে আমি কোনো মূল্যেই মেনে নিতে পারব না। তোমার ছেলের কথাও আমি ভেবে দেখেছি। তার প্রতি-পালনের অনেক পথই তুমি খোলা পাবে। বড় বেশী মায়ায় জড়িয়ে পড়ার আগেই আমি তোমাদের কাছ থেকে মুক্তি চাই।

মনের সেই অশান্ত অবস্থায় মালবী এসে পড়েছিল উত্তরকাশীতে। আর এই উত্তরকাশীতে তার সঙ্গে আমার দেখা হবার কথা তো আগেই বলেছি।

দেবপ্রিয় বলল, একটা কথা জানতে চাই দাদাসাহেব।

অসংকোচে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

দেবপ্রিয় জানতে চাইল, মালবী এখন কোথায় থাকে ?

রাধাবল্লভ বললেন, আমি ওকে ছোট্ট একটি নীড় রচনার কথা বলেছিলাম। একটি সুন্দর শিশুর মা হয়ে তাকে ও মনের মতো করে গড়ে তুলবে।

ও হেসে বলেছিল, দাদাজী, সমাজ সংসারের গণ্ডীতে ধরা দিতে গেলে অনেক অপ্রিয় জিনিসের সঙ্গে আপোষ করতে হয়। আমার স্বভাবের সঙ্গে ওটা মেলে না। তার চেয়ে অন্য একটা কোনো পথ দেখিয়ে দিন আমাকে যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার মনের পবিত্র আগুনটুকুকে জ্বালিয়ে রাখতে পারি।

রাধাবল্লভ বললেন, হৃষীকেশে আমার এক আত্মীয়ের ছোট্ট একখানা ডেরা ছিল। সেখানে কালেভদ্রে কেউ আসা যাওয়া করত। আমি সেখানেই ওর থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

অক্ষম তীর্থযাত্রীদের মায়ের মতো আগলে নিয়ে যায় তীর্থে তীর্থে। একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছে ওর ঘরের সামনে। তাতে লেখা আছে,—'মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে, অক্ষমেরও ডাক পড়েছে সেখানে। আমার হাতখানা শক্ত করে ধরুন, আমি আপনাকে পেঁছে দেবার চেষ্টা করব সেই আনন্দ-তীর্থে।'

দেবপ্রিয় বলল, মালবীর বিস্ময়কর চরিত্রের যে সব কথা আপনার কাছে শুনলাম, তাতে আমার অপরাধ বোধের মাত্রা বাড়ল বই কমল না। মাত্র এই চারটি দিনের সান্নিধ্যে মালবী আমাকে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ করে দিয়েছে। ফিয়ার সাইকোসিস থেকে মুক্ত হয়ে আমি এখন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। যার কাছে আমি এতটা ঋণী, আমার অপরাধের কথাটুকু তার মুখ থেকে শোনার আগে আমি আপনাকে নিজেই জানিয়ে যেতে চাই।

রাধাবল্লভজী গালে হাত ঠেকিয়ে দেবপ্রিয়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

দেবপ্রিয় গভীর গলায় বলল, আমিও মালবীর কাছে ঘর বাঁধার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একটি যুবতীর সঙ্গে কয়েকদিনের উত্তপ্ত মেলামেশার ফলে আমি ও কথা বলতে সাহসী হয়েছিলাম।

রাধাবল্লভজী বললেন, এটা একজন যুবকের দিক থেকে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

দেবপ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও যদি রূঢ়ভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করত তাহলে এতটা দুঃখ আমি পেতাম না। কিন্তু ওর প্রত্যাখ্যানের ভেতর এমন একটা সৌজন্য আর মধুর ভাব ছিল যা আমার মনের মধ্যে একটা গ্লানি এনে দিল। নিজেকে বড় ছোট মনে হলো যোশীজী।

রাধাবল্লভজী হাত নেড়ে বললেন, গ্লানি আর অপরাধের কথা আপনি ভাবছেন, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন একটা কথা ভেবে, মালবী আপনাকে মুহূর্তের জন্যেও ছোট ভাবেনি।

একটু থেমে যোশীজী বললেন, সংসারে দুরকমের আলো আছে। ঘরে যে দীপটি জ্বলে তা একটি সংসারকে আলোকিত করে, কিন্তু লাইটহাউসের আলো ঝড় তুফানের যাত্রীদের সঠিক পথের সন্ধান দেয়, তাদের রক্ষা করে বিপদের হাত থেকে। মালবী এই বাতিঘরেরই আলো, সংসার জীবন ওর জন্যে নয়।

সংগীতা বলল, সত্যি ভারী অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা হলো তোমার বন্ধুটির। আমার কিন্তু বড় ভাল লেগেছে ঐ মালবীকে। আশ্চর্য এক প্রেরণা ওকে সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ও যেন মিশর-পুরাণের সেই ফিনিক্স পাখি, যে আগুনের মাঝখানে বারে বারে নিজেকে সঁপে দেয়, আবার সেই আগুন থেকেই পুনর্জন্ম হয় তার।

একদিন ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে। আমি দয়ালজীর কাছে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। ইংরাজীর অধ্যাপক দত্তমশায় আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটি ছেলেকে বাংলা পড়াবেন?

বললাম, টিউশনি করার মানসিকতা আমার নেই স্যার। তবে আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখব।

অধ্যাপক দত্ত প্রবীণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। যদিও টিউশনিটা না করতে হলেই আমি খুশী হতাম।

শুভদিনে প্রবেশ করলাম নতুন ছাত্রের বাড়িতে। বনেদী বাড়িই বটে। আমাকে অন্তত দিন তিনেক দরোয়ানের সাহায্য নিতে হয়েছিল ছাত্রটির পড়ার ঘরে পৌঁছবার জন্যে। পরে ঘুরে দেখেছি, সারা বাড়ি একটি গোলকধাঁধা। নিচে দোকানপাট, অফিস। পাশের আর একখানা বিল্ডিং জুড়ে মেসিনপত্রের অবিরাম আর্তনাদ। মূল বাড়ির ভেতর দরোয়ান, ড্রাইভার আর কাজের লোকদের থাকার জায়গা। কমন রান্নাঘরে চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে আছে চুল্লি।

দোতলা আর তিন তলায় কর্তাদের থাকার আলাদা আলাদা প্রস্থ। তিন তলায় একখানা বড় হলঘর। পারিবারিক অনুষ্ঠান অথবা অভিনয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ছাত্রটিকে আমার ভারী ভাল লেগে গেল। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন তরুণ কিশোর, উজ্জ্বল দুটি চোখ। দার্জিলিংয়ের একটি নামকরা মিশনারী স্কুলের ছাত্র ছিল। এখন কলকাতায় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। মিশনারী স্কুলে বাংলাটা তেমন তৈরী হয়নি তাই একজন বাংলা শিক্ষকের খোঁজ পড়েছিল।

ওর মেধা এত তীক্ষ্ম ছিল যে একবার কোনো বিষয় বুঝিয়ে প্রশ্ন দিলে ও নির্ভুল এবং যথাযথ উত্তর লিখে দিতে পারত।

আমার ছাত্রটির ডাক নাম ছিল বাবু। কিন্তু তার অঙ্গে বাবুয়ানির পোশাক কোনোদিন দেখিনি। একখানা হাফ শার্ট আর হাফ প্যাণ্ট পরে ঘুরে বেড়াত সে। তাতেই তার উজ্জ্বল সুন্দর রূপটি ফুটে উঠত।

মাসের পয়লা দেখা হতো ছাত্রের বাবার সঙ্গে। বিনয়ের হাসি হেসে একখানা খাম আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে যেতেন। প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল ও বাড়িতে। দু একদিন ছাড়া সপ্তাহে প্রায় সবদিনই ভিন্ন ভিন্ন মুখরোচক খাবার আমদানি হতো। একদিন বাবুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি প্রণাম করার আগেই উনি নত হয়ে আমাকে নমস্কার করলেন।

আমার পড়ানো নাকি বাবুর খুব পছন্দ, এ কথা বলেই উনি অম্লান হাসি হেসে আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো, পান খাচ্ছিলেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন একটি প্রশস্ত ঘরে। খাবার এল। উনি পাশে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন।

খাওয়া শেষ হলে উনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পান খান?

বললাম, মাঝে মাঝে মিঠে পান কিনে খাই।

উনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্লেটে চারটে সাজা পান এনে দিলেন। মিঠে পাতা এবং সুন্দর মশলা দেওয়া।

আমি মুখে দিয়েই বুঝেছিলাম, পানগুলি সাজা হয়েছে অনেক আগে, ফ্রীজের ভেতর রাখা ছিল।

আমি পান খেতে খেতে বললাম, আপনি অনেক খাবার পাঠিয়ে দেন। ঐ খাবার কিছু কমিয়ে আমাকে বরং দুখিলি করে পান পাঠাবেন।

উনি খুব হাসলেন। বললেন, পানের জন্যে খাবার কমবে কেন। ভারী তো খাবার।

সেই আমার ওঁদের সঙ্গে প্রথম পারিবারিক আলাপ। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার স্ত্রী এবং মেয়েকে একদিন নিয়ে আসবেন।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

স্কার্ট ব্লাউজ পরা একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উনি বললেন, এটি বাবুর ছোট বোন। একেও কিন্তু আপনাকে পড়াতে হবে।

মেয়েটির নির্মল মুখে একটুকরো হাসি ফুটল। আমি কিন্তু তার চেহারায় ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম।

বললাম, সত্যি কথা বলতে কি আমি টিউশানি করি না। প্রফেসার দত্ত আপনার বাড়ির খুব প্রশংসা করেছিলেন। ওঁর অনুরোধ এড়াতে পারিনি, তাই এসেছি।

উনি বললেন, এসেই যখন পড়েছেন, তখন আপনাকে আর ছাড়া হচ্ছে না।

বললাম, বাবুকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার পরিবারের সকলকে।

একদিন নিচে নেমে গিয়ে দেখলাম, একখানা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে এক স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক গলা ছেড়ে গান গাইছেন। তাঁর হাতে দেখলাম একটি ছোট্ট রেডিও। রেডিও থেকে একটা গানের সুর শোনা যাচ্ছিল। হেমন্তের গলা। গানের কথা আর সুর আমাদের বিশেষ চেনা। হেমন্ত তাঁর দরদী কণ্ঠে গাইছিলেন, 'লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমা রে—'।

রেডিওর সাউণ্ড অস্পষ্ট করে দিয়ে ভদ্রলোক তাঁর উদাত্ত গলায় গাইছিলেন গানটি।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক সুপুরুষ কিন্তু সারা মুখে অস্পষ্ট বসন্তের দাগ। আরও বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোক অন্ধ।

আমি পাশ কাটিয়ে যাবার আগেই ওঁর গান থেমে গিয়েছিল। হঠাৎ বললেন, আজ পড়ান শেষ হয়ে গেল বুঝি ?

আমার আরও অবাক হওয়ার পালা। উনি আমাকে চিনলেন কি করে !

চোখ পড়ল গাড়ির ভেতর। বছর পনের বয়সের একটি সুশ্রী সুঠাম মেয়ে গাড়িতে বসে মুখ নিচু করে অল্প অল্প হাসছে।

মেয়েটিকে ঐ বড় বাড়ির কোথাও দেখেছি বলে মনে হলো। তাহলে নিশ্চয় ভদ্রলোক ওর বাবা কিংবা ঐ স্থানীয় কেউ হবেন। আমি যখন আসছিলাম তখন মেয়েটি ভদ্রলোককে আমার সম্বন্ধে কিছু বলে থাকবে।

এবার ভদ্রলোক বললেন, কোন দিকে যাচ্ছেন ?

আমি যাদবপুরের দিকে থাকি।

আপনার অন্য কোথাও যাবার না থাকলে আপনাকে গড়িয়াহাটের মোড় অব্দি এগিয়ে দিতে পারি। আমি ওখানেই যাব।

ড্রাইভার এসে গেল। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চলল দক্ষিণ মুখে। কথায় কথায় জানলাম ইনি 'দেবসাহিত্য কুটীরের' অন্যতম কর্ণধার সাহিত্যিক মধুসূদন মজুমদার।

ভদ্রলোক বললেন, শীতকালে একবার আমার ঘোশিডির বাড়িতে মাস-খানেক কাটিয়ে আসবেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে আর কোথাও যেতে হবে না। কুঁয়োর জল একবার খেলেই সব হজম। বারবার ক্ষিদে পেয়ে যাবে।

বললাম, বারবার ক্ষিদে পেলে তো বিপদ। অত খাবার কেনার পয়সা কোথায় ?

উনি খুব হাসলেন। বললেন, আপনি নাকি টিউশানি করতে চান না; তাহলে শুধু কলেজের মাইনেতে টাকা আসবে কি করে ?

বললাম, শান্তি তো পাওয়া যাবে। তাছাড়া আমার স্ত্রী আর একটা কলেজ থেকে সম্প্রতি কিছু রোজগার করে আনছেন। ওতেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। চাহিদা কম, তাই অল্পে তুষ্ট হয়ে আছি।

উনি এবার বললেন, আমাদের পরিবারে যখন একবার মাথা গলিয়েছেন তখন সহজে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না। এটি আমার মেয়ে। লরেটোতে পড়ছে। বাংলার ব্যাপারটা আপনাকেই দেখতে হবে। আমি যদিও লেখাজোখা করি তবু বাংলা ব্যাকরণ-ট্যাকরণ আমার তেমন আসে না। আমি প্রেসিডেন্সীতে ইকনমিক্সের ছাত্র ছিলাম। এম. এ.তে শখ হয়েছিল বাংলা নিয়ে পড়ার, কিন্তু মাঝখান থেকে বিয়ে হয়ে গেল, আর পড়া হয়নি।

আমি সসংকোচে বললাম, আপনার অন্ধত্বের কারণটা জানতে পারি কি ? এবং সেটা কতদিন হয়েছে ?

পাঁচ বছর অব্দি আমি দৃশ্যমান, চলমান জগতকে দেখেছি। আমার পরিবারের সকলের মুখ স্পষ্ট মনে আছে। তারপর স্মল পক্সে চোখের দৃষ্টি হারাই।

আপনার গানের গলা কিন্তু ভারী সুন্দর।

আমি আর হেমন্ত একসঙ্গে গান গাইতাম। হীরেনদা (হীরেন বসু) আমার কাকার ক্লাস ফ্রেন্ড। উনিই আমাকে গান শেখাতেন। এই যে একটু আগে আমি যে গানটা গাইছিলাম, ওটা তুলসীদাস ছবির গান। হীরেনদা তুলসীদাসের সব কটি গানই লিখেছিলেন। পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। হেমন্ত সবকটি গানই গেয়েছিল।

বললাম, আমার কৈশোরে তুলসীদাস দেখেছি। এমন প্রাণহরণ করা গান আমি খুব কমই শুনেছি। গান বলে গান, সারা বইটাতে যেন গানের মালা গাঁথা হয়েছে।

আমরা গড়িয়াহাট মোড়ের কাছাকাছি এসে পেঁছিলাম।

ভুলবেন না কিন্তু আমার কথা। আমার মেয়েটিকেও বাংলা পড়াতে হবে।

হেসে বললাম, যদি দেখি গোড়ায় গলদ, তাহলে থার্মোমিটারের পারদ অনেক ওপরে উঠে যাবে কিন্তু।

মেয়েটি হেসে উঠল।

ও যে আমার কথাটাকে ধরতে পেরেছে সে কথা ভেবে আমি খুব খুশী হলাম। দেখলাম, ভদ্রলোকও প্রখর বুদ্ধিমান। বললেন, সরস্বতীকে ঘরে আনতে গেলে অনেক সময় রুপোর টাকায় তাঁর আসার পথটি বাঁধিয়ে দিতে হয়।

হেসে বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার অর্থের প্রয়োজন থাকলেও আমি অর্থপিপাসু নই।

নবকল্লোল পত্রিকার প্রথম শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল।

একদিন আমি বাবুকে পড়াচ্ছি, এমন সময় ওর বাবা ক্ষীরোদবাবু আমাকে হাত-ইশারায় বাইরে ডাকলেন।

আমি কাছে গেলে বললেন, শুনেছি আপনি পত্রপত্রিকায় লেখাজোখা করেন। গল্প, উপন্যাস কিছু হাতে আছে?

আমি বললাম, ছোট্ট একটি উপন্যাস সবে শেষ করেছি।

কিসের ওপর লেখা?

কার্শিয়াং-এর পটভূমিতে লেখা নিটোল প্রেমের উপন্যাস।

প্রেমের উপন্যাস, আজই দিন মশাই। নবকল্লোলের প্রথম শারদীয় সংখ্যা বেরুবে। ওতে আপনার লেখাটি দিতে চাই।

সবিনয়ে বললাম, কাল এনে দেব।

উনি বললেন, ভুলবেন না যেন, সময় হাতে নেই।

সেই আমার প্রথম উপন্যাস 'ভোরের রাগিণী' নবকল্লোলের প্রথম শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। এরপর প্রায় প্রতিটি শারদীয়তে বেরুতে লাগল আমার একটি করে উপন্যাস। তারাশঙ্কর, বনফুলের মতো প্রবাদ-প্রতিম লেখকদের সঙ্গে একই পত্রিকায় আমার লেখা নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকায় আমার সাহিত্য জীবনের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

ইতিমধ্যে গোলপার্কে আমি একটি ছোট্ট বাড়ি তৈরী করে উঠে এসেছি। তিন তলাটি জুড়ে একটি ছোটখাটো হলঘর। ঐ ঘরেই একবার গানে গানে বসন্ত-বন্দনা হল। আমি কৃষ্ণচূড়ার ফুলেভরা বড় একটি ডাল সংগ্রহ করে-ছিলাম। ওটি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল হলঘরের একটি কোণে। তারই পাশে চৌকিতে পাতা হয়েছিল সেদিনের অনুষ্ঠানে যিনি পৌরোহিত্য করবেন তাঁর আসন।

'দেবতাত্মা হিমালয়ের' স্বনামধন্য লেখক সেদিন স্নেহের টানে এসেছিলেন আমার গৃহে। আমরা প্রবোধকুমার সান্যাল মশায়কে বরণ করে নিয়ে গিয়ে বসালাম ঐ আসনে। গানের মাঝে মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন তিনি। প্রবোধকুমারের গভীর গলায় একটা যাদুর স্পর্শ ছিল। সেদিনের অনুষ্ঠানটি তাই স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল।

আবৃত্তিতে যাদু ছিল আর একজনের কণ্ঠে। অত্যন্ত পরিশীলিত উচ্চারণ তাঁর। তিনি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। একদিন একটি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন তিনি। সংগীতা গান গেয়েছিল। ফেরার পথে একই গাড়িতে আসছিলাম আমরা। তিনি সংগীতার গানের প্রশংসা করে বললেন, কণ্ঠসম্পদ তোমার চেয়ে কারু কারু বেশী থাকতে পারে, কিন্তু গানের ভেতর আত্ম-নিবেদনের ভাবটি তোমার যেমন আছে, অন্য অনেকের তা নেই। তবে ঐ সভায় দু'চারখানা গান শুনে মন ভরল না।

আমি বললাম, একদিন আসুন স্যার আমার বাড়ি।

কোথায় তোমার বাড়ি ?

গোলপার্কের কাছে ব্যাণ্ডবক্সের দোকান। ওর গা ঘেঁষে যে গলি, তারই ভেতর বাঁ দিকে চতুর্থ বাড়ি।

ডক্টর রায় বললেন, ও গলির নামও তো গড়িয়াহাট রোড।

বললাম, ঘটি না ডুবলেও ওটা তালপুকুর। এককালে প্লটটা গড়িয়াহাট রোড সংলগ্ন ছিল, তাই পরবর্তীকালে গলিটা তৈরী হবার পরেও ঐ বড় রাস্তার নামেই থেকে গেছে।

আমি ঐ গলি চিনি। অনেকসময় রিক্শো করে ঐ গলি দিয়ে গড়িয়াহাট মার্কেটে যাই।

সংগীতা আমাকে বলল, তুমি গিয়ে একদিন ওঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে এসো।

একদিন নীহাররঞ্জন এলেন। সঙ্গে এলেন সস্ত্রীক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন উপাচার্য, কঃ বিঃ)। সুশীলবাবু আমার পূর্ব-পরিচিত। উনি এবং ওঁর অবাঙালী স্ত্রী কেবল বিজ্ঞানসাধকই নন, সংগীত-প্রেমীও।

সেদিন অনেকক্ষণ কথা ও গানে আমার গৃহখানি ভরে উঠেছিল। শেষ-দিকে নীহাররঞ্জন ফরমাস করছিলেন এক একখানি বিশেষ গান গাইবার জন্য। একটি গান শেষ হচ্ছে, আর উনি গানখানি সৃষ্টির পটভূমি বিশ্লেষণ করছেন।

গুরুদেবের গানের ওপর নীহাররঞ্জন সেদিন বহু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। গুরুভার না থাকায় তথ্যগুলি সরস আর হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

এমন আর একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা আমরা পেয়েছিলাম, যেদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে।

চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর হারমোনিয়াম রেখে গান গাইলেন প্রাণ খুলে। সংগীতাকে গান গাইতে বললেন। সংগীতা সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমি সারা সকালটি বসে বসে সাধের মালাটি গেঁথেছি'—গানটি গাইল।

উনি ওর গানের খুব তারিফ করলেন। বললেন, এ গানটি প্রথম আমি তাল ছাড়া গাইতে শুনলাম। তাল ছাড়া গাইলে তুমি, কিন্তু আমার খুব ভাল লাগল।

আরও দু'একখানা গানের ফরমায়েস করলেন তিনি। উপভোগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট মন্তব্যও জুড়ে দিলেন।

লেখকেরা অনেকেই কোন না কোন অনুষ্ঠানে এসেছেন এ বাড়িতে। ভালবাসার টানেই এসেছেন। প্রেমেনদা, আশাপূর্ণা দেবী, বিমল মিত্র, প্রবোধ সান্যাল—সবাই এসেছেন কোনো না কোনো সময়ে। আমাদের ছোট সংসারে আনন্দের ঢেউ উঠেছে ওঁদের উপস্থিতিতে।

একদিন একটি ঘরোয়া আলোচনা চক্রে এসে গেলেন হীরেন বসু মশায়।

একটি মেয়ে শরৎকালীন সভার কথা ভেবে গান ধরল,—'আজ আগমনী আবাহনে কি সুর উঠেছে বেজে'। গানটি যখন শেষ হলো তখন হীরেনবাবু বললেন, তোমার গলাটি তো বেশ, তবে সুরে কিছু ভুল আছে।

মেয়েটি জেদ করে বলল, আমার মাস্টারমশাই সব গানই নিখুঁত করে শেখান। সুর সম্বন্ধে তিনি খুব সচেতন।

হীরেনবাবু হেসে বললেন, তোমার মাস্টারমশাই যদি আমার কাছে শিখতেন, তাহলে ঠিক আর ভুল সুর কোনটা তা জানতে পারতেন।

উনি হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে পুরো গানটা গেয়ে গেলেন। কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছিল সুরে, তাও বলে দিলেন। শেষে বললেন, এই আগমনী গানটি কার তুমি জান?

মেয়েটি দ্বিধাহীন গলায় বলল, নজরুলের।

আমি হেসে বললাম, তোমার পরম সৌভাগ্য এ গানের গীতিকার সুরকার হীরেনবাবু স্বয়ং তোমাকে গানটি শেখালেন। ওঁর অনেক গান নজরুলের নামে চলছে। ওঁর বিখ্যাত গান, 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে' নজরুলের গানের সংকলনে ভুল করে ঢুকে পড়েছে।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে হীরেনদা বললেন, এই প্রথম তোমার বাড়িতে এলাম, গেটে বাড়ির নাম-টাম কিছু দেখলাম না কেন?

আমি বললাম, বাড়িটুকু তুলতেই দমছুট হয়ে গিয়েছিলাম, নাম লেখার মতো উৎসাহ ছিল না।

হীরেনদা বললেন, না হে একটা নাম-টাম কিছু দিতে হয়।

একটু থেমে বললেন, একবার হয়েছে কি, নরেনদার (নরেন্দ্র দেব) সঙ্গে দেখা। ভারী দিলদরিয়া মানুষ ছিলেন নরেনদা। হেঁকে বললেন, শুনছি তুমি মধুপুরে একটা খুব ভাল বাড়ি বানিয়েছ। অনেকেই নাকি গেছেন, আমাকে তো কই বলনি? কি নাম রেখেছ বাড়ির?

আপনার বাড়ির নামের সঙ্গে মিল দিয়ে রেখেছি।

কিরকম?

আপনার বাড়ির নাম 'ভালবাসা' আর আমার বাড়ির নাম 'দুর্বাসা'।

উনি হেঁকে উঠলেন, কোনো বাড়ির নাম আবার 'দুর্বাসা' হয় নাকি?

স্টেশন থেকে অনেক দূরে আমার বাড়ি, তাইতো নাম রাখা হয়েছে, 'দূর বাসা'।

তুমি চিরকালের রসিক হে হীরেন।

হীরেনদার কথায় কথায় রসিকতা। হীরেনদার পাশের বাড়ির দুটি বোন হীরেনদাকে খুব খাতির করে। পথে দেখা হলেই গল্প জমে ওঠে। একদিন হীরেনদা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, একটি বোন রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে দোতলার ব্যালকনির দিকে চেয়ে আর এক বোনের সঙ্গে কথা বলছে। ওপর তলার বোনটি বোটানি অনার্সের ছাত্রী।

হীরেনদা পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বোনটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে

এতদিন দেখতে পাইনি কেন ?

মেয়েটি সহাস্যে বলল, মেসোমশাই আমি ভুটান বেড়াতে গিয়েছিলাম।

হীরেনদা অমনি বললেন, দুবোনের নামের আশ্চর্য মিল তো ?

মেয়েটি বলল, কই আমাদের দুবোনের নামের তো মিল নেই।

হীরেনদা অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, মিল নেই কিরকম ! একজন বোটানি আর একজন ভুটানি।

মেয়ে দুটি হো হো করে হেসে উঠল।

হীরেনদা একেবারে ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। খুব ভোরে ট্রামে চেপে বসতেন। কোনো উদ্দেশ্য নেই, চারদিক শুধু দেখে দেখে যাওয়া। ট্রাম টার্মিনাসে পেঁছিল, আবার ঘুরে এল। হীরেনদা যেখান থেকে উঠেছিলেন, সেখানেই নেমে পড়লেন। আশি বছরের পরেও এধরনের ঘোরাঘুরিতে তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না।

বড় ছাতা নিয়ে তিনি ঘোরাঘুরি করতে পারতেন না। ছোট একটি লেডিস ছাতা সবসময় তিনি বগলে চেপে রাখতেন।

একদিন সুপ্রভা সরকারের (নজরুল সঙ্গীতের বিশিষ্ট গায়িকা) বাড়িতে গিয়ে হেঁকে বললেন, সুপ্রভা একটু চা দাও।

বসুন দাদা, এখুনি চা আসছে।

হঠাৎ সুপ্রভা সরকার বলে উঠলেন, হীরেনদা, আপনি লেডিস ছাতা নিয়ে ঘুরছেন যে !

হীরেনদা বললেন, আর বল কেন, যখন যুবক ছিলাম, তখন চেহারা টেহারা মন্দ ছিল না। মেয়েরাই আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াত। তারপর যখন চিত্রপরিচালক হলাম তখন নায়িকা, প্রতিনায়িকা, এমনি অনেক বালা-মালারা ভীড় জমিয়ে থাকত আমার চারদিকে। এখন কাজ ছেড়েছি, বুড়ো হয়েছি। সব প্রজাপতিই উড়ে পালিয়েছে। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। ওরা ছাড়লেও আমি ওদের ছাড়ছিনে। তাইতো লেডিস ছাতাটি বগলে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়ে কয়েকদিন দয়ালজীর ওখানে যাওয়া হয়নি। আজ ঢুকতেই উনি বললেন, এতদিন কোথায় ছিলেন ?

একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম দাদা।

উনি হঠাৎ বললেন, আপনি রাজ্যপালকে দেখতে চান ?

একেবারেই নয়। আমার কোনো ঔৎসুক্য নেই। তবে হ্যাঁ স্টুডেন্ট লাইফে একবার আমি রানী এলিজাবেথকে দেখার জন্য শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

কিরকম দেখলেন ?

তখন অপরাহ্ণের রঙ লেগেছিল সূর্যালোকে। রাণী খোলা গাড়ীতে এলেন। হাল্কা সবুজ রঙের পোশাক। কনুই পর্যন্ত সাদা গ্লাবস। মাথায়

হালকা সুন্দর মুকুট। মুকুটের মাঝখানে একটি বড় আকারের হীরে। সূর্যের আলো লেগে অপূর্ব রঙ ছড়াচ্ছিল। এলিজাবেথ হাত নাড়তে নাড়তে, মিষ্টি হাসি ছড়াতে ছড়াতে চলে গেলেন।

দয়ালজী বললেন, কাল আমার দোকানে গভর্নর ধাওয়ান সাহেব আসছেন। আমি কিন্তু থাকছি না। আপনার ইচ্ছে হলে আসতে পারেন।

আমি বললাম, আপনি যখন আসছেন না তখন আমার আসার কোনো দরকার নেই। কিন্তু দাদা, হঠাৎ ধাওয়ান সাহেবের শুভাগমন কেন ?

সে অনেক কথা।

উনি চুপ করে গেলেন দেখে আমি বললাম, একটু শুনিইনা দাদা।

উনি বললেন, এলাহাবাদে ওঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একদিন আমি আমার এলাহাবাদের বাড়ির দোতলায় বসে আছি হঠাৎ নিচে আমার দোকানের সামনে একখানা ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন যে মানুষটি তাঁকে দেখে আমার বেশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে মনে হলো। আমি চুপচাপ বসে আছি। মনে হলো ভদ্রলোক বই কিনতে এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের দোকানের ম্যানেজার ওপরে উঠে এসে আমাকে বললেন, এক ভদ্রলোক চাঁদা চাইতে এসেছেন। কি একটা সমাজসেবামূলক কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছেন।

আমি একশো টাকার একখানা নোট চাঁদা হিসেবে ভদ্রলোককে দিতে বললাম।

ম্যানেজার নিচে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে এলেন।

উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমি নিচে নেমে গেলাম।

ভদ্রলোক আমার সংগে নমস্কার বিনিময় করে বললেন, আপনি আদায়-কারীর সংগে চাঁদার বিষয়ে কোনো রকম কথা না বলে একেবারে একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিলেন, তাই অবাক হচ্ছি।

বললাম, সাধারণত মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না।

ভদ্রলোক একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, আগে তো আপনার সঙ্গে কখনো আলাপ হয়নি।

বললাম, একটু আগে আপনি যখন গাড়ি থেকে নামছিলেন তখন আমি ওপর থেকে আপনাকে দেখেছি।

ভদ্রলোক হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মানুষ চেনার আশ্চর্য ক্ষমতা আপনার দেখছি।

আমি ওঁর হাতে নাড়া দিয়ে বললাম, সবই আমার মায়ের আশীর্বাদ।

ভদ্রলোককে বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল। বললাম, চা পানে আপত্তি আছে কি ?

উনি হেসে বললেন, কিছুমাত্র নয়।

ভদ্রলোককে ওপরে নিয়ে গেলাম। চা খেতে খেতে আমাদের পরিচয়পর্ব

চলল। কলকাতায় আর বম্বেতে দোকান আছে শুনে খুশী হলেন। দিল্লীতে দোকানের জন্য স্পেস নেওয়া হয়েছে জেনে বললেন, আমাকে প্রায়ই দিল্লী যেতে হয়। আপনার দোকান হয়ে গেলে ওখানে গিয়ে বই দেখতে পাব।

আমি বললাম, গ্রন্থ-প্রেমিকদের জন্য আমার দোকানের দরজা সব সময় খোলা।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো। জানতে পারলাম, ধাওয়ান সাহেব এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি।

সেই থেকে বন্ধুত্ব। পরে উনি যখন লণ্ডনে হাই কমিশনার হয়ে যান তখনও আমার সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল।

বললাম, এখন তো উনি আমাদের রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন।

দয়ালজী বললেন, তাইতো মুশকিলে পড়েছি। উনি আমাকে কয়েকবার রাজভবনে ডেকে পাঠালেন, আমি নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছি।

বললাম, পুরানো বন্ধু, দেখা করলেই তো পারেন।

বড় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আমার কিছু আপত্তি আছে। মন ভারী দুর্বল, সম্পন্ন বন্ধুর কাছে কখন কি চেয়ে বসি, তাই ভয়ে ভয়ে দূরে থাকি।

বললাম, কাল উনি এখানে আসছেন কেন?

দোকান দেখার বাসনা আর পুরানো বন্ধুর মুখোমুখি হওয়া।

আপনি তো কাল দোকানে আসবেন না বলছেন।

আরে মশায়, গভর্নর আসছেন, লোকারণ্য, পুলিশে ছয়লাপ। ওর ভেতর আমি নেই। থাকলেই ওঁর সঙ্গে আমাকে ঘোরাঘুরি করতে হবে। একসঙ্গে চা-পান। তারপর ঐ হাজার কৌতূহলী চোখের ভেতর দিয়ে ওঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। রাজ্যপাল চলে গেলে আশপাশের দোকানদাররাই বলবে, শালা, নবাবী দেখাচ্ছে।

কাল আপনার পরিবারের কেউ থাকবেন না?

নিশ্চয়, আমার ভাইপো থাকবে। ওকেই তো আমার বদলে বার দুয়েক রাজভবনে পাঠালাম। নাহলে অভদ্রতা হয় বইকি।

রাজ্যপাল দোকান পরিদর্শন করে চলে গিয়ে সেই সন্ধ্যায় ফোন করলেন, আপনি যখন আমার আস্তানায় আসবেনই না তখন আমিই যাব আপনার বাড়ি।

দয়ালজী বললেন, আপনাকে এতখানি কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। কাল সন্ধ্যায় আপনার অন্য কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না থাকলে আমিই যাব।

দুদিন পরে দোকানে গিয়ে দয়ালজীর মুখে এসব সমাচার শুনলাম।

আমি জানতে চাইলাম, রাজ্যপালের সঙ্গে আপনার আলাপ জমল কি রকম?

আড়াই ঘণ্টা দুজনে বাগানে বসে পুরানো দিনগুলোকে ফিরে পেয়েছিলাম।

এক ছুটির দিনে আমি আর সঙ্গীতা নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম ফুল কিনতে। শীতের মরশুমে হরেকরকম নয়নলোভন ফুলের মেলা বসে যায়। আমাদের নজর ছিল গ্লাডিওলার দিকে। দু'তিনটে দোকান নানা রঙের গ্ল্যাডিওলা আমদানী করে। ভায়োলেট, রেড, ইয়লো, পিঙ্ক ইত্যাদি রঙের হালকা, গাঢ় অনেকরকমের শেড। একটি কালারের ভেতর অন্য কালারের মিশেল। বাফের ভেতর হালকা ব্রাউনের ছিঁটে, আরও কত কিসিমের। হোয়াইট তো আছেই।

আমরা নানা রঙ মিলিয়ে তরতাজা এক ডজন গ্ল্যাডিওলা কিনলাম। কিছু সাদা চন্দ্রমল্লিকা, আর একগোছা লেডি লেস নিলাম। দোকানী আমাদের পূর্ব পরিচিত। আমরা চলে আসছি, উনি আমাদের ডেকে দুটো আধফোটা গোলাপ দুজনের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

আমরা ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি দরজার সামনে নরেশদা দাঁড়িয়ে। আমরা তো অবাক। আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী ঠিক কিন্তু আমরা কাউকে আমন্ত্রণ জানাইনি। আমরা মনের আনন্দে ঘর সাজাবো, গল্প করব, বাইরে খেতে যাব, এই প্ল্যান।

নরেশদা দুজনের হাতে দুটো গোলাপ দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন, একেই বলে, মেড ফর ইচ আদার।

সঙ্গীতা আর আমি নরেশদাকে প্রণাম করে ঘরের ভেতর নিয়ে এলাম।

নরেশদা সোফায় বসলেন। হাতে তাঁর প্যাক করা কি একটি বস্তু।

সঙ্গীতাকে একান্তে ডেকে বললাম, তুমি হলঘরটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে ফেল, ততক্ষণ আমি নরেশদার সঙ্গে গল্প করছি।

সঙ্গীতা চলে গেল। নরেশদার সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। নরেশদা বললেন, সেই একবছর আগে মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম, আর আজ হঠাৎ চলে এলাম।

বললাম, সেবার নেমন্তন্ন করতে এসে আমার বাড়ির ভেতরেই ঢোকেননি। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে চিঠি ধরিয়ে দিয়েছিলেন হাতে। হেঁকে বলেছিলেন, একা নেমন্তন্নে বেরিয়েছি, বসলাম না বলে কিছু মনে কর না। আসা চাই কিন্তু। অন্য একদিন আসব।

সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে এক বছর পরে আপনি আজ এলেন।

নরেশদা বললেন, প্রাণের টানে এলাম তো ভাই।

বললাম, এই হঠাৎ এসে পড়ায় আনন্দ আমাদের অনেক বেশী হয়েছে নরেশদা।

উনি এবার নীচের ঘরগুলোতে পায়চারি করতে লাগলেন। বাঃ বেশ চমৎকার ছিমছাম ছবিটবি দিয়ে সাজিয়েছ তো।

হঠাৎ ওঁর চোখ পড়ল সিঁড়ির ওপর মেজানাইন ঘরের দরজায়। দরজার ঠিক ওপরে দেয়াল কেটে বৌদ্ধ স্তূপের মতো তৈরী করা ছিল। তারই ভেতর রেখেছিলাম, লালপাথরে তৈরী মৃদঙ্গবাদিনী মূর্তি।

নরেশদা সেদিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অপূর্ব। এটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে ?

পুরীর পাথুরিয়া সাহি থেকে। চিৎপুরের একটা দোকানে অনেক ঢুঁড়ে এই লাল পাথরটা পেয়েছিলাম। গুরুদেবের চরণপদ্ম তৈরী করার জন্য এক ভদ্রলোক এই পাথরখানা কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তারপর মাপজোখে একটুখানি ছোট হয়ে যাওয়ায় কাজে লাগেনি। দোকানীর কাছেই পড়েছিল, আমি পেয়ে গেলাম। তারপর পাথরখানা ঘাড়ে করে নিয়ে পুরী গেলাম। আমার পরিচিত ভাস্কর ভুবনেশ্বর মহাপাত্রকে দিয়ে মূর্তিটা গড়িয়ে নিলাম।

আবার বললেন নরেশদা, এক কথায় অনবদ্য।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি ভাস্করের কি নাম যেন বললে ?

ভুবনেশ্বর মহাপাত্র।

ও নামটা আমার শোনা। পুরীর মন্দির বাজারে অনেকরকম মূর্তি বিক্রি হয়। আমি একটা মূর্তি কিনব, কিন্তু কোনোটাই মনের মতো হচ্ছিল না। শেষে এক দোকানে একটি সূর্যমূর্তি পছন্দ হয়ে গেল। মূর্তিটি বেশী দামেই কিনতে হলো। দোকানীকে বললাম, দাম বেশী নিলেন, কিন্তু মূর্তিটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

দোকানী বলল, ভুবনেশ্বর মহাপাত্রের হাতের কাজ নিতে হলে দাম দিতে হবে বইকি। ওঁর কাজ আমার দোকানেই কেবল পাবেন।

আমি বললাম, দাদা, এই মহাপাত্র পরিবারটি পুরুষানুক্রমে ওড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্যের সঙ্গে যুক্ত।

কি রকম ?

আমি ওঁদের মুখেই একথা শুনেছি।

এখনও মন্দিরের কোন শিল্প-কর্মের মেরামতির কাজ হলে ওঁদের ডাক পড়ে। পুরীর রাজবাড়িতে ঐ ধরনের কোন কাজ করতে হলে ওঁরা ডাক পান। ভুবনেশ্বর বাবুর বাবা অবনীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে কলকাতায় ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলে মূর্তিশিল্প শেখানোর কাজে যোগ দেন। আবার শিল্পাচার্য নন্দলালের আমন্ত্রণে ভুবনেশ্বরবাবু কিছুকাল শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্যের শিক্ষকতা করেন। ঐ বংশের সব থেকে বড় শিল্পী কিন্তু ভুবনেশ্বরবাবুর দাদা শ্রীধর মহাপাত্র।

নরেশদা বললেন, তুমি যে একটু আগে বললে, ওড়িষ্যার মূর্তি-ভাস্কর্যে ভুবনেশ্বরবাবুর জুড়ি কেউ নেই।

বললাম, শ্রীধর মহাপাত্রের কাজই আলাদা। পুরাণের নানা মূর্তি স্বকীয় ভাবনায় রূপ দিয়েছেন শ্রীধরবাবু। ওঁর কৃষ্ণলীলার ভাস্কর্য অসামান্য। তাছাড়া হরপার্বতী, গণেশ, শ্রীদুর্গা—এসব তো আছেই। ওঁর রাজনর্তকী বহু বিখ্যাত মূর্তি। দেহের কমনীয়তা, অভিব্যক্তি, গতিশীলতা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। মূর্তির ওপর ওঁর হাতের সূক্ষ্ম আর দ্রুত টান দেখার

মতো। শিল্পী অসিত হালদার মশায় ওঁকে লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের ভাস্কর্য বিভাগের ভার অর্পণ করেন।

নরেশদা বললেন, তুমি তো শিল্পীদের দারুণ খোঁজ রাখ দেখছি। ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কি করে?

আমি বললাম, নৃতত্ত্ববিদ নির্মল বসু মহাশয়ের কাছে প্রথম ওঁর হদিস পাই। তারপর বার দশেক অন্তত পুরী গিয়ে ওঁর কাছে পনের, বিশ দিন বসে থেকে এক একটি মূর্তি তৈরী করিয়ে এনেছি। ওড়িষ্যার মূর্তি-ভাস্কর্যে ওঁর চেয়ে বড় শিল্পী আর কেউ নেই। বাজারে যে দু'চার খানা বিক্রির জন্যে দেন সেগুলো ওঁর সাধারণ কাজ।

নরেশদা উৎসাহিত হয়ে বললেন, এবার পুরী গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করব। গুণী শিল্পীকে দেখা একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

আমি নরেশদাকে কাচের শো-কেসের ভেতর রাখা একটা মূর্তি দেখালাম। বললাম, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এটি খাজুরাহোর সেই বিখ্যাত 'পত্রলেখা'র মূর্তি।

নরেশদা বললেন, লাইমস্টোনে তৈরী এই ছোট মূর্তিটি ভাবে, অলংকরণে যে কোনো শিল্পরসিকের দৃষ্টি কেড়ে নেবে।

আমি বললাম, এটি ভুবনেশ্বরবাবুর জীবনের সব সেরা কাজ। এই ছোট্ট মূর্তিটি একাধিক প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছে।

নরেশদা বললেন, তুমি এটি পেলে কি করে? উনি কি তোমাকে এটি বিক্রি করেছেন?

না। আমার বাড়িতে রাখা সবকটি মূর্তি আমি দাম দিয়ে সংগ্রহ করেছি কেবল এই মূর্তিটি বাদে।

উনি বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললাম, সেবার পুরী থেকে চলে আসবো, সন্ধ্যায় গাড়ি। উঠেছি পুরী হোটেলে। ভুবনেশ্বরবাবুর মেয়ে রমা ভোরবেলা হোটেলে এসে বলে গেল, বাবা বলে দিয়েছেন আজ দুপুরে আপনারা আমাদের বাড়িতে খাবেন।

সেবার একটা মন্দির তৈরীর ব্যাপারে উনি বয়সের তুলনায় কিছুটা বেশী পরিশ্রম করে ফেলেছিলেন, তাই ক্লান্ত ছিলেন। আমাকে সেবার নিজের হাতে কোনো মূর্তি তৈরী করে দিতে পারেননি। ওঁর বাড়িতে সে যাত্রায় দু-একবার গিয়েছি, উনি ওঁর অক্ষমতার জন্যে বড় আক্ষেপ করেছিলেন।

আমরা যথাসময়ে মধ্যাহ্নভোজে ওঁর বাড়িতে হাজির হলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁর ছোট্ট ঘরখানাতে বিশ্রাম করছি, এমন সময় উনি ভেতরের দরজা ঠেলে আমার ঘরে ঢুকলেন।

আমি চৌকিতে উঠে বসে ওঁর হাতে 'পত্রলেখা'র এই মূর্তিটি দেখলাম।

উনি আমার আরও কাছে সরে এলেন। মুখে মৃদু হাসি। আমি তখন ঐ মূর্তির কাজ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছি।

বললাম, আপনার হাতের কাজ আমার অসম্ভব ভাল লাগে, কিন্তু এত

সূক্ষ্ম সুন্দর কাজ আমি কখনো দেখিনি। নায়িকা যেন মগ্ন হয়ে প্রেমিকের কাছে তার মনের কথা লিখে চলেছে। এটি আমাকে না দেখালেই আপনি ভাল করতেন। যা পাব না, তা দেখে শুধু কষ্ট।

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন, এটির জন্যে এগ্‌জিবিশনের দর্শকদের কাছ থেকে টাকার অফার পেয়েছিলাম, কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারিনি। এগজিবিশন থেকে বারে বারে আমাকে গোল্ড মেডেল এনে দিয়েছে এ মূর্তি। এ আমার যৌবনের কাজ। দিনের পর দিন গভীর নিষ্ঠায় নিখুঁত করে একে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

আমি এত বছর আপনার কাছে এসেছি, কিন্তু কোনোদিন আপনি আমাকে এ মূর্তিটি দেখাননি।

উনি বললেন, যে কোনো এগ্‌জিবিশন থেকে ফিরে এলে ওটিকে আমি বহু যত্নে প্যাক করে আলমারির নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে রাখি। তাই কখনো আপনাকে দেখানোর সুযোগ হয়নি।

তবে আজ দেখালেন কেন? আমার মনটাকে অস্থির করে দিলেন।

উনি বললেন, আমি কয়েক বছর আপনার জন্যে মূর্তি তৈরী করতে গিয়ে বুঝেছি, আপনি নিজে কত বড় শিল্পরসিক। পাগলের মতো মূর্তি আর ছবি ভালবাসেন।

একটু থেমে বললেন, আমার সব মেয়ে। একটিও ছেলে নেই। কাল রাতে বিছানায় শুয়ে আমার মনে হলো, আমি যখন এ সংসার ছেড়ে চলে যাব, তখন এই মূর্তিটিকে আমি কার কাছে রেখে যাব? হঠাৎ আপনার মুখখানাই আমার মনে পড়ল। আমি জানি আপনি এটিকে কত যত্নে রাখবেন।

তখন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু আমি বললাম, এর মূল্য কি আমি আপনাকে দিতে পারব?

উনি বললেন, মূল্যের বিনিময়ে যদি পত্রলেখাকে ছেড়ে দিতাম তাহলে সে অনেক আগেই আমার ঘর থেকে চলে যেত। এটি আপনার জন্যেই এতকাল আমার ঘরে অপেক্ষা করে আছে।

কথাকটি বলেই উনি মূর্তিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, এটি আমার উপহার। যত্ন করে রাখবেন। তাতেই আমি গভীর তৃপ্তি পাব।

আমি মূর্তিটিকে সযত্নে চৌকির ওপর রেখে নত হয়ে শিল্পীর পায়ের ধুলো নিলাম।

ভুবনেশ্বরবাবু আবেগে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি সেই মুহূর্তে পরম গুণী শিল্পীটির চোখে কন্যা-বিদায়ের অশ্রুধারা দেখলাম।

নরেশদা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, অসামান্য।

ওপর থেকে নিচে নেমে এল সংগীতা। বলল, দাদা ওপরে আসুন।

আমরা সকলে আমাদের ছোট্ট হলঘরটিতে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নরেশদা বললেন, এ যে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ছবি। একেবারে প্রমাণ সাইজ। অয়েল কালারের ব্যবহারটি

চমৎকার। কে এঁকেছেন?

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শিল্পী বিভূতি সেনগুপ্ত।

নরেশদা হলঘরে ঢুকে বললেন, একেবারে দক্ষ শিল্পীর হাতের ছোঁওয়া লেগেছে সারা ঘরে।

দাদা, এ ঘরে কিন্তু কোচ সোফার প্রবেশ নিষেধ। ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতে হবে।

সেই তো ভাল।

নরেশদা বসে পড়ে একখানা তাকিয়া হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এটিতেও দেখছি শিল্পকর্মের ছোঁওয়া।

ছাদের দিকে চোখ পড়তে বললেন, আরে এ যে বাগান দেখছি।

উনি উঠে গেলেন। এত বড় বড় ডালিয়া, স্নো-বল ক্রিসানথিমাম, হলিহক একেবারে আলো করে রেখেছে বাগান!

ও দাদা, মালীর কৃতিত্ব। সঙ্গীতা মাঝে মাঝে জল দেয়, পরিচর্যা করে।

ঘরে ঢুকে বললেন, দু'দিকের দরজার মাথায় দুটো মূর্তি সেট করেছ।

বললাম, ও দুটিই কোনারকের মূর্তির অনুকরণে তৈরী। একটি দেব দিবাকরের মূর্তি, অন্যটি প্রেমমুগ্ধ নায়ক-নায়িকা।

সেদিন নরেশদা অনেকক্ষণ গল্প করলেন। ওঠার সময় পাশে রাখা কাগজে মোড়া প্যাকেটটি খুলতে খুলতে বললেন, দেখ তো এটি তোমাদের পছন্দ হয় কিনা।

ছবিটি খুলে দূরে একটি জায়গায় রেখে এসে আমাদের কাছে বসে পড়লেন।

সঙ্গীতা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, দাদা এ যে আপনার বাড়ির সেই বিখ্যাত ছবি।

নরেশদা হেসে বললেন, না সেটা আরও বড়।

ঘটনাটা এই, সন্তোষপুরে আমাদের বাসার কাছাকাছি ছিল নরেশদাদের বেশ লম্বা দোতলা বাড়ি। আমরা পথ দিয়ে যেতাম আর ঐ বাড়ির দোতলার বারান্দায় ঝোলান একটা বড় ছবি আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিত। ছবিটি অয়েলে আঁকা। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শিখরে ভোরের অরুণরাগ লেগে অপরূপ মহিমা প্রকাশ করছে।

আমরা দুজনে আলোচনা করতাম, এমন একখানা ছবি পেলে খুব ভাল হতো। তখন ও বাড়ির সঙ্গে আমাদের কোনো আলাপ ছিল না। আজকের মতো আমরা মার্কেট থেকে কিছু ফুল কিনে একদিন ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছি, এমন সময় গেটের কাছ থেকে হাসতে হাসতে এক প্রবীণ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, আপনারা পাশের বাড়িতেই রয়েছেন অথচ কোন আলাপ হয়নি। ভারী সুন্দর গোলাপ, কিনলেন কোথা থেকে?

নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম, কিছু কেনা কাটা সেরে ফেরার সময় এই ফুলগুলো নিয়ে এলাম।

ভদ্রলোক বললেন, একদিন আসুন না আমার বাড়ি, আলাপ করা যাবে।

বললাম, আপনাদের ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের আকর্ষণে আমরা অবশ্যই আসবো।

ভদ্রলোক বললেন, ছবিটা আপনাদের ভাল লেগেছে?

সঙ্গীতা অমনি বলল, খু-উ-ব!

হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, ঐ ছবি এঁকে আমি যে এতটা প্রশংসা পাব তা ভাবতে পারিনি। এ আমার খেয়াল খুশীর আঁকা।

তারপর থেকে নরেশদাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে।

একদিন নরেশদা বলেছিলেন, সময় সুযোগ মতো তোমাদের এমনি একটা ছবি এঁকে দেবার চেষ্টা করব।

প্রায় দুবছর পরে নরেশদা আমাদের জন্য সেই ছবিটি নতুন করে এঁকে এনেছেন।

নরেশদা চলে গেলেন। আমরা আমাদের বিবাহবার্ষিকীর শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে সেই ছবিটিকে আমাদের শোবার ঘরের দরজার ওপরে যত্ন করে টাঙিয়ে রাখলাম।

নরেশদাদের পরিবারের সুন্দর একটি কাহিনী আছে।

একই গ্রামে দুটি ছেলে বাস করতো। ছেলে দুটির ভেতর ভারি বন্ধুত্ব। একজন নরেশ, অন্যজন বীরেন। একই স্কুলে পাঠ শেষ করে দুজনে কলেজে ঢুকলেন। অঙ্কে অনার্স পেয়ে দুজনে কলেজ ছাড়লেন। এম. এ পাশ করলেন অঙ্ক নিয়েই। একজন হলেন মিত্র স্কুলের অঙ্ক-শিক্ষক। অন্যজন হাওড়ার একটি কলেজের অধ্যাপক। নরেশদা অধ্যাপনা করেন আবার ছবি আঁকেন। বীরেনদা বসে বসে বন্ধুর ছবি দেখেন আর ভালমন্দের বিচার করেন। একই ব্যাঙ্কে একই অ্যাকাউণ্টে দুজনের টাকা জমা থাকে। যাঁর যেমন দরকার জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট থেকে টাকা তুলে নেন। এজন্যে কোনোদিন কেউ কাউকে প্রশ্ন করেন না।

পাত্রীর খোঁজ চলল। আলাদা আলাদা পরিবারে বিয়ে করা চলবে না। অতএব খুঁজে খুঁজে এক পরিবারের দুবোনকে বিয়ে করলেন দুজন। কোনো একজনের অসুখ করলে সারারাত পাশে বসে সেবা করেন অন্য বন্ধুটি, কোনো বাড়াবাড়ির অসুখ হলে বুক চাপড়ে কেঁদে ভাসান।

আমাদের সঙ্গে যখন ওঁদের পরিচয় হয় তখন ওঁদের অনেকগুলিই ছেলে-মেয়ে। খাওয়া, থাকা, বেড়ানো সব একসঙ্গে। অসুখ-বিসুখ বিয়ে-সাদীতে একই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনা হয়।

একদিন নরেশদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের পরেও কি এই বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট থাকবে?

নরেশদা বললেন, আগে থেকে সে প্ল্যান কষে রেখেছি আমরা দুজনে। এই গেটের সামনে থেকে মাঝ বরাবর একটা পাঁচিল তুলে দিলেই দু'দিকে দুটো বাড়ি হয়ে যাবে। আমরা করব না। যারা দরকার মনে করবে তারা

করে নেবে।

এমন দুর্লভ বন্ধুত্ব আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সূর্যোদয়ের ছবিটির দিকে তাকালেই আমার সেই উদ্ভাসিত হৃদয়ের মানুষ নরেশদার কথা বার বার মনে পড়ে যায়।

দুপুরের ফলযোগ হয়ে গেছে। আমি আর দয়ালজী বসে বসে গল্প করছি।

উনি বললেন, আমি কখনো বিদেশ থেকে এমন বই আনাই না, যাতে ভারত সম্বন্ধে কোন কুৎসা আছে।

আমি হেসে বললাম, ওয়ার্ল্ডে ঐসব বইয়ের বিক্রি-ই তো বেশী।

তা হোক। আমার মাকে কেউ অপমান করবে আর আমি মুখ বুজে সহ্য করব, সে কখনও হতে পারে না।

আজকাল এ কথা কে ভাবে বলুন, সবাই তো টাকার পেছনে ছুটছে।

তাহলে বলি শুনুন, বছর কয়েক আগে আমরা খুব অসুবিধার ভেতর পড়েছিলাম।

মানে আপনি দোকানের অসুবিধের কথা বলছেন ?

হাঁ ! ইণ্ডিয়াতে আমরা পেঙ্গুইনের সব থেকে বড় হোলসেলার। একবার ওদের প্রকাশিত একখানা বইয়ের খুব নাম হয়েছে শুনে একসঙ্গে দশ হাজার কপি অর্ডার দিলাম। জাহাজ আসার আগে বই এল এক কপি। আমি বইটা পড়ে দেখলাম, এক জায়গায় ইণ্ডিয়ার ওপরে কিছু বিরূপ মন্তব্য আছে। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পাঠালাম, এ বই আমি নিতে পারব না।

পেঙ্গুইনের কর্তারা তো ক্ষেপে লাল, তুমি অর্ডার পাঠিয়েছ, জাহাজও রওনা হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই।

আমি লিখলাম, আমার দেশের ওপর বইটাতে বাজে মন্তব্য রয়েছে। ওটা কোনোমতেই আমি নিতে পারব না।

ওরা আমার ঔদ্ধত্য দেখে এজেন্সী বাতিল করে দিল। এত বড় কোম্পানী, ওদের বই বিক্রি করে অনেক টাকা পেতাম, আমাদের খুব বিপর্যয়ের ভেতর পড়তে হলো। কিন্তু টাকার জন্যে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারলাম না। পাঁচ বছর বেশ কষ্টে কাটল।

একদিন হঠাৎ পেঙ্গুইনের এক বড়কর্তা এলেন। তিনি নানা কথার পর বললেন, আমাদের ডাইরেক্টর আপনার খুব প্রশংসা করেছেন।

কিরকম ? আমি তো আপনাদের সব বই ফেরত পাঠিয়েছি।

উনি বললেন, আপনার দৃঢ়তায় উনি মুগ্ধ হয়েছেন।

এরপর, যে কমিশন পেতাম তার চেয়েও কিছু বেশী অফার করলেন ওঁরা। আমি আবার এজেন্সী পেয়ে গেলাম। জানবেন প্রফেসর, সততার মার নেই। আমার মায়ের আশীর্বাদে সততার সঙ্গে ব্যবসা করে আজ আমি এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি।

হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটল। এটি নিজের চোখে না দেখলে দয়ালজীকে জানা আমার অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

আমরা কথা বলছিলাম, হঠাৎ একটি লোক ঢুকে পড়লেন। চুল উস্কো-খুস্কো, একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত মুখচোখের চেহারা।

লোকটি ঢুকেই আমার দিকে তাকালেন। আমি ভাবলাম, হয়ত কোন গোপন কথা আছে তাই পাশের ঘরে চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

দয়ালজী বললেন, প্রফেসর আপনি বসুন।

এবার লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন আপনি। কি বলার আছে বলুন।

লোকটি প্রায় কান্নাভেজা গলায় যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো, আজ চল্লিশ বছর তাদের দোকান চলছে, বারো বছর আগে বাড়িওলার সঙ্গে কেস শুরু হয়, আজ হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে, জিতেছেন বাড়িওলা।

এবার লোকটি বললেন, কালই আমাকে দোকান বন্ধ করে সপরিবারে রাস্তায় নামতে হবে। এখন আমি নিরুপায়। আমি কি করবো, একটি উপায় বলে দিন।

কোর্টের পর বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

ওঁরা বললেন, দশ হাজার টাকা সেলামী আর কিছু ভাড়া বাড়িয়ে দিলে দোকান চালাতে দেবেন।

দয়ালজী বললেন, আপনি কি মনস্থ করেছেন?

আমি হয়তো মাসে মাসে বাড়তি ভাড়াটা দিতে পারি, কিন্তু এককালীন দশ হাজার দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমি বড় বিপন্ন হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

আপনি আমার কাছে কি চান?

লোকটি কাতরগলায় বললেন, আপনি আমাকে একটা পথ বলে দিন যাতে আমি ছেলেপুলে নিয়ে বাঁচতে পারি।

দয়ালজী মাথা নিচু করে সামান্য সময় কি চিন্তা করলেন। হঠাৎ ফোনটা তুলে নিয়ে ওপরে ভাইপোকে নির্দেশ দিলেন, এক ভদ্রলোক তোমার কাছে যাচ্ছেন, ওঁকে দশ হাজার টাকা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা কর।

লোকটি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। দয়ালজীর পা জড়িয়ে ধরলেন।

দয়ালজী উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে তুললেন।

আপনি ওপরে চলে যান। টাকাটা নিয়ে আজই বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করে ফয়সালা করবেন।

লোকটি ওপরে দয়ালজীর ভাইপোর কাছে চলে গেলেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, দাদা এই ভদ্রলোকটি কে?

রাস্তার ধারে ওঁর দোকান। প্রায় পচিশ বছর পরে দেখা। বাজারে সুনাম নেই।

অবাক হয়ে বললাম, আপনি এতগুলো টাকা ঐ লোকটিকে এক কথায়

দিয়ে দিলেন ?

দয়ালজী বললেন, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি।

আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

আজ আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যে অন্যায়টুকু করছি, তার থেকে অনেক বেশী অন্যায় হত যদি আমি একথা প্রকাশ না করতাম।

দয়ালজী বললেন, সে অনেক বছর আগের কথা। আমি তখন প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় ব্যবসা শুরু করেছি। কলিন্সের জেম ডিক্সনারী ক্রেডিটে আনাই, বিক্রি করি। দিনে গড়ে অন্তত খান দশ বারো বই বিক্রি না করলে সংসার চলে না।

একটু থেমে দয়ালজী আবার বলতে শুরু করলেন, একদিন আমি ডিক্সনারী ব্যাগে নিয়ে অসহায়ের মতো ঘুরে ফিরছি, একখানাও বিক্রি করতে পারছি না। কিন্তু সেদিন আমার কিছু টাকা নইলে সংসার অচল। যে দোকানে যাই সে-ই বলে, কালই তো তুমি দিয়ে গেছ ; পরশু তো দশখানা দিলে হে, বিক্রি হোক।

আমি নিরাশ হয়ে ফিরতে ফিরতে এই লোকটির দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। তখন ওর বয়েস অনেক কম ছিল। ওর বাবাই দোকান চালাতেন। ও বসে থাকত একটা টুলের ওপর। বাবার ফাইফরমাস খাটত।

আমাকে বই নিয়ে ঢুকতে দেখে ওর বাবা বললেন, পরশু তো দিয়ে গেলে। আরও পাঁচ সাত দিন পরে এসো।

এখানেও হতাশ হতে হলো। আমি ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় ফুটপাথে নেমে এলাম।

হঠাৎ পেছন থেকে ওর বাবার ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ালাম। উনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। আমি উঠে গেলাম ওঁর দোকানে।

ভদ্রলোক বললেন, আজ বুঝি পকেট একেবারেই ফাঁকা ?

আমি ম্লান হাসি হাসলাম।

উনি বললেন, দিয়ে যাও খান পাঁচেক।

বিশ্বাস করুন প্রফেসার, সেদিন ঐটুকু টাকা পেয়ে আমার কি যে উপকার হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। তারপর শুনেছি ভদ্রলোক মারা গেছেন। ছেলে দোকানে বসে। আমি রাস্তা ক্রস করে গাড়িতে যখন বাড়ি ফিরি তখন ও নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য করে। আমিও দূর থেকে ওকে দেখেছি। এত বছর পরে আজ মুখোমুখি।

আমি বললাম, দাদা, ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে যা মনে হলো, দশ হাজার টাকা সহজে শোধ দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

দয়ালজী বললেন, আমি তো ফিরে পাবার আশা নিয়ে দিচ্ছি না। আমি টাকাটা দিচ্ছি সেদিনের কথা স্মরণ করে যেদিন ওর বাবা পাঁচখানা বই নিয়ে অসহায় একটি যুবককে একদিনের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

কৃতজ্ঞতাবোধ যে এমন ভাবে কাজ করে তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন চোখের সামনে দেখে আমি অপলকে দয়ালজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার বন্ধু শৈলেশ চক্রবর্তী বিজ্ঞান সাধক। সারা ভারত ঘুরে ঘুরে তিনি বিজ্ঞানের কথা প্রচার করে বেড়ান। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী তিনটি ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন তিনি। একাধিক বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগ। বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে তিনি স্লাইড সহ মহাকাশের ওপরে অনেক আলোচনা করেছেন। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কখনো পরিবেশ বিজ্ঞান, কখনো বা গ্যাসপ্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে বেড়িয়েছেন। বিয়ে করেননি, বিজ্ঞানে আত্মনিবেদিত প্রাণ।

শৈলেশবাবু আমাদের পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কারু কোনো কঠিন অসুখ করলে উনি উপযুক্ত ডাক্তারের সন্ধান বলে দেবেন। দরকার হলে নিজে দৌড়ঝাপ করে সব ব্যবস্থা করবেন।

কেবল আমাদের পরিবারের জন্যে নয়, শৈলেশবাবুর বসুধা জুড়ে কুটুম্ব। যার যেখানে অসুবিধে তার সমাধানের জন্য শৈলেশবাবুর ডাক পড়ে।

আমরা বাইরে বেড়াতে গেলে শৈলেশবাবু অনেক সময় আমাদের সঙ্গী হন। দুর্গম পথযাত্রায় এমন সঙ্গী দুর্লভ।

এক সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে ঢুকে পড়লেন শৈলেশবাবু। নিচ থেকে সঙ্গীতাকে যে ভাবে ডাক দিলেন তাতে মনে হলো তিনি বিশেষ উত্তেজিত।

সঙ্গীতা ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, চলে আসুন দাদা।

শৈলেশবাবু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বললেন, দীপা এসেছে।

সঙ্গীতাও উত্তেজিত হয়ে বলল, কবে ?

পরশু রাত বারোটায়।

সঙ্গীতা আবার বলল, দীপা আসতে পারে এমন কথা তো আপনি আমাদের বলেননি।

আমিও কি জানতাম নাকি। কোনো কথা না জানিয়ে সে স্বয়ং এসে হাজির।

এর পেছনে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে।

এক সময় রাশিয়ার সঙ্গে সারা পৃথিবীর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট সংগঠন মাঝে মাঝে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতেন। তাঁরা অনেক সময় ছদ্মবেশে দেশ থেকে পালিয়ে হাজির হতেন রাশিয়ায়। সেখানে কৃষক শ্রমিক সংগঠনের কাজকর্ম দেখে তাঁরা ওয়াকিবহাল হয়ে দেশে ফিরে যেতেন। নিজের দেশে গিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতেন। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন শৈলেশবাবুর কাকা। তিনি সুন্দরবনে কৃষক সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। একসময় পার্টি থেকে তাঁকে রাশিয়ায় পাঠানো হলো। তিনি ছদ্মবেশে ভারত ছাড়লেন।

রাশিয়াতে গিয়ে অনির্বাণ চক্রবর্তী পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখতে লাগলেন কৃষক সংগঠনগুলির কাজ। তাঁর এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলেন পার্টির কাজে নিবেদিত-প্রাণ একটি রাশিয়ান মেয়ে।

রাশিয়ার ক্ষেত-খামার, গ্রাম-গ্রামান্তে ঘুরে বেড়ালেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। সেখানকার মানুষের প্রাণের জোয়ার দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। নিজের দেশে কৃষক সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলার শপথ নিলেন মনে মনে। তাঁর উৎসাহের দীপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ঐ রাশিয়ান মেয়েটির সান্নিধ্যে।

ইতিমধ্যে তাঁরা অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। কর্মের সাহচর্য শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত অন্তরঙ্গতায় গিয়ে পৌঁছল। তাঁদের মিলনে একদিন জন্ম নিল একটি কন্যা-সন্তান। আর ঠিক সেই সময়েই দেশের পার্টির কাছ থেকে ফিরে আসার জরুরী ডাক পেলেন অনির্বাণ।

দুজনের বিচ্ছেদ অসহনীয় হলেও পার্টির কাছে তাঁরা ছিলেন দায়বদ্ধ। সুতরাং অনির্বাণ চক্রবর্তীকে ফিরে আসতে হলো স্বদেশে। নবজাত কন্যাটি থেকে গেল মায়ের কাছে।

রাশিয়া থেকে চলে আসার আগে অনির্বাণ কন্যার নাম রাখলেন দীপা। মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মীরও বিদায় লগ্নে চোখে জল এসে গিয়েছিল। দুজনে জানতেন, খবরাখবরের আদান-প্রদান প্রায় অসম্ভব।

ফিরে এসে কাজের মাঝখানে আরও গভীরভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। হয়তো স্ত্রী ও কন্যার মুখ ভুলে থাকার জন্যে।

ভারত স্বাধীন হলো। ধীরে ধীরে রাশিয়ার সঙ্গে গড়ে উঠল একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। উত্তোলিত হলো এতদিনের লৌহ যবনিকা। রাশিয়ার প্রধান দুই নেতা ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিন এলেন ভারত পরিদর্শনে। ওঁরা যখন কলকাতায় এলেন তখন গড়ের মাঠ পরিণত হলো জনসমুদ্রে। এত জনসমাবেশ এর আগে কখনও আমরা দেখিনি। এরপর উভয় দেশের ডেলিগেটরা বিভিন্ন সময়ে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন শুভেচ্ছা সফরে।

একবার একটি রাশিয়ান দল এলেন দিল্লীতে। একজন ইণ্ডোলজিস্ট ছিলেন দলনেতা। তিনি একাই চলে এলেন কলকাতায়। খুঁজে বের করলেন অনির্বাণ চক্রবর্তীকে।

অনির্বাণের স্ত্রী নাস্তাসিয়ার নাম করে কমরেড জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই মহিলাকে চেনেন?

অনির্বাণের অন্তরের রুদ্ধ স্রোতটা হঠাৎ খুলে গেল। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয়?

আমি নাস্তাসিয়ার আপন ভাই। দিল্লীতে এসেছি একটি কাজ নিয়ে। একটু ফাঁক পেয়েই কলকাতায় ছুটে এলাম শুধুমাত্র আপনার খোঁজে।

অনির্বাণ তাঁকে খালি হাতে দেখে বললেন, হোটেল থেকে লাগেজ নিয়ে

চলে আসুন। এখানে অন্তত দুদিন থাকতে হবে। অনেক কথা শোনার আছে, বলারও আছে।

অনির্বাণ নাস্তাসিয়ার ভাইকে পুরো দুদিন ধরে রাখতে পারেননি, কিন্তু তিনি স্বল্প সময়ের ভেতরেই তাঁর স্ত্রী ও কন্যার প্রায় সমস্ত খবরই জেনে নিলেন।

তিনি জেনে খুশী হলেন গত বছরই তাঁর মেয়েটি ডাক্তারী পাশ করে বিয়ে করেছে। জামাইটি নামকরা সার্জেন।

তারা এখন সকলেই অনির্বাণ চক্রবর্তীর খোঁজ পাবার জন্য উৎসুক।

কমরেড রাশিয়ায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি কেড়ে নিয়ে গেলেন অনির্বাণের চোখের ঘুম। কাজের ভেতর যে মানুষটি নিজেকে প্রায় সারাক্ষণই জড়িয়ে রেখেছিলেন, তিনি এখন রাতে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন স্ত্রী ও কন্যাকে। কর্মের ভেতর থেকে কখন যে তিনি পার হয়ে এসেছেন এতগুলো বছর তা তিনি জানতেই পারেননি। আজ নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হলো, অনেকখানি প্রবীণ হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর সেই পুতুলের মতো শিশুকন্যাটি এখন পরিণত এক নারী।

চিঠি যায় চিঠি আসে। উভয় পক্ষই দর্শনের জন্য আকুল।

শৈলেশবাবু বললেন, আমি একটু রাত করেই শুতে যাই। প্রায় রাত বারোটায় আমার বাড়ির দরজার সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। কে আসে এত রাতে! আমি ছাদ থেকে উঁকি দিলাম। ধবধবে ফর্সা একটি মেয়ে, আরে এ যে বিদেশিনী! আমি অমনি তর্‌তর্‌ করে নেমে গেলাম নিচে। বাড়িতে সেদিন প্রায় কেউ ছিল না। আমি দরজা খুলে দেখি এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, সে নিশ্চিত দীপা। রঙে, চুলে, পোশাক-আশাকে রাশিয়ান, কিন্তু মুখের আদলটি কাকার মত। তাছাড়া দুটো বড় বড় ভাবালু চোখ কাকে যেন খুঁজে ফিরছে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। দীপার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমি শৈলেশ। তোমার আসার কোনো খবরই আমরা পাইনি।

দীপা আমার হাতখানা চেপে ধরে বলল, বাবা কই? আমি বাবাকে দেখব বলে প্রথম সুযোগেই প্লেন ধরেছি।

বললাম, ভেতরে এসো, সব বলছি।

দীপা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর এল। এ বাড়িতে আমি, কাকা আর রান্নার পুরানো লোকটি ছাড়া চতুর্থ কোনো প্রাণী থাকে না। নারীবর্জিত এ সংসারের চেহারাখানা শ্রীহীন একটা মেসবাড়ির মতো।

দীপাকে নিয়ে ওপরে এলাম। আমার ঘরে একখানা চেয়ারে ও বসল। গরমে ঘেমে নেয়ে উঠছিল। ফুল স্পীডে পাখাটা চালিয়ে দিলাম।

ও আবার বলল, বাবাকে দেখছি না কেন, বাবা কোথায় শৈলেশ?

ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে ও কথা বলছিল।

আমি বললাম, কাকা কাল সুন্দরবনে গেছেন। দু'তিন দিনের ভেতর

এখানে ফিরে আসার কথা।

দীপা বলল, বাবার কাছে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না ?

বললাম, সুন্দরবন জল-জঙ্গলের জায়গা। কাকা সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে কাজ করেন। একটা বিশেষ কোনো জায়গার হদিস জানা থাকলে অবশ্যই আমি তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম।

দীপা বলল, আমরা খুঁজে খুঁজে দেখব যদি পেয়ে যাই।

হেসে বললাম, তার আগেই তোমার বাবা এখানে এসে হাজির হবেন।

ও পরিস্থিতিটা বুঝে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইল। ওর অবস্থা দেখে আমার নিজেরই ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কত দূর থেকে ও উড়ে এসেছে বাবাকে দেখবে বলে। সারা জার্নিটা ও উত্তেজনায় কাটিয়েছে। জীবনের চব্বিশটা বছর যাকে দেখেনি, সেই হারানো মানুষটার সন্ধান পেয়ে গেছে সে। এখন ধৈর্য কি আর বাঁধ মানে।

সঙ্গীতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বেচারা। সত্যি শৈলেশদা, আমার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এটা যেন একটা গল্প।

শৈলেশবাবু বললেন, তারপর শোনই না। দীপা তার বাবার একখানা ফটো আমাকে দেখাতে বলল। আমি ধান কাটার মরশুমে সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। ওখানে আমি কাকার একখানা ফটো তুলি। কাস্তে আর ধানের শীষ দু'হাতে ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে কজন কৃষক। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাকা হাসছে।

ফটোখানা ভালই হয়েছিল। আমি ওটি এনলার্জ করে বাঁধিয়ে রেখেছিলাম পড়ার ঘরে। দীপাকে নিয়ে গেলাম সেখানে। মেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে বাবার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিশ্বাস করবে কি সঙ্গীতা, চোখের পাতাটি পড়ল না। কতক্ষণ পরে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা জল।

সঙ্গীতা গালে হাত চেপে কথাগুলো শুনছিল। সে অভিভূত হয়ে আপন মনে মাথা নাড়ল।

শৈলেশবাবু বললেন, দীপাকে ঐ ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ। পথের দিকে খোলা বড় জানালা।

সঙ্গীতা বলল, নতুন জায়গায় অসুবিধে বোধ করছে না ?

সব মানিয়ে নিয়েছে। শীতের দেশ থেকে এসে পড়েছে একেবারে ফার্নেসের ভেতর। একটি পাখামাত্র সম্বল। সারাদিন জানালাটা খুলে রেখেছে। তারই পাশে একটা চেয়ারে বসে সারাক্ষণ চোখ পেতে রেখেছে পথের ওপর।

সঙ্গীতা বলল, নতুন দেশে নতুন মানুষজনের চলাচল দেখছে।

শৈলেশবাবু বললেন, একেবারেই না। তোমার মতো প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু দীপার প্রশ্ন শুনে আমার ভুল ভাঙল। 'বাবা তো এই পথ দিয়েই বাড়িতে ঢুকবে ?'

ও তার বাবার পথ চেয়ে কাল সারাদিন, আর আজ দুপুর অব্দি

বসেছিল। কেবল নাওয়া-খাওয়া আর ঘুমের সময়টুকু বাদে।

সংগীতা বলল, আপনি যে সন্ধ্যায় এখানে চলে এলেন, ও বেচারা একা একা বসে থাকবে!

আজ দুপুরেই পিতাপুত্রীর মিলন হয়েছে।

আমরা যেন নাটকের এই দৃশ্যটুকুর জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। এখন যে যার আসনে টান টান হয়ে বসলাম।

শৈলেশবাবু একটুখানি থেমে বললেন, সে দৃশ্য যদি দেখতে সংগীতা! আমি বিজ্ঞানসাধক, কঠিন বাস্তব নিয়ে আমার কারবার। এ হেন মানুষও চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি।

জানালা দিয়ে বাবাকে দূর থেকে আসতে দেখে ও ঠিক চিনে ফেলেছে। সিঁড়ি ভেঙে ও ছুটেছে দরজা খুলতে। আমি ওর জুতোর সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।

দরজাটা খুলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাকার বুকে। কাকা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেছে, তারপর জড়িয়ে ধরেছে মেয়েকে। দুজনের সে কি আকুল কান্না। ঠিক যেন মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল ছোট্ট মেয়েটা। হঠাৎ তার বাবাকে ফিরে পেয়ে আকুল কান্নায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার বুকে।

শৈলেশবাবু কথা বলে চলেছেন। সংগীতার চোখ সজল হয়ে উঠেছে। আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছে অন্য ছবি।

একটি বালিকা সতৃষ্ণ চোখ মেলে দেখছে, তারই মতো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মা বাবার হাত ধরে দোল খাচ্ছে। কখনো মেয়ের দুটো হাত ধরে শূন্যে পাক দিচ্ছে তার বাবা। মাটিতে নামিয়ে দিলেই বলছে—আবার, আবার।

ছোট্ট বালিকাটি মাকে জিজ্ঞেস করছে, আমার বাবা কই মা?

কত ছেলেমেয়ে বাবার হাত ধরে বড় বড় ঢেউ ভাঙছে সমুদ্রের। খুশীতে ফেটে পড়ছে।

ঐ ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার বাবা কি তাকে বুকে করে ঐ ঢেউয়ের ঘোড়ায় চড়াবে না?

আবার অন্য ছবি।

একটি কিশোরীকে টিজ করছে তার বান্ধবীরা।

তোর বাবার নাম বলতে পারবি?

অনির্বাণ চক্রবর্তি।

তোর বাবাকে দেখতে কি রকম রে? লম্বা না বেঁটে, সাদা না কালো?

অপমানে সারা শরীর কাঁপতে থাকে কিশোরীটির। বাড়ি গিয়ে চোখের জল ফেলে মাকে জিজ্ঞেস করে, আমার বাবাকে কি আমি কোনোদিনও দেখতে পাব না মা? পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ যাই হোক, আমি আমার বাবাকে একবার দেখতে চাই।

বাক্যহারা মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজের

অসহায়ত্বকে ঢাকার চেষ্টা করেন।

সেই মেয়ে প্রায় চব্বিশটি বছর অশ্রুপিছল পথ হেঁটে দেখা পেয়েছে আজ তার হারিয়ে যাওয়া জন্মদাতার। এ প্রাপ্তির আনন্দ পৃথিবীর সঞ্চিত সমস্ত দৌলতের বিনিময়েও পাওয়া সম্ভব কি?

শৈলেশবাবুর শেষ কথাটি কানে এসে বাজল।

কাল সকালেই কাকা দার্জিলিং মেলে রিজার্ভেশানের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন। দার্জিলিং থেকে ওরা ফিরে এলে দীপাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব একদিন।

সংগীতা বলল, খুব খুশী হব শৈলেশদা ওকে আমাদের এখানে পেলে।

শৈলেশবাবু চলে গেলেন।

সংগীতা বলল, শৈলেশদার একটা কথা শুনেছ?

কি কথা বলতো? মাঝে আমি একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

দীপার মা কিন্তু দীপার বাবাকে এ পর্যন্ত একখানিও চিঠি লেখেননি।

সত্যি?

শৈলেশদা তাই বললেন। দীপার চিঠিতেই কাকা, কাকীমার খবর পাচ্ছেন। তবে সে খবরও খুব স্পষ্ট নয়।

বললাম, হয়ত তিনি কিছুকাল অনির্বাণ চক্রবর্তীর জন্য প্রতীক্ষা করেছিলেন। তারপর নতুন কোনো সংসার রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই পুরানো মানুষের সন্ধান পেয়েও স্বাভাবিক কারণে এই নীরবতা।

সংগীতা বলল, তোমার অনুমান একেবারেই ঠিক নয়। শৈলেশদার চিঠিতে দীপা লিখেছিল, 'আমার বিয়ের পর মা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে।'

আমি ভাবতে লাগলাম, দীপার মায়ের মিলন-মুহূর্ত যখন আসন্ন, তাঁর মনের মানুষ যখন আর দূরে নেই, তখন এ নিস্পৃহতা কেন?

একসময় বললাম, সংগীতা, আমার মনে হয় এক সুতীব্র অভিমান জমে আছে ভদ্রমহিলার বুকে। দুজনে প্রণয়-মুগ্ধ দিনগুলোতে যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সে জায়গাগুলো আজও তেমনি রয়ে গেছে। সেই স্মৃতির স্পর্শমাখা জায়গাগুলোতে পা দিলেই তিনি আজও যন্ত্রণা অনুভব করেন।

সংগীতা বলল, কিন্তু এখন তো সে যন্ত্রণা অবসানের অনেকটা সুযোগ হাতের মধ্যে এসে গেছে।

বললাম, তীব্র অভিমানের কারণ আছে সংগীতা। একবার যে মানুষটি ছদ্মবেশে ভারত থেকে রাশিয়ায় চলে যেতে পেরেছিল, সে মানুষটি কি এই চব্বিশটা বছরের ভেতর একবারও কোনো ছলে স্ত্রীকন্যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না। তাছাড়া ভারত তো স্বাধীন হয়েছে বেশ কয়েক বছর। এর ভেতর অনির্বাণ চক্রবর্তী কবার ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন বল? শৈলেশবাবুর কাছ থেকে যতটুকু জেনেছি, একবারও না। বরং ওদিক থেকে ভদ্রমহিলা তাঁর ভাইয়ের মাধ্যমে সন্ধান চালিয়ে অনির্বাণ চক্রবর্তীকে আবিষ্কার করেছেন।

সঙ্গীতা বলল, যদি আবিষ্কারই করলেন, তাহলে এমন নীরবই বা হয়ে গেলেন কেন ?

আমার ভাবনায় ভেসে এল,—চব্বিশটা নির্মম বছর, বার বার আঘাত হেনে হেনে একটি নারীর পুষ্পিত বসন্তের ফুলগুলোকে ঝরিয়ে দিয়ে গেছে। যৌবনের সোনালী পাখি কবে তার পুরানো বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে অন্য কোনোখানে। এখন অন্তর জুড়ে শুধু রিক্ততার হাহাকার। শূন্য বুকে সেই নারী আজ কাকেই বা আমন্ত্রণ জানাবে।

সঙ্গীতাকে বললাম, ভদ্রমহিলা হয়তো তাঁর মেয়ের মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর দুঃখ দূর করার জন্য এত দূর এগিয়েছিলেন। এখন পিতাপুত্রীর যোগসূত্রটি রচনা করে দিয়েই তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

সঙ্গীতা বলল, তোমার অনুমানই হয়ত ঠিক। কিন্তু এতদিন পরে ওঁরা একসঙ্গে মিলিত হলে, সেটি হবে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার। ভগবান করুন যেন তাই হয়।

দার্জিলিং থেকে ফিরে এল দীপা। শৈলেশবাবু আগেভাগেই জানিয়ে দিলেন, রোববার দীপাকে নিয়ে উনি আমার বাড়ি আসবেন।

আমরা হলঘরের ভেতরে ফুলের টব সাজিয়ে বাগান তৈরী করলাম। মধুমালতীর ফুলে ভরা ঝাড়টি ছাদে দোল খাচ্ছিল। হলের ভেতর টবে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছিল অজস্র বেলফুল।

আমার বাড়িতে এসে দীপার খুব ভাল লেগে গেল। সঙ্গীতা কয়েকটা বেলফুল তুলে একটা প্লেটে রেখে ওর হাতে ধরিয়ে দিল। ও গন্ধ শুঁকে একেবারে মোহিত। বলল, এত মিষ্টি গন্ধ হয় ফুলের তা আমার জানা ছিল না।

সৌভাগ্য, সেদিন একটু ঝড়ো হাওয়া দিচ্ছিল। হাওয়াটা ঠাণ্ডা। কোথাও হয়ত দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তারই স্পর্শ লেগেছে।

আমরা মধুমালতী গাছের পাশে মাদুর পেতে বসলাম। চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। দু'এক টুকরো মেঘ ভাসছে দক্ষিণের আকাশে।

শৈলেশবাবু বললেন, দীপা, তোমার এই বান্ধবীটি ভাল গান গাইতে পারে।

দীপা উৎসাহিত হয়ে উঠল, পিয়ানো আছে ? আমি বাজাব। তুমি গান কর।

সঙ্গীতা বলল, পিয়ানো নেই, হারমোনিয়াম আছে। তবে আমি খালি গলাতেই গান করব।

গানের বিষয়বস্তুগুলো পরপর দীপার কাছে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হলো।

সঙ্গীতা গাইল,—

> 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
> সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলোনা॥

সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—আমারই মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা ॥
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহালগনে ॥'

দেখলাম দীপা বেশ ভাবুক প্রকৃতির মেয়ে। সে গালে হাত রেখে শুনছিল। গান শেষ হলে গায়িকার হাত ধরে নাড়া দিয়ে সে আবেগ প্রকাশ করলে।

এর পরের গানটিতে কিন্তু দীপা নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সংগীতা গাইল,—

'দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন বেড়ায়গো ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে ॥
যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান যেতে চায় কোন্ অচিনপুরে ॥'

গান শেষ হলো। দেখলাম, চাঁদের আলোয় দীপা চোখের জলে ভাসছে। মনে হলো, পৃথিবীর সব কালের, সব দেশের, সব মানুষের ভাষা এক।

সে অশ্রুধারায় দেখতে পেলাম দীর্ঘ বিরহ-বিচ্ছিন্ন একটি পরিবারের মিলন-চিত্র।

কলেজে তিন সিফ্‌টে কাজ করতাম আমি। একটি হোলটাইমের দুদিকে দুটো পার্টটাইম। এক কলেজে মর্নিং আর ডে, অন্য আর একটি কলেজে নাইট। নাইট কলেজটিতে কাজ করার জন্যে আমাকে দক্ষিণ কলকাতায় আসতে হতো। সপ্তাহে তিনদিন। সাকুল্যে একশোটি টাকা। তখন অন্তহীন উদ্যম। ক্লান্তি বোধ করতাম না শরীরে। পরের দিনের বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের কাছে কেমন করে উপস্থাপন করব, রাতে বাসায় এসে তার রিহার্সাল হতো। পড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীদের মুখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলে বুঝতাম সেদিনের পড়ানো আমার সার্থক হয়েছে।

একদিন প্রিন্সিপাল প্রফুল্ল গুহমশায়ের দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে গেছি। আমি ওঁর বসার ঘরে গিয়ে বসেছি। শুনলাম উনি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। একটু পরে শাওয়ারের জলধারার সঙ্গে ওঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। স্নান করতে করতে ম্যাকবেথের কোনো একটা অংশ আবৃত্তি করছিলেন উনি। মনে হলো যেন ম্যাকবেথের ঐ অংশটি নিয়ে ছাত্রদের কাছে কিছু বলছেন।

একসময় পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আমার কাছে এলেন।

কি খবর রঞ্জন? কতক্ষণ এসেছো?

আমি সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, আপনি তখন ম্যাকবেথ আবৃত্তি করছিলেন।

উনি হা হা করে হেসে উঠে বললেন, শুনেছো বুঝি? আজ অনার্স ক্লাশ

আর ইউনিভার্সিটির ছেলেদের ঐ একই বিষয় নিয়ে পড়াতে হবে। কাল রাতে এম. এ. ক্লাসের ছেলেদের জন্যে পড়াটা তৈরী করে নিয়েছি। আজ কলেজের ছেলেদের কেমন করে বলবো তারই রিহার্শাল দিচ্ছিলাম।

আমি ভয়ংকর উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। আমার পড়ানোর পরিকল্পনার সঙ্গে এঁর বেশ খানিকটা মিল খুঁজে পেলাম।

আমি বললাম, স্যার ওসব বইতো আপনি কতবার পড়িয়েছেন, এখনও পড়ে পড়াতে হয় ?

কি বলছো তুমি রঞ্জন ! শেষ জীবন পর্যন্ত তোমার ভেতরে একজন ছাত্র বাস করবে, যার ভেতর থাকবে অনন্ত জানার কৌতূহল। তবেই তুমি শিক্ষক হিসাবে সার্থক হতে পারবে। তাহলে বলি শোন, আমরা এক ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে পড়তাম। সেক্সপীয়র পড়ানোতে ভারি নামডাক তাঁর। তিনি আমাদের সপ্তাহে একদিন 'ম্যাকবেথ' অন্যদিন 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' পড়াতেন। এতবার বইগুলি তিনি পড়িয়েছেন যে ক্লাসে কোনোদিন তাঁকে বই খুলে পড়াতে দেখিনি।

একদিন ক্লাসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ ম্যাকবেথের ক্লাস তো ?

আমরা সমস্বরে বললাম, আজ্ঞে না, আজ 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'।

উনি কেমন থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ কি ভেবে বললেন, আজ তো আমি তোমাদের ক্লাস নিতে পারব না। আজ আমি 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' পড়ে আসিনি।

আমি বললাম, বহুবছর ধরে আপনি 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' পড়িয়ে আসছেন, বইয়ের প্রতিটি লাইন আপনার মুখস্থ স্যার। তাহলে পড়াবেন না কেন ?

উনি মৃদু হেসে বললেন, আমি প্রতিদিনের পড়া পড়ে আসি। মনে করি, বিষয়টি যেন প্রথম পড়ে পড়াতে যাচ্ছি। তাতে অনেক নতুন চিন্তা মনে এসে যায়।

আমি পি. কে. গুহকে বললাম, স্যার আপনি আমাকে নতুন আলো দেখালেন।

সেদিন কলেজ সংক্রান্ত দু'একটি কথা বলে আমি ওঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে এলাম আমার অধ্যাপক জীবনের এক অমূল্য পথ-নির্দেশ।

আমাদের মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা ছিলেন মীরাদি। ডে কলেজে ঢোকার দিন থেকে এই মহীয়সী মহিলা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনে আসছিলাম। অসম্ভব এক ধরনের ব্যক্তিত্বের ছাপ সারা অবয়বে। মুখে প্রশান্তি আর দীপ্তির আশ্চর্য এক সংমিশ্রণ। স্বল্পবাক্, অত্যন্ত মিতাহারী। মেয়েদের যখন শাসন কিংবা সাবধান করার দরকার হয় তখন সারা কলেজে মীরাদির তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কলেজ চত্বরে বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো

সুযোগই তিনি দেননি ছাত্রীদের।

প্রথম দিন আমি ওঁর রুমে ঢুকে নত হয়ে নমস্কার করে নাম বললাম। উদ্দেশ্য বলতে যাবার আগেই উনি বললেন, কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন ? আমার মেয়েদের খুব অসুবিধে হচ্ছে।

বুঝলাম, ইতিমধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার পড়ানোর ব্যাপারে ওঁর কথা হয়ে গেছে।

বললাম, কাল থেকে ক্লাস নেব।

উনি বললেন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন।

আমি ওঁর মুখোমুখি চেয়ারে বসতেই বললেন, কোন সালে আপনার জন্ম ?

বললাম।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আমার ছেলে থাকলে আপনার বয়েসী হত।

মীরাদি অবিবাহিতা ছিলেন। ওঁর ওই একটি কথাতেই আমি সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

দিনের পর দিন ওঁকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমি দুঃখ পেতাম, ওঁর বাইরের রুক্ষ আবরণ আর রূঢ় আচরণ দেখে। মেয়েদের সামান্য ত্রুটিকেও উনি ক্ষমা করতেন না। কঠোর ভাষায় শাসন করতেন। 'গ্র্যায় মেয়েরা' বলে হাততালি দিলেই মেয়েরা চড়ুই পাখির মতো যে যার ক্লাসের ভেতর উড়ে পালাতে পথ পেত না।

বাইরে কোনো এক্সকারসানে গেলে কিন্তু মীরাদির অন্য মূর্তি। কলেজে যে মেয়েরা মীরাদির গলা শুনলেই তটস্থ তারা আবার ভ্রমণে মীরাদির বন্ধু। এমন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না এক মহিলা তখন সহজ রসিকতায় মেয়েদের বান্ধবী। মেয়েরা হাসির হুল্লোড় তুলছে, পাশের বেঞ্চে বসে উপভোগ করছেন মীরাদি। এই আনন্দ-যাত্রায় কেবল খুশীর হাওয়া বইবে, মেঘের গর্জন নয়। রান্নার লোক সঙ্গে। কোনো মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে মীরাদি তার খাবার নিজের হাতেই তৈরী করে দেবেন।

পাশে বসে সবাইকে খাওয়াবেন মীরাদি, কেবল নিজে ছাড়া। উনি সারাদিনে হয়ত কখনো একটা সন্দেশ আর একটু দুধ খেলেন। আবার কখনো দুখানা বিস্কুট। ব্যস হয়ে গেল। কি করে যে মীরাদি এমন স্বল্পাহারে এতখানি কাজের শক্তি ধরেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এ এক অসাধারণ অভ্যেস। আমরা বলতাম, মীরাদির খাদ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত। তাহলে অল্প খেয়ে কি করে অফুরন্ত জীবনী শক্তি লাভ করা যায় তা বাতলে দিতেন জনসাধারণকে।

মীরাদিকে দেখলে আমার মনে হয়, দেহ নয়, মনটাই আসল শক্তির উৎস। এমন ছোটখাটো, রোগা, কালো চেহারা, কিন্তু ইস্পাতের মত একটি মন কাজ করে চলেছে সারাক্ষণ।

সেই ১৯৩৮ সালের একটি ঘটনা। শাসক ইংরেজ ও তাদের সাম্প্রদায়িক সাঙ্গপাঙ্গরা তখন বাংলাদেশের মন্ত্রীসভাকে বাঁচাতে তৎপর। এদিকে জাতীয়তাবাদী শক্তিরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে আইনসভায়। ভোটে নির্ধারিত হবে জয় পরাজয়। একটি ভোটও তখন মহা মূল্যবান। চতুর্দিকে দারুণ উত্তেজনা।

এক তিরিশ বত্রিশ বছর বয়সের মহিলা শুয়ে আছেন হাসপাতালে। গুরুতর অসুস্থ তিনি। সামান্য নড়াচড়াতেও ডাক্তারের নিষেধ।

কিন্তু এই অসুস্থ মহিলাটি আইনসভার নির্বাচিত সদস্যা। তিনি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষেই ভোট দিতে চান। ইচ্ছা আছে, অদম্য ইচ্ছা, কিন্তু দেহে নেই একবিন্দু শক্তি। অবশেষে দেহকে উপেক্ষা করে মনই জয়ী হলো। ডাক্তারের বারণ অমান্য করলেন তিনি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে আইনসভায় ভোট দিয়ে এলেন।

তাই বলেছিলাম, মনের অসীম শক্তিতে দেহকে অতিক্রম করতে পারেন মীরাদি।

কলেজের ছাত্রী তখন মীরা দত্তগুপ্তা। বেশ নামকরা ছাত্রী। গোপনে তিনি নাম লেখালেন বাংলার সেরা বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সংগঠনে।

তারপর এম. এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এরপর চলল কলেজ গড়ার কাজ। বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ। সব শেষে সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ।

একদিকে শিক্ষা ও সমাজ সংগঠনের কাজ, অন্যদিকে রাজনীতি। বিপুল কর্মপ্রবাহের ভেতর মীরাদি লক্ষ্যে অবিচল। ১৯৪২এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মীরাদি। ভারতকে মুক্ত করতে হবে, এই ব্রত নিয়ে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজের শক্তি।

১৯৪৫এর সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলি। সারা দেশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। ধর্মতলা স্ট্রীটে ছাত্র মিছিলের ওপর গুলি চলল। শহীদ হলো বহু ছাত্র।

পরদিন সাধারণ ধর্মঘট। টহল দিচ্ছে ইংরাজ সৈন্য। ছাত্রেরা বেপরোয়া। তারা শহীদদের শব নিয়ে শোকযাত্রায় বেরুবে। বিরাট শোকযাত্রা এগিয়ে চলল। সেই সন্তানসম ছাত্রদের মায়ের মতো আগলে নিয়ে যাঁরা সারা পথ অতিক্রম করেছিলেন সেই মহীয়সী নারীদের অন্যতমা ছিলেন মীরা দত্তগুপ্তা।

আমাদের কলেজের বহু মেয়ে সমাজের দরিদ্র খেটেখাওয়া পরিবার থেকে পড়তে আসে। তাদের ওপর মীরাদির সহানুভূতির শেষ নেই। একদিন মীরাদির কাছে আমরা কজন বসে আছি। কোন্ কোন্ মেয়ে মাইনের ব্যাপারে কনশেসান পাবে, সে সম্বন্ধে নির্বাচন চলছিল। মীরাদি দরখাস্তকারী মেয়েদের বলে দিয়েছিলেন, তোমরা অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে আসবে।

অনেক মেয়ে আনতে পারেনি তাদের অভিভাবকদের। দিন মজুরী করে

সংসার চালাতে হয় তাঁদের। একদিন কামাই করলেই উনুনে হাঁড়ি চড়বে না।

এক একজন মেয়েকে ডাকা হচ্ছিল। তারা তাদের বাবা মা কত সামান্য কাজ করেন সে সব কথা বলছিল। বলতে বলতে কত মেয়ের চোখ ভেসে যাচ্ছিল জলে। মীরাদি সম্ভব মতো ওদের কনশেসানের পরিমাণ ঠিক করে দিচ্ছিলেন।

এক বৃদ্ধ অথর্ব অভিভাবক এলেন। তিনি চারতলার ওপর উঠে এসে হাঁপাচ্ছিলেন। মীরাদি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে একটি চেয়ারে বসালেন। বেয়ারাকে জল আনতে বললেন। জল খেয়ে সুস্থ হলেন ভদ্রলোক। বললেন, অতি অল্প মাইনেতে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। এখন বুড়ো হয়েছেন তাই চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন মালিক। শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে কাজের জায়গা থেকে।

কি করে আপনার সংসার চলে?

চারটি প্রাণী সংসারে। ছেলেটাকে পড়াতে পারিনি, সে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। লুকিয়ে খাবার সময় আসে। মায়ের পাতে দুচার গ্রাস খেয়ে পালায়। মেয়েটা কলেজে আসে, ঘরের কাজে অসুস্থ রুগ্ন মাকে সাহায্য করে, তার ওপর তিন চারটে টিউশানি করতে হয়। আমিও ওয়ান, টু ক্লাশের ছেলেদের পড়াই। দু' দশ টাকা পাই, বেশী লেখাপড়া তো শিখিনি।

মীরাদি মেয়ের সঙ্গে ভদ্রলোককে বাড়ি চলে যেতে বললেন। নিজে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন বৃদ্ধকে।

একটি মেয়ে ঢুকলো তার মাকে নিয়ে। আমাদেরই লজ্জা করছিল মহিলার দিকে তাকাতে। ময়লা ছেঁড়া একখানা শাড়ি পরেছেন। শাড়ির জায়গায় জায়গায় হলুদের ছোপ। দুহাতে হলুদের দাগ।

আপনি কি কাজ করেন?

ভোরবেলা এক বাড়ি বাসন মাজি। দুপুর আর সন্ধ্যায় রান্না করতে হয় অন্য এক বাড়িতে। এখুনি মা বাটনা বাটতে বাটতে উঠে এসেছি।

মীরাদি শান্ত গলায় বললেন, আপনি কাজে যান, আমি দেখছি কতটা কি করতে পারি।

মহিলা বেরিয়ে গেলে মীরাদি বললেন, আপনারা আমার মেয়েদের একটু যত্ন করে পড়াবেন। ওদের পড়ার বড় আগ্রহ। কত দুঃস্থ বাড়ি থেকে আসে ওরা নিজেদের চোখেই তো দেখলেন। আসে হয়ত উনুন ধরিয়ে দিয়ে, কলেজ থেকে ফিরে গিয়ে বাসন মাজতে বসে যায়।

মীরাদি প্রথম যখন সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজের গোড়া পত্তন করেন তখন সতের জন মেয়ে নিয়ে শুরু করেছিলেন। আর এখন সতেরশ ছাড়িয়ে গেছে। উনি বহুদিন নামমাত্র পাঁচটাকা মাইনে হিসেবে নিতেন। কয়েকজন নামকরা অধ্যাপকও কিছুকাল বিনা পয়সায় কাজ করেছেন।

প্রায় আমারই বয়সী এক অধ্যাপককে মীরাদি নাম ধরে ডাকতেন। অতি

সুদর্শন দীর্ঘদেহী মানুষটি। বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রাবস্থা থেকেই যুক্ত। যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। যুক্তির ধার থাকত সে সব কথায়। এক বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে অধ্যাপকদের ঘরে আমরা মিলিত হয়েছি। অনেকেই কিছু কিছু বললেন। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম ইতিহাসের ঐ অধ্যাপকটির মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি শুনে। 'আফ্রিকা' কবিতাটি যখন ওঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন মনে হচ্ছিল, আফ্রিকার আত্মার ধ্বনিটি যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি।

পরে মীরাদির ঘরে ঢুকে আমি আফ্রিকা কবিতার আবৃত্তিকারের সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা করলাম।

মীরাদি হেসে বললেন, ও গৌতমের কথা বলছেন? ওর মা আর আমি একসঙ্গে পড়েছি স্কুলে। তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। বাবার দিক থেকে বিদ্যাসাগরের রক্ত ওর গায়ে। আর মায়ের দিক থেকে ঠাকুরবাড়ির। রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের নাতনীর ছেলে ও। ওই যে একটা গান আছে রবীন্দ্রনাথের,—'ওগো বধূ সুন্দরী'—ও গানটা ওর মায়ের বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ লিখে সুর করে উপহার দিয়েছিলেন। গানটা ভারী সুন্দর। আমার কথাগুলো একেবারেই মনে থাকে না।

হেসে বললাম, আমার কিন্তু মনে আছে।

উনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বলুন তো।

গানের সুর আমার কানে বাজছিল। আমি কথাগুলো আবৃত্তি করে বলে গেলাম।

'ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন—
পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ—
উল্লাস-উতরোল বেণুবনকল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখিপল্লবে দিয়ো আঁকি বল্লভে
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন॥'

মীরাদি বললেন, কি অপূর্ব উপহার!

আর এক ইতিহাসের অধ্যাপক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনিও ছিলেন বামপন্থী চিন্তাধারার মানুষ। কিন্তু কোনো দিন কলেজে তাঁর মুখ থেকে রাজনীতির কোনো আলোচনা শুনিনি। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হতো উজ্জ্বল সদানন্দময় কর্মচঞ্চল এক যুবক। কারও সঙ্গে দেখা হলেই একমুখ হেসে

হাতটা ধরতেন। এমন ছাত্রবৎসল অধ্যাপক আমি খুব কমই দেখেছি। ডে আর মর্নিং সিফটে একদল ছাত্রছাত্রী প্রায়-সময় ওঁকে ঘিরে থাকত। তাদের সবরকম প্রব্লেমের সমাধান করে দিতেন উনি। একবার একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে ওঁর কাছ থেকে অনেকখানি সাহায্য পেয়েছিলাম। সেই থেকে ওঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা।

একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে আমি বাস ধরবো বলে ডানলপের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখলাম, অধ্যাপক মশায় এক তরুণীকে একটি বাসে তুলে দিচ্ছেন। তরুণীটির সঙ্গে দেখলাম, একটি ফুটফুটে মেয়ে। মনে হলো ওর বাচ্চা।

বাস ছেড়ে দিল। অধ্যাপক মশায় ফিরে দাঁড়িয়েই আমাকে দেখতে পেলেন।

আরে, এখানে আপনি ?

দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। ডানলপে নেমেছি সাউথের বাসটা ধরব বলে।

ঐ তো খানিক দূরেই আমার বাড়ি, চলুন, চলুন। আপনার বৌদি এতক্ষণে অফিস বেরিয়ে গেছেন কিন্তু।

আমাদের কলেজের সেদিন ছুটি ছিল। প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথের জন্মদিন।

বললাম, আর্টিস্ট বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হলো না তাই ফিরে এসেছি তাড়াতাড়ি। চলুন, আপনার বাড়িটা দেখেই আসি।

আমরা হেঁটে মিনিট কয়েকের ভেতর ওঁর বাড়িতে পেঁাছে গেলাম। ছোটর ওপর বেশ ছিমছাম বাড়ি। সবুজ গাছগাছালিও রয়েছে।

বৌদি গভর্নমেণ্টের বড় একটি পোস্টে কাজ করেন। তিনি অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

অধ্যাপক রায়চৌধুরী বললেন, আজ আপনি এখানে মধ্যাহ্নভোজটি সেরে গেলে কি বৌমা গোঁসা করবেন ?

আমি বেলা একটা অব্দি বাইরে থাকার অনুমতি নিয়ে এসেছি।

অধ্যাপক রায়চৌধুরীর সে কি হাসি, বাইরে এলে বৌমার অনুমতি নিতে হয় বুঝি ?

ঠিক তা নয় তবে ফেরার সময়টা অবশ্যই জানিয়ে আসতে হয়।

লেখক আর শিল্পী মানুষরা কি এত সময় হিসেব করে চলতে পারেন ?

আর বলবেন না। টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম, কখন খেতাম কখন শুতাম তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। বিয়ের পরে অভ্যেস কিছুটা সিধে হয়েছিল কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলে'। একবার একটা অঘটন ঘটিয়ে বসলাম।

কি রকম ?

শিল্পী বিভূতি সেনগুপ্ত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বসেন বীণা সিনেমার উল্টোদিকে রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেটে। আমার বইয়ের ছবি বিভূতিবাবু

আঁকেন। আমি সারাক্ষণ বসে বসে দেখি। দুজনের আলোচনার ভেতর দিয়ে প্রচ্ছদের কাজও এগিয়ে চলে। বিভূতিবাবু থাকেন টালিগঞ্জের দিকে। কাজের চাপ থাকলে কোনো কোনোদিন তিনি শেষ ট্রামে বাড়ি ফেরেন। এ বিষয়ে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া আছে, তাই বিপত্তি ঘটে না।

একটি বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা হবে সেদিন। ছোটখাট সব কাজকর্মগুলো সেরে নিয়ে ঠিক সন্ধ্যের মুখে আমার বইয়ের কভার ধরলেন বিভূতিবাবু। আমি প্রথমে কোনো একটি শারদীয় পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখাটি পড়লাম। অবশ্য কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে। এখানেই রাত্রি আটটা বাজল। এরপর দুজনে আলোচনায় বসে প্রচ্ছদের বিষয়বস্তু ঠিক করা হলো। বিভূতিবাবু আর্টপেপার সাইজমত কেটে একটা স্কেচ করলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে আমার নায়িকার চেহারাখানা লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। স্কেচ শেষ হলে একটু রদবদলের পর রঙ গুলতে বসলেন শিল্পী। ছবির ওপর রঙ বুলিয়ে প্রচ্ছেদটি যখন সম্পূর্ণ হলো তখন আমার মন তৃপ্তিতে ভরে গেছে।

বললাম, বিভূতিবাবু, ফাইন্যাল ড্রয়িংয়ের আগে আমি কভারটা একবার শ্রীমতিকে দেখিয়ে নিতে চাই।

শিল্পী বললেন, বেশ তো। বলেই উনি বাড়ি ফেরার জন্যে তোড়জোড় করতে লাগলেন।

এতক্ষণ আমি ঘড়ি দেখিনি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি কখন বারোটা বেজে গেছে। আমি বললাম, সর্বনাশ, বাড়িতে কি ভাবছে! তাছাড়া আপনার তো শেষ ট্রাম ধরা হবে না।

দুজনে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি পাকড়াও করলাম। ওঁকে টালিগঞ্জ ট্রামডিপো পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমি ঐ ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব সন্তোষপুরের বাসায়।

বাড়িতে ঢুকলাম, রাত একটা। ভাড়া মিটিয়ে হন্তদন্ত হয়ে দোতলার ওপর উঠলাম। দেখি সঙ্গীতা রাস্তার ধারের জানলার গরাদ ধরে একদৃষ্টে পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

ও আমাকে ঘরে ঢুকতে নিশ্চয় দেখেছে। কিন্তু একবারও পায়ের সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল না। ও গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমি পেছন থেকে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আশ্চর্য! একটা পাতার মত ও ডাল থেকে যেন খসে পড়ে গেল মেঝেতে। মুখে কোনো কথা তো নেই। ভয়ে উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছে। দুচোখ বন্ধ। কিন্তু দুগাল বেয়ে প্লাবনের মতো জলের স্রোত বইছে।

সেদিন বাড়িতে আমাদের কাজের মেয়ে নর্মদাদি ছিল না। সে দেশে গিয়েছিল। এই আসে, এই আসে ভাবতে ভাবতে রাত বেড়ে গেছে। প্রতি-বেশীদের বাড়িতেও সে যেতে পারেনি। একাই এত বড় একটা দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে সে। তার পরেই পতন এবং মূর্ছা।

অধ্যাপক রায়চৌধুরী বললেন, এরপর বৌমাকে কভারের ছবিটা দেখাতে শান্ত হলেন নিশ্চয় ?

ক্ষেপেছেন। তখন ছবিটা দেখালে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিত। কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল ওকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। পরের দিন সকালে কভারটি দেখাতে দারুণ খুশী। আমি বললাম, সবুরে ম্যাওয়া ফলে। ভাল জিনিস পেতে গেলে একটু সময় দিতে হয়।

ও আমার একখানা হাত চেপে ধরে বলল, কথা দাও, এবার থেকে যেখানে যাও ফেরার মোটামুটি একটা সময় আমাকে বলে যাবে।

গত রাতে একটা মানুষ এত কষ্ট পেয়েছে, তাই বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

সেই থেকে আমি কথা রক্ষার চেষ্টা করে আসছি।

অধ্যাপক রায়চৌধুরী বললেন, তাহলে আপনি কিছু জলযোগ করে যান। একটু আগে আমার এক পুরানো ছাত্রী এসেছিল। তার জন্যে জলখাবার তৈরী করেছিলেন আপনার বৌদি। পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারেননি, তাই অতিরিক্তটা ফ্রীজে ঢুকেছে। আমার কাজ ঠাণ্ডাঘর থেকে ওকে বের করে গরম করে নেওয়া।

উনি তাড়াতাড়ি ফ্রীজ খুলে খাবার গরম করতে লেগে গেলেন।

বললাম, এত তাড়া কিসের ?

উনি বললেন, আপনি যা শোনালেন তাতে একটু আগে ভাগে বাড়ি ফেরা ভাল।

খাবার খেতে খেতে গল্প চলল আমাদের। আমি বললাম, যে ছাত্রীটি আপনার কাছে এসেছিল তাকেই কি আপনি বাসে তুলে দিতে গিয়েছিলেন ?

ঠিক তাই। ও হিস্ট্রি অনার্সের ছাত্রী ছিল। ও যখন ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে তখন আপনি সবে কলেজে এসেছেন। আচ্ছা, মেয়েদের সোস্যালে আপনি কি কোনো একটি মেয়েকে নাচতে দেখেছেন ?

দিব্যি মনে পড়ছে। শান্তা কুট্টি বলে একটি মেয়ে সবুজ পাড়ওয়ালা একটা সাদা কাঞ্জীভরম পরে 'মোহিনী আট্টম' নেচেছিল।

দারুণ মনে আছে তো আপনার।

সুন্দর কোনো কিছু দেখলে সহজে ভোলা যায় না।

ওর পারফরমেন্স সেদিন আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

অধ্যাপক রায়চৌধুরী কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বললেন, মেয়েটি কিন্তু বড় দুঃখী।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, কি রকম !

আজ পাঁচবছর পরে আমার বাড়ি এল। ছোট্ট মেয়েটাকে সঙ্গে এনেছিল। বৌদিকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না।

কান্না কেন ?

সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলি। তখন আমাদের বাসা ছিল কলেজের

প্রায় কাছাকাছি। কেরালার এই মেয়েটি আমার বাড়িতে আসত, পড়া বুঝে নিত। কখনও বা প্রশ্নের উত্তরগুলো দেখিয়ে নিত। একদিন বলল, স্যার আমাকে পড়াবেন ?

বললাম, আমি তো টিউশানি করি না। তোমরা যখন খুশী এস, আমার সময় থাকলে আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেব।

ও সেদিন বসেছিল, আর একটি ছেলে সেইসময় ঘরে এসে ঢুকল। প্রেসিডেন্সীর ছাত্র ছিল। এখন সিক্সথ্ ইয়ারে পড়ছে। প্রায়ই আমার কাছে এসে ইতিহাসের বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে আলোচনা করে। আমার ধারণা ছিল ও ফার্স্ট ক্লাশ পাবে।

ওদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। দুজনে যেদিন এসে পড়ত, সেদিন কিছু আলোচনার পর আমি বলতাম, সৌগত তুমি তো কলেজ স্ট্রীটের দিকে যাচ্ছ, শান্তা ওখানেই টু-বি বাস ধরবে, তুমি ওকে বাসে তুলে দিও।

আমি তখন বুঝতে পারিনি ভাই, সপ্তপদ একসঙ্গে চললেই বন্ধুত্ব হয়। ওরা এই চলার পথে কখন যে নিবিড় বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ হলো, তার বিন্দুমাত্র আভাস আমি পাইনি।

একদিন মেয়েটা কেঁদে পড়ল ওর বৌদির কাছে। সে সৌগতকে ভালবাসে। তাকে বিয়ে করতে চায়।

ওর বৌদি বললেন, দুজনে দুজনের বাড়িতে এই সম্পর্কের কথা জানিয়েছ কি ?

না।

সোজা জানিয়ে দাও যে তোমরা পরস্পরকে ভালবেসেছো, বিয়ে করতে চাও।

শান্তা বলল, আপনি যত সহজে কথাটা বলার চেষ্টা করলেন, ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয় বৌদি। ও চেষ্টা করলে ওর বাড়ির বাধাটা হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারবে, কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা আসবে আমার বাড়ি থেকে। বাবা মা দক্ষিণ কলকাতায় আছেন। আমি তাঁদের একটি মাত্র মেয়ে। বাবা গতবছরই সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন। আমার আর কয়েক-মাস পরীক্ষা দিতে বাকী, তাই ওঁরা কেরালার বাড়িতে ফিরে যেতে পারছেন না।

ওর বৌদি বললেন, সামনে পরীক্ষা, এসময় এই নিয়ে গণ্ডগোল হলে তোমার পরীক্ষাটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

ও কেঁদে বলল, তাহলে আমার কি হবে বৌদি ?

তুমি আগে পরীক্ষাটা দিয়ে নাও, তারপর বাবা মাকে কথাটা জানাও।

আমি ওঁদের জানি, কোনোরকমেই রাজী করানো যাবে না। ওঁরা স্বজাতির ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। আমার মা ক্লাসিক্যাল গান করেন। দারুণ সেণ্টিমেণ্টাল। কথাটা শুনে উনি হয়ত সুইসাইডই করে বসবেন।

এতসব যদি জানো তাহলে ভালবাসতে গিয়েছিলে কেন ?

আবার হাউ হাউ করে কান্না।

মেয়েটি শেষরক্ষা কিন্তু করতে পারেনি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েকে নিয়ে বাবা মা সোজা কেরালা চলে গিয়েছিলেন। মেয়ের ব্যাগে ইংরাজীতে লেখা সৌগতর একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করেছিলেন ওর মা। মেয়েকে কিছু না বলে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে সটান কেরালায় প্রস্থান।

সৌগত ওদের কেরালার অ্যাড্রেস জানত না। আর কেরালাতে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন মা। বাবা শুধু বলেছিলেন, তুমি জান, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। তুমি কি চাও তোমার জন্যে তোমার মা এই সংসার থেকে বিদায় নেন। তুমি ভাল করেই তোমার মাকে জান।

মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল শান্তা, কিন্তু এমন শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারেনি যাতে কেরালা থেকে চলে এসে সৌগতর সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

কিছুদিন পরে শান্তার সঙ্গে ওদের স্ব-জাতীয় একটি ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। ছেলেটি অত্যন্ত ব্রাইট। আমেরিকা প্রবাসী ইঞ্জিনীয়ার।

পাঁচ বছর পরে কলকাতায় কি একটা কনফারেন্সে এসেছেন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, সঙ্গে স্ত্রী আর মেয়ে। সুযোগ করে কলেজ থেকে ঠিকানা নিয়ে শান্তা আমাদের সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছিল।

ও এখন সুখী হয়েছে তো?

সুখ কাকে বলে জানি না ভাই। মেয়েদের মন নাকি দেবতাও জানতে পারে না। ওর কাছে ওর স্বামীর কালার ফটো দেখলাম। নিজেদের বাড়ি আর গাড়ির সামনে স্ত্রী আর ফুটফুটে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েকে নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুশীতে ভরপুর।

বললাম, তাহলে আর দুঃখটা কোথায়?

অধ্যাপক রায়চৌধুরী বললেন, এত বছর পরে আমার বাড়িতে এসে সৌগতের জন্যে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। সে হাহাকার আর ডুকরে ডুকরে কান্না আপনি যদি দেখতেন ভাই। পাষাণও গলে যায়। ও সৌগতের কথা জানতে চেয়েছিল। আমি বললাম, কি হবে ওসব জেনে। যে জীবন পেয়েছো তাকেই সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করো। তবে তোমাকে এইটুকু জানাই, সৌগত অধ্যাপনা করছে, এখনও সে বিয়ে করেনি।

আবার হাউ হাউ করে কান্না।

বললাম, কি হলো আবার।

ওর হয়ে ওর বৌদি বললেন, বুঝতে পারছো না, সৌগত বিয়ে করেনি জেনে ও কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

আজ ভাই আমাদের অনেক সময় লাগল মেয়েটিকে প্রবোধ দিয়ে ওর হোটেলে পাঠাতে। যাবার সময় একটি কথা বললাম, তুমি কিন্তু সৌগতকে খোঁজার আর চেষ্টা কোর না, তাহলে দুজনের দুঃখের আর কোনো সীমা থাকবে না।

শান্তা কুট্টির কথা শুনে আমার মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

চোখের সামনে ফুটে উঠল একটা ছবি, মোহিনী আট্টমের লাস্যময়ী লীলায় নেচে চলেছে একটি তরুণী। সমুদ্রমন্থন থেকে উত্থিত অমৃত ভাণ্ড নিয়ে মোহিনী মায়ার আড়ালে দর্শকদের মূর্ছাহিত করে সে চলে যাচ্ছে যবনিকার অন্তরালে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সে কি পেল তার সঞ্জীবনী সুধা?

প্রতিমা ছিল আমাদের বাংলা বিভাগের সর্বকনিষ্ঠা অধ্যাপিকা। তার বাবা ডে-কলেজের প্রিন্সিপাল রমণীমোহন রায়ের সুবাদে সে ছিল আমাদের বহু দিনের পরিচিত। একদিন প্রফেসার্স রুমে আড্ডা জমে উঠেছে, প্রসঙ্গ—মীরাদি।

একসময় প্রতিমা তার সরস অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করল।

বাবার সঙ্গে আমি আর দিদি গিয়েছিলাম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ সুরেন্দ্রনাথ দিবাকলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গানের জলসা শুনতে। তখন অনেক ছোট। প্রথম দিকের সারিতে একটা চেয়ারে বসেছি, হঠাৎ দেখি রোগামত এক বয়স্কা মহিলা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'খুকী তুমি এখানে শতরঞ্জীতে এসে বস তো।' বলেই আমাকে চেয়ার থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে সামনে পাতা শতরঞ্জীতে বসিয়ে দিলেন। একে চেয়ার থেকে নামিয়ে শতরঞ্জীতে বসানো, তাতে খুকী বলা, এ অপমানে রাগে দুঃখে মহিলাটির ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম। ফাংশান শেষ হলে মহিলার বিরুদ্ধে দিদির কাছে নালিশ জানালাম। দিদি হেসে বলল, 'আরে ঐ তো মীরাদি।'

মীরাদির নাম আমার বাড়িতে অনেক আগেই শুনেছি, কিন্তু কখনো তাঁকে দেখিনি। কিন্তু দিদির কথাতেও আমার রাগ গেল না। কলেজের ছাত্ররা গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিল দেখে গাড়িতে কোনো রকমে সামলে চুপ করে রইলাম। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই বাবাকে চেপে ধরলাম, 'এই নাকি তোমাদের মীরাদি, আমাকে কিনা খুকী বলা, চেয়ার থেকে নামিয়ে শতরঞ্জীতে বসিয়ে দেওয়া।' বাবা শুনে একচোট হেসে বললেন, 'এই কথা, তা তুমিই তো অন্যায় করেছিলে, কত বড়রা দাঁড়িয়ে আছেন আর তুমি ছোট হয়ে শতরঞ্জীতে না বসে চেয়ারে বসেছিলে। মীরাদির কাছে সবসময় ন্যায়বিচার পাবে।'

ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে মীরাদি একদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। বাবা আমাকে ডেকে দেখিয়ে আমার সেদিনের অভিমানের কথা বলতে মীরাদি খুব একচোট হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আর খুকী বলব না, তবে খুকী না হয়ে বড় হতে হলে অঙ্ক রাইট করতে হবে কিন্তু।'

আমি লজ্জায় আর অঙ্কের ভয়ে দৌড়ে পালালাম।

সেই ছোট্ট প্রতিমাটি একদিন আমাদের মহিলা কলেজে এল অধ্যাপিকা হয়ে। আমি বিভাগীয় প্রধান, ও আমার বাংলা বিভাগেই কাজ নিয়ে এসেছে। কিছুকাল আগে দিবা বিভাগের প্রিন্সিপাল রমণীবাবুর সঙ্গে আমার একটু

মনান্তর হয়েছিল। আমি ওঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু তীব্র অভিমানে কিছুকাল ওঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল।

এখন ওঁর স্নেহের মা-মরা মেয়ে প্রতিমা আমার ডিপার্টমেণ্টে কাজ নিয়ে এসেছে। রমণীবাবু আমাকে দীর্ঘ একটি চিঠি দিলেন। তার ভেতর লিখলেন, আমি যেন ছোট বোনের মতো প্রতিমার দিকে লক্ষ্য রাখি।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি প্রতিমার ক্লাশে ঢুকে প্রতিমার সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। প্রতিমা ডিবেটে পুরস্কার পাওয়া মেয়ে। সে অল্পদিনের ভেতরেই ক্লাশ জমিয়ে নিল। ভারী শোভন সুন্দর ব্যবহার তার। কলেজের প্রত্যেকটি অধ্যাপকের সঙ্গে নিবিড় হয়ে উঠল তার সম্পর্ক।

প্রতিমার বিয়ে হলো। আমরা প্রিন্সিপাল রমণীবাবুর বাড়িতে খুব খাওয়া-দাওয়া করলাম।

দু-বছর পরে সামার ভ্যাকেশনের আগের দিন। অধ্যাপকরা কে কোথায় যাবেন তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ছুটি হয়ে গেল। সবাই উঠে চলে যাচ্ছিলেন, প্রতিমা এসে হঠাৎ আমাকে প্রণাম করল। ও তখন জননী হতে চলেছে।

আমি বললাম, কি হলো, এ তো পুজোর ছুটির পরের দেখা নয় যে বিজয়ার প্রণাম পাব। গরমের ছুটির আগে তো প্রণামের রীতি নেই।

প্রতিমা বিনীত হাসি হেসে বলল, কি জানি স্যার প্রণাম করতে ইচ্ছা হলো, তাই করলাম। অনেক দিন তো আর দেখা হবে না।

প্রতিমা চলে গেল। হঠাৎ শুনলাম একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে প্রতিমা। সন্তান সুস্থ, কিন্তু মায়ের জীবন-সংশয়।

প্রতিমাকে দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় আর এক অধ্যাপক এসে খবর দিলেন, প্রতিমা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

বুকের যন্ত্রণার ভেতরে কান্না সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার কানে বারবার বাজছিল প্রতিমার সেই শেষ কথা, 'অনেক দিন তো আর দেখা হবে না।'

উৎসবের আনন্দ পূর্ণ হতে না হতেই প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আশ্চর্য এক মায়াদর্পণ আমার চোখের সামনে কেউ যেন তুলে ধরেছে, আমি তার ভেতর বিচিত্র জীবনের অভাবিত সব চলচ্ছবি দেখছি। কখনো শোকের সাগরে তুফান উঠছে। আকাশ জুড়ে তাল তাল মেঘ নাগিনীর মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ভেঙে চুরে এগিয়ে আসছে। এখুনি ঘটে যাবে মহাপ্রলয়। অস্তিত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। আবার সে ছবি সরে গিয়ে ফুটে উঠছে জীবনের আনন্দ আশ্বাসে ভরা সুখচিত্র। একটি ফুলের ফুটে ওঠা, একটি পাখির সুরেলা কণ্ঠের গান খুলে দিয়ে যাচ্ছে অনন্ত আনন্দ-লোকের দ্বার। সেই পথে জীবনদেবতা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তাঁর গায়ে ভোরের সোনালী সূর্যের সুতোয় বোনা উত্তরীয় জড়ানো। সে উত্তরীয়ের

প্রান্ত লুটিয়ে পড়েছে ধরিত্রীর মৃত্তিকায়। অমনি বসুধার গর্ভ থেকে জেগে উঠছে শ্যামল সবুজ তৃণ। জীবন কত সুন্দর। তার করধৃত মঞ্জুষায় কত রত্নের বৈভব।

এই মুহূর্তে আমি ঐ মায়াদর্পণে দেখতে পাচ্ছি, আমার দুটি অতি পরিচিত ছাত্রীর মুখ। একজন কলেজের পাঠ এবং আর্ট কলেজের শিক্ষা শেষ করে পুরোপুরি শিল্পচর্চায় মগ্ন। অন্যজন কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তম গুরুর কাছে নাচের তালিম নিয়েছে। এখন বিচিত্র জীবনের রঙ্গমঞ্চে শুরু হয়েছে তাদের আশ্চর্য অভিনয়। আমি আর সংগীতা যে নাট্যের দর্শক।

বাইরে বেরিয়ে আসুন ভিক্ষু উদয়ভদ্র, বাইরে বেরিয়ে আসুন। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

তিনবার নারীকণ্ঠের এই আকুল আহ্বান শুনতে পেলাম।

অজন্তার পাহাড় ঘেঁষে বিরাট এক প্রান্তর দিগন্ত ছুঁয়ে আছে। প্রান্তরের একদিকে ছোট ছোট কয়েকটি টিলা, তাদের পেছনে বুনো গাছ আর গুল্মের জঙ্গল। চার পাঁচটি ঝুপড়ি ছাড়া ঐ টিলা প্রান্তরে আর কোনো আবাস নেই। এখন একটিমাত্র ঝুপড়িতেই আলো জ্বলে। সাত বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে তার মা ঘর আগলায়। পুরুষটি মাঝে মাঝে এসে পড়ে ঘর-সংসারের দরকারী মালপত্র নিয়ে। সে কাজ করে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ফরদাবাদ গেস্ট হাউসে।

রামবিলাসের বাবা গঙ্গারাম গেস্ট হাউসে ঝাড়পোঁছের কাজ করত, দরকারী জিনিসপত্র বয়ে আনত হাটবাজার থেকে। তাছাড়া অজন্তা দর্শনার্থীদের ফাইফরমাস খেটে কিছু উপরি রোজগারও হতো তার। ভারী দিলখুশ মানুষ ছিল সে।

হঠাৎ হাসিখুশী মানুষটা এক রাতে ঘুমের ভেতরেই দুম করে চলে গেল। দেশ থেকে এলো তার ছেলে রামবিলাস। সেও বাপের মতো সাচ্চা আর ভাল মানুষটি। অনেক তদ্বির তদারক করে বাপের জায়গায় তাকে এনে বসালেন গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার সাহেব।

এই হলো ফরদাবাদে রামবিলাসের আগমন-বৃত্তান্ত। কিন্তু অজন্তার কাছে পরিত্যক্ত ঐ পাথুরে প্রান্তরে কি করে রামবিলাস তার বউ আর ছেলেকে দেশ থেকে এনে একটা ঝুপড়িতে তুলল, সে আর এক কাহিনী।

আমি আর সংগীতা, অজন্তা দেখতে এসে জড়িয়ে পড়লাম অবাক-করা এক ঘটনার আবর্তে। যে ঘটনার একটা চরিত্রের সঙ্গে প্রায় সাত বছর আগের একটা যোগসূত্র ছিল আমাদের। শিথিল হয়ে আসা যে বাঁধনটা কালের প্রবাহে প্রায় খুলে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, সেটা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কোন যাদুকরী একটা গিঁট দিয়ে হঠাৎ শক্ত করে তুলল।

আগে রামবিলাসের ঝুপড়ি তৈরীর কাহিনীটি শোনা যাক।

ফরদাবাদের গেস্ট হাউসে আমি আর সংগীতা সেদিন জলগাঁও স্টেশান

থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলাম। একেবারে ভীড় ছিল না গেস্ট হাউসে।
আমরা যেদিকটাতে উঠেছিলাম, সেখানে খিদমতগার ছিল রামবিলাস।

বাথরুম থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে পেয়ে গেলাম ধূমায়িত চায়ের কাপ। অঘ্রানের শেষ। পাথুরে মাটিতে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। গরম চা আর বিস্কুটে বেশ আমেজ এসে গেছে। এক কাপ চা শেষ করেছি হঠাৎ পর্দার ওপার থেকে রামবিলাসের গলা শোনা গেল, আরও দুকাপ চা আনলাম বাবুসাহেব।

বললাম, ভেতরে নিয়ে এসো।

ও চা দু'কাপ টেবিলের ওপর রেখে দিলে। ধোঁয়া উঠছিল।

বললাম, তুমি বুঝলে কি করে রামবিলাস যে আমাদের আর এক কাপ করে চায়ের দরকার?

রামবিলাসের মুখে মৃদু হাসি, ও আমার মালুম হয়ে গেছে বাবুসাহেব। বাঙালী বাবুদের বড্ড বেশী শীতের ভয়। তাই এক কাপ চায়ে শানায় না।

সংগীতা রামবিলাসের কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছে। সে বলে উঠল, তুমি এমন বাংলা শিখলে কি করে রামবিলাস?

এক বাঙালী মাঈজী শিখিয়েছেন।

তুমি কি কোনো বাঙালীবাবুর বাড়িতে ছিলে?

না মাঈজী, এখানেই শিখেছি।

এখানে বাঙালী কোনো অফিসার ফ্যামিলি নিয়ে আছেন নাকি?

রামবিলাস মাথা নাড়ল, না মাঈজী।

তবে?

আমাদের কোঠীতে এক বাঙালী মাঈজী থাকেন, তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।

সংগীতা ভেবে বসল, কাছাকাছি কোনো জায়গায় হয়তো রামবিলাসের ডেরা, সেখানে একজন বাঙালী মহিলা কোনো কারণে এসে পড়েছেন। সে অমনি বলে উঠল, আমাকে তোমাদের কোঠীতে নিয়ে যাবে, আমি তোমার মাঈজীর সঙ্গে দেখা করে আসব।

সে তো আজ হবে না মাঈজী। পাঁচ কিলো মিটার পথ গেলে আমার ডেরা, ওখানে মাঈজীর দেখা মিলবে। অজন্তা তো দেখতে যাবেন, ওরই কাছবরাবর আছে।

আমি বললাম, ওখানে উনি গেলেনই বা কি করে? তোমার সঙ্গে পরিচয় হলোই বা কোথায়?

রামবিলাস মেঝেতে পাতা কার্পেটের এক পাশে বসে পড়ল। আমার প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে বলল, সে অনেক কথা বাবুজী, প্রায় তিন বরষ পার হয়ে গেল, মাইজী আমার বেটা আর বউয়ের সাথে ঝুপড়িতে রয়েছেন।

তাজ্জব! ব্যাপারটা একটু খুলে বল রামবিলাস, ভারী অবাক লাগছে।

সংগীতা নড়ে চড়ে বসল। তার একাগ্র চোখের দৃষ্টি আঠার মতো আটকে

রইল রামবিলাসের মুখের ওপর।

বাবুসাহেব, বছর চারেক আগের কথা। তখন বারিষ পড়ছিল আশমান ফেঁড়ে। এক সাধু এসে উঠলেন আমাদের এই গেস্ট হাউসে। ম্যানেজার বাবুর মুখ থেকে জানলাম, ঐ সাধু বুদ্ধ-মহাত্মার ভক্ত আছেন।

পরের দিন ভোরবেলা সাধুজী পোঁটলাপুঁটলি বগলে পুরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, অজন্তা গুহার পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছেন।

এরপর সাধু মহাত্মা আর গেস্ট হাউসে ফিরে এলেন না। আমি কিন্তু চার পাঁচ রোজ বাদ অজন্তা যাবার পথে ওনাকে দেখতে পেলাম। উঁচু পাহাড় থেকে দেখলাম, নিচে জঙ্গলে ঘেরা একটা টিলার ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

একদল যাত্রীর গাড়িতে আমি অজন্তা গিয়েছিলাম। গুহার ছবিগুলো দেখা শেষ হয়ে গেলে ওঁদের বললাম, আপনারা গাড়িতে গেস্ট হাউসে চলে যান, আমি পরে যাচ্ছি।

তুমি ঐ সাধুর খোঁজ নেবে বলে থেকে গেলে বুঝি রামবিলাস ?

আমার কথার উত্তরে ও শুধু বলল, ঠিক ঠাউরেছেন বাবুসাহেব। আমি ভাবলাম, কাছেপিঠে লোক-বসতি নাই, ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গলের ভিতর সাধু করেন কি !

আমি অনেকখানি পথ ঘুরে নিচে পোঁছলাম। সামনের খোলা মাঠখানা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম জঙ্গলের সীমানায়।

সঙ্গীতা বলল, সাধুর সঙ্গে দেখা হলো তোমার ?

হলো মাঈজী। দেখলাম একটা টিলার ভিতরে গুহা তৈরী করা আছে। সামনে পাথরের চাঙড় দিয়ে গুহার মুখটা ঢাকা। খালি একটা লোক আঁকাবাঁকা মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। গুহার পাশে একটা জানালা কাটা। বেশ ছোট আর গোল। বোধহয় সামান্য আলো হাওয়া ঢোকার একটা পথ রাখা হয়েছে।

আমি বললাম, রামবিলাস, অজন্তায় গুহা আছে জানি, কিন্তু ঐ নিচু টিলায় গুহা এলো কোথা থেকে ?

বাবুসাহেব, যারা উঁচু পাহাড় কেটে অজন্ত-গুহা বানিয়েছিল তারা অন্য কোনো দরকারে ঐ নিচের গুহাও বানাতে পারে। এমনও হতে পারে, কোনো সাধু মহাত্মা নির্জনে সাধন-ভজনের জন্য ওটা বানিয়েছিলেন।

তা হতে পারে। এখন বল, সাধুর সঙ্গে তোমার কি কথা হলো ?

আমি গিয়ে সাধুজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। উনি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, রামবিলাস না ? এখানে এলে কি করে !

বললাম, দূরের গাঁও চক্কর মেরে ঐ ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লাম সাধুজী।

উনি বললেন, এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।

সাধুজী গুহার ভিতর ঢুকলেন। যখন বের হয়ে এলেন তখন মুঠিভরা শুকনো ফল। আমার হাতে ফল দিয়ে বললেন, খাও।

আমি খেলাম। উনি কাঠের পাত্রে আমাকে জল দিলেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম, সাধু আমাকে খাওয়ালেন, আমিও সাধুকে খাওয়াবো।

সেই দিন থেকে হপ্তায় একটি দিন আমি সারা হপ্তার খাবার গুহার মুখে সাধুজীর সেবার জন্য রেখে আসতাম।

কখনো সখনো দেখা হয়ে গেলে হাত তুলে অল্প অল্প হাসতেন। সে কি হাসি বাবুজী! মোহন মুরলিয়ার হাসি। যুবা পুরুষ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। মালুম হতো বুঝিবা কোনো দেওতা আছেন।

কথা বলতে বলতে থামল রামবিলাস।

সঙ্গীতা বলল, এ তো তোমার এক সাধুজীর গল্প। এখন তোমার সেই মাঈজীর কথা বল, যিনি তোমার কুঠীতে আছেন।

ভারী আনন্দের একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে রামবিলাস সহজ গলায় বলল, সাধুজীর তপস্যার কি জোর! মাঈজীকে টান মেরে নিয়ে চলে এলেন।

রহস্য বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। শীতের সন্ধ্যা, বন্ধ কাচের জানালা। আমরা পাশে পড়ে থাকা দুটো গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে বসলাম।

আমি বললাম, সে কি ব্যাপার, সাধুর টানে মাঈজী এতদূরে চলে এলেন!

হাঁ বাবুজী। দুনিয়া ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এক বরষ বাদ মাঈজী এসে উঠলেন এই গেস্ট হাউসে। আমাকে বললেন, কোনো সাধুকে আমি অজন্তায় আসতে দেখেছি কিনা?

সাধুজীর চেহারার একটা আন্দাজও বাতলে দিলেন।

আমি বললাম, ঐ সাধুর সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। পরশু রোজ আমি ওনার ডেরায় যাব, তখন আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারবেন।

মাঈজীর সঙ্গে আমার অনেক কথা হলো। তাঁর মিনতি দেখে আমি ভোর-বেলায় ট্যুরিস্টদের সঙ্গে তাঁকে অজন্তার গাড়িতে নিয়ে গেলাম।

অজন্তাগুহার ছবি দেখে ট্যুরিস্টরা খুব তারিফ করছিল। মাঈজী তাদের সঙ্গে ঐ সব ছবি নিয়ে এমন আলোচনা জুড়ে দিলেন, ট্যুরিস্টরা একদম থ বনে গেল।

মাথার ওপর রোদ চড়লে গাড়ি ফিরল ট্যুরিস্ট লজে। আমি মাঈজীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম সাধুজীর গুহায়।

বাইরে সামান রেখে হাঁকলাম, সাধুবাবা আপনার জন্য সামান্য সেবা।

ভিতর থেকে কোনো সাড়া পেলাম না বাবুজী। কিছু সময় বাদ সাধুজী বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মাঈজীকে সামনে দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। সাধুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন মাঈজী। আমি দেখলাম, মাঈজীর দু'চোখ বেয়ে আসু গড়িয়ে পড়ল।

সাধুজীর সঙ্গে মাঈজীর কি সব বাতচিৎ হলো আমি জানতে পারলাম না। সাঁঝ নামলে, মাঈজীর সঙ্গে আমি ফিরে এলাম ট্যুরিস্ট লজে।

অনেকক্ষণ একা একটানা কথা বলে থামল রামবিলাস।

খানিক পরে মুখ তুলে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করল, বাবুজী রাতের খানায় কি খাবেন ?

আমি সংগীতার সঙ্গে আলোচনা করে রাতে দুটো নিরামিষ থালি দিতে বললাম।

রামবিলাস যথাস্থানে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

সংগীতা বলল, কোথায় যাচ্ছ রামবিলাস, তোমার গল্প যে শেষ হলো না ?

জলদি ফিরে আসার আশ্বাস দিয়ে রামবিলাস দ্রুত চলে গেল।

ফিরে এসে আবার বসল।

বাবুসাহেব, তিন রোজ কোনো সংগীসাথী না নিয়ে স্রেফ একাই যাওয়া আসা করলেন মাঈজী। ট্যুরিস্ট লজ ছাড়ার আগে আমাকে বলে গেলেন, আমি ফিরে আসব। তুমি টিলার ধারে চার পাঁচটা ঝুপড়ি বানাও। পাথর কেটে ঘর তৈরী করতে পারে এমন কারিগর এনে ঐ ঝুপড়িগুলোতে রাখ।

মাঈজী আমাকে বেশ কিছু রুপেয়া দিয়ে চলে গেলেন।

দুমাস পরে ফিরে এলেন মাঈজী। এবার ডেরা বাঁধলেন ঐ টিলার পাশে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে। পাথর কেটে তৈরী হলো একটা বেশ বড় কোঠী। কাজ কাম শেষ হলে মিস্ত্রিরা দেশে চলে গেল। মাঈজী রাতদিন ঐ কোঠীর অন্দরে, দেয়াল জুড়ে তসবির বানাতে লাগলেন। কতক তসবির দেশ থেকে লিয়ে এসেছিলেন সাথে করে, সেগুলো বেদীর তিনদিকে সাজায়ে রাখলেন।

মিস্ত্রিরা চলে গেলে আমি দেশ থেকে বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে এলাম। সেই থেকে আমার পরিবার ঐ ঝুপড়িতে আছে। মাঈজীর খানা পাকায়, ফরমাস খাটে। বহুৎ রুপেয়া মাঈজী আমার কাছে রেখে দিয়েছেন।

একরোজ মাঈজী আমাকে বললেন, রামবিলাস তুমি ক্ষেতি উতি বানাও, আপনার পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে সাধুজী আর আমার দেখভাল কর।

বাবুসাহেব তিন তিন বরষ পার হয়ে গেল, মাঈজী একদিনের জন্যও অজন্তা ছাড়লেন না।

বললাম, সাধুজী ঐ গুহার ভেতর কি করছেন, রামবিলাস ?

সাধুনা। রাতে কোন্ টাইম বাইরে আসেন কেউ টেরই পায় না। একটা পিপ্পল গাছ বহুৎ বড় হয়ে গিয়ে গুহার মুখের প্রায় তিন ভাগ ঢেকে ফেলেছে বাবুজী।

সংগীতা বলল, মাঈজীর সঙ্গেও কি সাধু মহারাজের দেখা হয় না রামবিলাস ?

হপ্তায় আমি একদিন রসদ নিয়ে যাই মাঈজী। সেই প্রথম দিনটি ছাড়া ওঁদের আর কোনোদিন আলাপ করতে দেখিনি। আমার বউও দেখেনি। তবে প্রতিদিন সাধুমহারাজকে মাঈজী নিজের হাতে খাবার দিয়ে আসেন। অবশ্য খাবারগুলো ঐ জানালার বাইরেই রেখে আসতে হয়। তিনি যে কখন তা ভেতরে টেনে নেন, কেউ জানে না।

একটু থেমে আবার বলতে লাগল রামবিলাস, মাঈজী আমার ঝুপড়িতেই

খাওয়াদাওয়া সারেন, কিন্তু দিন রাতের বিশ্রাম করেন নতুন পাথরের দেয়াল দেওয়া ঘরে। তাঁকে কখনো ঝুপড়িতে ডাকতে গিয়ে দেখেছি, তিনি নিজের আঁকা ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন। আজকাল বাইরে বেরিয়ে এসেও অনেকসময় আমাদের চিনতে পারেন না। একটা ঘোরের মধ্যে প্রায়ই আজকাল তাঁকে ঘুরতে দেখি।

বললাম, সাধুর কাছে থাকতে থাকতে মনের ভেতর ধ্যানের ভাবটি জেগে উঠছে, তাই এমন হচ্ছে।

সংগীতা বলল, তাহলে কালই চল, রামবিলাসের ঝুপড়িটা দেখে আসি।

আমার কোনো কথা বলার আগেই রামবিলাস বলল, তাহলে এক কাজ করুন মাঈজী, আজ প্রায় রাতভর চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। একটু বাদ আমি খানা লাগিয়ে দেব। আপনারা খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন। রাত দুটো বাজলে আমি ডাক দেব আপনাদের। চাঁদের আলোয় হেঁটে ভোর রাতের আগেই ঝুপড়িতে পেঁৗছে যাব।

সংগীতা বলল, জ্যোৎস্না রাতে হাঁটব, দারুণ ভাল লাগবে। কিন্তু অজন্তা দেখব কখন, ফিরবই বা কি করে?

রামবিলাস বলল, সে ভাবনা আমার মাঈজী। ভোরে যে গাড়ি যাত্রী নিয়ে অজন্তায় যাবে ওটাতেই দুপুরের খাবার আগে আমরা রেস্টহাউসে ফিরে আসব। তার ভেতর আমার ঝুপড়ি আর সাধুর গুহা দেখা হয়ে যাবে। মাঈজীর হুঁশ থাকলে ওঁর সঙ্গে আলাপও করতে পারবেন। সবশেষে অজন্তা দেখে ফিরব আমরা।

ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে রাত একটা নাগাদ উঠে পড়লাম। ইতিমধ্যে কখন সংগীতা উঠে পড়ে গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে। ভারী কোনো জিনিস সঙ্গে থাকবে না, কেবল দুটি ঝোলাতে কিছু খাবার আর দু'একটা গরম পোশাক। ঠিক দুটোয় রামবিলাস দরজার বাইরে টোকা দিল। আমরা তৈরী, বেরিয়ে পড়লাম ঝোলা কাঁধে নিয়ে।

বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপ শুরু হয়ে গেল। ঝোলা থেকে দুখানা আলোয়ান বের করে দুজনে জড়িয়ে নিলাম গায়ে। কিছু পথ সরকারী রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে রামবিলাসের সঙ্গে আমরা ফাঁকা প্রান্তরে নামলাম। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে ছোট ছোট গুল্ম। মাঝে মাঝে সাদা মাটির আস্তরণ। প্রথম শীতের শিশিরপাত হচ্ছে। ধুলো মরেছে কিন্তু কাদার প্রলেপ পড়েনি। জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। আমাদের পায়ের সাড়া পেয়ে একটা ঝোপ থেকে আর একটা ঝোপে ছুটে পালালো মেটে রঙের দুটো খরগোশ। দূরে গ্রামসীমায় গাছগাছালি অথবা ছায়া ছায়া টিলার সারি জ্যোৎস্নার মিহি জলে স্নান সারছিল। রাতের নির্জন নিস্তব্ধ প্রকৃতির ধ্যান ভেঙে দিচ্ছিল নিশাচর কয়েকটি মানুষের পদধ্বনি। রাতচরা একটা পাখি কি একটা সতর্ক বার্তা ঘোষণা করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। একটা জলশূন্য খাদ পেরিয়ে ওপারে উঠলাম।

বড় বড় বালির টুকরো আর নুড়ি পাথর পায়ে লাগল। খাদ পেরিয়ে যাবার পর ঘন হয়ে উঠল ঝোপঝাড়। আকারেও বড়। দু'একটা বনস্পতির দেখা মিলল। শাখা-প্রশাখা আর রাশি রাশি পল্লবের স্পষ্ট ছায়া পড়েছে তলার মসৃণ মাটিতে। আমাদের পায়ের শব্দে হঠাৎ ঘুম-ভাঙা কয়েকটা পাখি গা ঝাড়া দিল। কিন্তু পরক্ষণেই ডুবে গেল মাঝ রাতের নিদ্রায়।

যত এগিয়ে চললাম, কালো কালো ছায়া আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল এক ঝলক শীতের হাওয়া। হঠাৎ কারা যেন হাততালি দিয়ে উঠল। চমকে পাশে তাকিয়ে দেখি বটগাছের বড় বড় পাতা, হাতের পাতার মতো ডালে ডালে জেগে আছে। তাহলে ওরাই বাতাসের ছোঁয়ায় আহ্লাদে তালি দিয়ে উঠেছিল।

রামবিলাস বলল, বাবুজী, সামনের গাঁখানার ভেতর দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব এবার। তারপর দুটো ফাঁকা মাঠ পার হয়ে গেলেই আমাদের ঝুপড়িতে গিয়ে পড়ব।

গাঁয়ে ঢোকার আগেই চোখে পড়ল মোষে টানা গাড়ির চাকার দাগ। মোষের বড় বড় খুরের খোঁদল দেখা যাচ্ছিল।

গাঁয়ের পথ গাছপালায় নিবিড়। এক ঝাঁক জোনাকি নাচতে নাচতে উড়ে চলে গেল একদিক থেকে অন্য দিকে। এত জোনাকি একসঙ্গে কখনো দেখিনি। একটিও মানুষ জেগে নেই। গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সারাদিন ডুবে থাকে কাজের ভেতর। হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতের খাওয়া চুকিয়ে দিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে অসাড়ে। সারা বাড়ি, তার বাসিন্দা, মায় খড়কুটো বাঁশ বাখারি সমেত যেন তলিয়ে গেছে ঘুমের অতলে। কেবল চাঁদের দুধসাদা আলোয় ছোটবড় দু'-তিনটে ইঁদুরকে মহাব্যস্ত হয়ে উঠোনে সদ্য তোলা ফসলের গাদার চারদিকে ছুটোছুটি করতে দেখা গেল।

গাঁয়ের একটা বড় পুকুরের পাড় ঘেঁষে রাস্তা। ঐ পাড় ধরে মাঠে পড়ামাত্র ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল একটা কুকুর। সে হয়তো কোনো গৃহস্থের ছাইয়ের গাদায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল, কিন্তু শীতের কামড়ে ঘুমটা তেমন জমে ওঠেনি। হঠাৎ জেগে উঠেই গ্রামের চৌকিদারের কর্তব্যটা মনে পড়ে গেছে। তাই চারদিকে একবার চোখে বুলিয়ে নিতে গিয়ে আমাদের মতো কয়েকজন রাতের অতিথির সন্ধান পেয়েই শুরু করে দিয়েছে ডাক হাঁক। আমরা দ্রুত পা চালিয়ে খোলা প্রান্তর ধরে এগিয়ে চললাম।

রামবিলাসের ঝুপড়িতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন পুবের আকাশে জ্বল জ্বল করছে শুকতারা। অজন্তা পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসছিল মসলিনের মতো কুয়াশা। ঊষাদেবী যেন শ্বেত উত্তরীয়খানি উড়িয়ে দ্যুলোক থেকে ভূলোকে নেমে আসছেন।

রামবিলাসের বউ কৌশল্যাবাঈ অপরিসর দাওয়ায় আমাদের বসার জন্য একটা মাদুর পেতে দিলে। রামবিলাস বউয়ের সঙ্গে অতিথি আপ্যায়নের

ব্যাপারে কিছু পরামর্শ করতেই বোধকরি ঘরের ভেতর ঢুকছিল, হঠাৎ সঙ্গীতা বলে উঠল, খাবার দাবার সবই তোমার গেস্ট হাউস থেকে এনেছি রামবিলাস, কেবল একটুখানি চায়ের জল চড়িয়ে দাও।

আমি বললাম, জলখাবারের সময় হলে খাওয়া যাবে, এখন শীত জব্দ করতে শুধু চা।

মিনিট পনের কুড়ির ভেতরেই চা এসে গেল। ছোট বড় দুটো কাঁচের গ্লাসে আমার আর সঙ্গীতার চা। একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে চা নিয়ে বসল রামবিলাস।

ইতিমধ্যেই ঐ ছোট ঘরটুকুর ভেতরে গিয়ে রামবিলাসের বউয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এসেছে সঙ্গীতা।

চা খেতে খেতে আলোচনা শুরু হলো। কথা কিছুটা এগোতেই বোঝা গেল, রামবিলাস আদপেই ফরদাবাদ গেস্ট হাউসের একজন খিদমদগার মাত্র নয়, সে অজন্তা গুহা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গাইডের অভাব ঘটলে ম্যানেজার অনেক সময় রামবিলাসকেই গাইডের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। কেবল ফরেনাররা যখন আসে তখন ইংরাজী জানা গাইড নইলে চলে না।

রামবিলাস বলল, বাবুসাহেব, অজন্তা গুহা আর ছবিগুলো কি আজকালকার? সেই কবে! তখন খ্রীষ্টাব্দের শুরুই হয়নি।

আমি বললাম, চীন থেকে পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ এসেছিলেন। তিনি এই বিখ্যাত গুহাটি ছ'শো চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে দেখে যান।

রামবিলাস বলল, হীনযানী সাধুরা খ্রীষ্ট জন্মের অনেক আগে এখানে গুহা বানাতে শুরু করেছিলেন বাবুজী। আট আর ন'নম্বর গুহা অনেক পুরোনো। সারা ভারতে যত গুহা আছে তাদের ভেতর সবচেয়ে পুরোনো এ দুটি।

বললাম, এখানে মহাযান পন্থীরাও তো গুহা বানিয়েছেন?

হাঁ বাবুসাহেব। মোট উনত্রিশটা গুহার ভিতর ছ'টি মাত্র হীনযানীরা বানিয়েছেন, বাকি তেইশটি মহাযানীদের তৈরী। কয়েক শো বছর ধরে বুদ্ধদেবের ভক্তরা পাথর কেটে কেটে গুহা তৈরী করেছেন, কোনোটা চৈত্য, কোনোটা বিহার।

সঙ্গীতা আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, চৈত্য আর বিহারের তফাৎ কি রামবিলাস?

মাঈজী, উনত্রিশটা গুহার ভেতর মাত্র চারটি চৈত্য, বাকিগুলো বিহার। চৈত্যগুলি পুজার জন্য তৈরী আর বিহারগুলি ভিক্ষুদের বসবাসের জায়গা।

আমি বললাম, আজই তো গুহাগুলো দেখব আমরা, তখন তুমি চৈত্য আর বিহারের তফাতটা সামনাসামনি দেখিয়ে দিও।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই নারীকণ্ঠের একটা আহ্বান ভেসে এল, বাইরে বেরিয়ে আসুন ভিক্ষু উদয়ভদ্র, বাইরে বেরিয়ে আসুন। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

তিন বার এই আকুল আহ্বান বাতাসের বুকে ভাসিয়ে দিল সেই কণ্ঠের অধিকারিণী।

আমি দাওয়ায় পাতা আসন ছেড়ে বেরিয়ে এলাম উঠোনে।

সংগীতাও উঠে এলো। রামবিলাস বলল, এই আওয়াজ মাঈজীর গলার বাবুসাহেব।

সংগীতা বলল, উনি কাকে যেন বেরিয়ে আসতে বলছেন।

রামবিলাস বলল, গুহার ভেতর যে সাধুজী রয়েছেন তাঁকে বাইরে আসতে বলছেন।

উনি কি মাঈজীর ডাকে রোজ বাইরে এসে সূর্যোদয় দেখেন?

আমি ওঁকে ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে আসতে কখনো দেখিনি। তবে গভীর রাতে কোনো কোনো দিন ঘন জঙ্গলের দিকে ডালপালা সরিয়ে কোনো মানুষের চলাফেরার শব্দ পাওয়া যায়। মনে হয় গুহার পেছনে জঙ্গলে চলে যাবার কোনো ফাটল বা গুপ্ত দরজা আছে মাঈজী।

বললাম, এই সামনের জংগলের ওপারে কি আছে রামবিলাস?

অজন্তার পাহাড় ছুঁয়ে যে নদী, তারই একটা স্রোত বয়ে গেছে জঙ্গলের সীমা ঘেঁষে বাবুজী।

সংগীতা বলল, অজন্তায় একটা নদী আছে বুঝি?

হাঁ মাঈজী। ছোট একটা নদী প্রপাত তৈরী করে পাথর কাটতে কাটতে চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঐ নদীর গা ছুঁয়ে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। অনেক ওপরে ঐ পাহাড়ের গায়ে তৈরী হয়েছে গুহাগুলো।

আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ভোরের এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে উড়ে চলে গেল। আমরা ঝুপড়ি থেকে এবার বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম ফাঁকা প্রান্তরে।

আশ্চর্য এক ভোরের ছবি চোখের ওপর ফুটে উঠল। তিরতির করে হাওয়া বয়ে আসছে উত্তর থেকে। মসলিনের মতো পাতলা কুয়াশার তরঙ্গ এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। সূর্যোদয় হয়েছে অরণ্যের আড়ালে। কোমল সোনালী আলো ঝিলিক দিয়ে বেরিয়ে আসছে অরণ্যের পত্রান্তরাল থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম সমস্ত প্রান্তরটা পাতলা দুধের অগভীর একটা সাগর হয়ে গেল। তার ওপর তির্যক সূর্যের আলো পড়ে হালকা সাতটি রঙের খেলা চলতে লাগল।

বর্ণনাতীত সে দৃশ্য। এ কি! সেই পীযূষ-সমুদ্র আলোড়িত করে এগিয়ে আসছেন লক্ষ্মী!

সংগীতা অনুচ্চে বলল, রামবিলাস, ইনিই কি সেই ভদ্রমহিলা যিনি সাধু মহারাজকে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে বলছিলেন?

হাঁ মাঈজী।

অনেক কাছে এগিয়ে এসে সেই মূর্তি, দুটি তথাকথিত নাগরিককে সামনে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

সহসা চিৎকার করে উঠল সঙ্গীতা, অ-পা-লা··· !

সামান্য সময়ের বিস্ময় ! এবার ছুটে আসছে অপালা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছি আমি। এতগুলো বছর পরেও অপালাকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধেই হলো না আমাদের। অপালার চোখের দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিতে পারল না আমাদের দুজনের পরিবর্তন।

সঙ্গীতাকে জড়িয়ে ধরেছে অপালা। ওকি ফুলে ফুলে কাঁদছে ? ওর মুখখানা ডুবে আছে সঙ্গীতার বুকের মধ্যে। আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে ওদের দেখছি। আমার পাশে দাঁড়িয়ে রামবিলাসও হতবাক। সে ভাবতেই পারছে না, এমন একটা অবাক-করা ঘটনা কেমন করে ঘটতে পারে।

পাঁচ পাঁচটা দিন অপালা আমাদের ঐ পরিবেশ থেকে বেরুতে দিল না। এতকালের অদর্শনের পর তার মনের আবেগগুলো উজাড় করে দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। আসল কথা সে তার বৌদিকে এত কাছে পেয়ে সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না।

অপালাকে এই পরিবেশে দেখার আগে আমরা যে অপালাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম তার কথাই স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠছে বার বার। না, শুধু অপালা নয়, সুমনাও জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে।

এই যে 'শ্যামকান্তিময়ী' এসে পড়েছ দেখছি।

তোমার 'চম্পকবরণীও' এলেন বলে। সিঁড়িতে নূপুরের ধ্বনি পাচ্ছ না ? —ঘাড় কাৎ করে নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে উঠল অপালা।

বলতে বলতেই চম্পকবরণী অর্থাৎ সুমনার আবির্ভাব।

সিঁড়ি পেরিয়ে দোতলায় উঠে এলেই বাঁদিকে রান্নাঘর আর ডানদিকে আমার বসার আর শোবার দুটি ঘর। পথের দিকে একফালি টানা বারান্দা। তার একপাশে দুটি আরামের মোড়া, বাকিটাতে টবের গাছে সঙ্গীতার ফুল ফোটানোর খেলা।

আজ আমার জন্মদিন। কখনো বাড়িতে জন্মদিনের রেয়াজ ছিল না। আমরা তখন ইস্কুলে কিছুটা উঁচু ক্লাশে পড়ি। পাশের গাঁয়ে এক বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন পেলাম। জন্মদিনের অনুষ্ঠান। যার জন্মদিন সে দাদার সঙ্গে একই ক্লাশে পড়ে।

ভুরিভোজ সেরে বাড়ি ফিরেই দাদা মাকে বলল, আমার জন্মদিন কবে মা ?

আশ্বিন মাসে সোমবারে। কিন্তু কেন ?

দাদা বলল, কি ঘটা করে মা অনুপের জন্মদিন হলো। নতুন কাপড় জামা পরে, চন্দনের ফোঁটা নিয়ে ও একটা ফুলতোলা কার্পেটের আসনে খেতে বসল। রুপোর থালা বাটি গেলাসে ওকে কত কি খাবার দেওয়া হলো। আমাদের জন্মদিন হয় না কেন মা ?

মা বলল, অনুপ তোমার চেয়ে ক'বছরের বড় বলে মনে হয় ?

দাদা ভেবে বলল, অন্তত দু'বছরের। কারণ ও দুবার ফেল করে এখন

আমার সঙ্গে পড়ছে।

মা বলল, ওসব ছেলেকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে পাড়াপড়শীরা হাসবে। আগে মানুষ হও। দেশের মুখ যদি উজ্জ্বল করতে পার তাহলে দেশের লোকই তোমার জন্মদিন করবে।

মায়ের সে কথাটা আজও কানে এসে বাজছে। আমি দেশের দশের একজন হতে পারিনি, তবু বছর তিনেক আমার জন্মদিন হচ্ছে। বিয়ের পর থেকেই সংগীতা এর উদ্‌যোক্তা।

আমি সংগীতাকে বাধা দিয়ে মায়ের উক্তিটি শুনিয়ে দিয়েছিলাম। ও বলেছিল, মা ঠিকই বলেছেন, তবে আমারও কিছু বলার আছে।

আমি বলেছিলাম, বল কি যুক্তি আছে তোমার ?

না, তেমন কোনো যুক্তি আমি খাড়া করতে পারব না। তবে একান্ত প্রিয়জনকে নানাভাবে সাজিয়ে আনন্দ পাওয়া, এইটুকুমাত্র ইচ্ছা। একদিন যদি আমার প্রিয় মানুষটি সবার প্রিয় হয়ে যায়, তাহলে আমার দাবিটুকু আমি সানন্দে ছেড়ে দেব।

বলেছিলাম, বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তবে একান্ত গোপনে। কাক-পক্ষীটিও যেন টের না পায়।

কিন্তু কি ছিল বিধাতার মনে। দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠানে আমার দুই ছাত্রী, অপালা আর সুমনার সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আবির্ভাব। সংগীতা এই আয়োজনের ভেতর থেকে সেদিন তাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি।

তারা এই তৃতীয় বছরে নিজেরাই নির্দিষ্ট দিনে স্যারের নিভৃত নিকেতনে এসে হাজির।

অপালা আর সুমনা কিছুদিন আগেও আমার কলেজের ছাত্রী ছিল। ওদের দুজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। একই সঙ্গে বহুদিন এসেছে আমার বাসায়, এখন কলেজের বাইরে সে অভ্যেস ছাড়তে পারেনি।

ওরা আমার ঘরের ভেতরে ঢুকে 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর' এককপি আর একগুচ্ছ গোলাপ দিয়ে প্রণাম করল।

আমি বললাম, অমূল্য উপহার, কিন্তু এত দামী বই তোমরা কিনতে গেলে কেন ? তোমরা তো চাকরি কর না, তাই খুব খারাপ লাগছে।

সুমনা বলল, স্যার, আমাদেরও তো কিছু দিতে ইচ্ছে করে।

অপালা বলল, এই কয়েক মাসে সুমনা স্টেজে নাচ দেখিয়ে বেশ কিছু টাকা পেয়েছে, আর আমিও বাচ্চাদের ছবি আঁকা শিখিয়ে কিছু পাই।

বললাম, আজ আর ও নিয়ে কথা বাড়াব না, তবে বুঝেসুঝে খরচ কর। আজ কিন্তু তোমরা এখানেই খেয়ে যাবে।

রান্নাঘরের ভেতর থেকে সংগীতা বলল, ওদের আমি আগেই বলে দিয়েছি।

ওরা রান্নাঘরে ওদের বৌদির কাছে চলে গেল। আমি উপহারের ফুলগুলো সাজিয়ে রাখলাম ফুলদানিতে। নানা রঙের গোলাপ। এ যেন এক বছরের

ভেতর আমার জীবনে যে কটি 'নানা রঙের দিন' এসেছে তারই তোড়া বেঁধে দিয়ে গেল ওরা।

সুমনা, সুন্দরীদের পর্যায়ে পড়ে। সে স্বভাবে স্থির আর গভীর। কথা বলে অল্প, তাও বেশ আস্তে। অন্যদিকে অপালা ভারী চঞ্চল। মুহূর্তে মুহূর্তে খুশীর তুফান তুলতে পারে। অনর্গল কথা বলে যায়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সে উড়ে বেড়াতে ভালবাসে। শ্যামলা রঙ, ভারী সুশ্রী সে, তাই সঙ্গীতা তার নাম রেখেছে 'শ্যামকান্তিময়ী'। সুমনা সত্যিই 'চম্পকবরণী'। একেবারে কনকচাঁপা ফুলের রঙ।

ওরা তিনজনে যখন আমার শোবার ঘরে বসে গল্প করে তখন কোনো কোনোদিন আমার কানে ভেসে আসে অপালার গলা। ও নিচু পর্দায় গলা সাধতে ভালবাসে না। উচ্চগ্রামী গলা ওর।

অপালা বলে, তোর গায়ে একটু গা ঘষে নিই সুমনা, এ জন্মে না হলেও পরজন্মে নিশ্চিত তোর গায়ের রঙ পাব। তখন বৌদি আমাকে 'শ্যাম-কান্তিময়ী' না বলে 'কাঞ্চনবরণী' বলে ডাকবে।

সঙ্গীতার গলা পাওয়া যায়, পরজন্মে আমি তোমার বৌদি হয়ে জন্মাব, একথা কে বললে? অন্য কেউ এই পদের দাবিদারও তো হতে পারে।

অপালা বলে, এত শস্তা নয় মশাই, ফট্ করে একজন তোমার জায়গায় জাঁকিয়ে বসলেই হলো। ভালবাসার গিঁট্‌টা যদি কষে বসে যায় তাহলে জন্মান্তরেও তাকে খোলে কার সাধ্যি।

সুমনা বলে ওঠে, জন্মান্তর যে আছে তোকে কে বললে? প্রমাণ দিতে পারবি?

বিশ্বাস। আমি যদি শাস্ত্র মানি তাহলে ওটাকেও বিশ্বাস করতে হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ সকলেই জন্মান্তরে বিশ্বাসী। স্বয়ং বুদ্ধদেবই তো তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের কত কাহিনী শুনিয়েছেন।

সুমনা এবার বলে, আমার তো মনে হয় এসব মহাপুরুষদের শিক্ষাদানের একটা পদ্ধতি। আমরা আমাদের গত জন্মের কথা কিছুই জানি না, ভবিষ্যৎ জন্মও অন্ধকারে। সুতরাং আমাদের কাছে জন্মান্তর আছে কি নেই সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

অপালা ক্ষুব্ধ, সে বলে ওঠে, মহাপুরুষরা সব বাজে কথা বলেন, তাই না রে?

আমি তো তা বলিনি। ওটা ওঁদের শিক্ষা দেবার একটা নতুন ধারা। এ জন্মে যদি খারাপ কাজ কর তাহলে পরজন্মে কীট পতঙ্গ হয়ে জন্মাবে, ভাল কাজ কিছু করলে আরও ভাল মানুষ হয়ে জন্মাবে পরজন্মে। সাধারণ মানুষের কাছে এটি একধরনের মহৌষধ। বুদ্ধদেবও তাঁর জন্মান্তরের কথা ভক্তশিষ্যদের শুনিয়েছেন, কেবল ভালমন্দটুকু গল্পের ছলে চিনিয়ে দেবার জন্য।

অপালা যেন হতাশায় ভেঙে পড়ল, তার মানে তুই বলতে চাস জন্মান্তর

নেই ! তাহলে আমি মরে গেলে এমন সুন্দর পৃথিবীটাতে আমি আর কোনো-দিনও ফিরে আসব না। নিউমার্কেটে ঘুরে ঘুরে কেনা কাটা, মরসুমী ফুল কিনে ঘর সাজানো, পুরীর সমুদ্রে সূর্যোদয়, দার্জিলিঙের মায়া জড়ানো কুয়াশা, এ সবকিছুই হারিয়ে যাবে। আমি ভাবতে পারছি না, তুই নেই, বৌদি নেই, কেউ নেই।

সুমনা বলল, তুই কিরে ! এমন করে ভেঙে পড়ছিস যেন তোর সবকিছু খোয়া গেছে। যা পাচ্ছিস হাতের কাছে তাকে প্রাণ ভরে ভোগ করে যা। অতীত আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে কোনো লাভ নেই। তাতে বর্তমানের সুখটাকেও হারাবি।

সঙ্গীতা বলল, জন্মান্তরে আবার ফিরে আসব, এ ভাবনাটা অন্তত থাক্ না, তাতে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মাঝখানে অন্তত একটুখানি আলোর রশ্মি দেখা যাবে।

এবার হালকা ভাবনায় ভেসে গেল অপালা, আমি তো ভাবতেই পারছি না মরার সঙ্গে সঙ্গে চিরজীবনের মতো আমার ফুচ্‌কা খাওয়া শেষ।

ওরা এবার নির্মল হাসিতে ঘরটাকে ভরিয়ে তুলল।

আমি এ ঘর থেকে বললাম, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশের সম্রাট ফারাওরা পাছে ওপারে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েন তাই তাঁদের কবরের ভেতর রেখে দেওয়া হতো সোনার পানপাত্র থেকে সোনার সিংহাসনটি পর্যন্ত।

সুমনা চাপা গলায় বলল, আমার আগে যদি তুই চলে যাস তাহলে তোর সঙ্গে আমি এক ঝুড়ি ফুচ্‌কা দিয়ে দেব।

অপালা বলল, উঁহু, যে সে ফুচ্‌কা হলে আমি ছোঁবই না। আমার ঐ কলেজের গলির ধারে চিরকুট কাপড় পরা ফুচ্‌কাওলার ফুচ্‌কা চাই। হাঁড়ির ভেতর 'কবে কোন বিদিশার নিশা'র মতো কালো তেঁতুল গোলা জল, ভাঙা ভাঙা মশলাদার আলুর 'আহা মরে যাই' মার্কা পুর, এ নইলে ফুচ্‌কা। আমি হলপ করে বলতে পারি টরেন্টো, টোকিও, ম্যানিলা, মাদাগাস্কার, যে কোনো জায়গায় পসরা সাজালেই ও বাজিমাৎ করবে।

সঙ্গীতা বলল, দরকার নেই বাপু বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরেই বেঁচে বর্তে থাক।

ওরা যখনই আসত তখনই মানিকজোড়ে ওদের আগমন। বড় একটা জোড় ভাঙতে ওদের দেখা যেত না। মাঝে মাঝে সঙ্গীতার কাছে এসে হাজির হতো নানাধরনের সমস্যা নিয়ে। ওরা অনুচ্চে ওদের বন্ধুর মতো গুরুপত্নীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ করত। দুটি বান্ধবী চলে গেলে সঙ্গীতা আসত আমার কাছে। ওদের সমস্যার খবরগুলো আমি ওর মুখ থেকেই জানতে পারতাম।

দুজনের সমস্যা ছিল দু'ধরনের।

মা বাবা আর নিজেকে নিয়েই অপালার সংসার। রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসারের মেয়ে সে। নিজেদের বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও ভদ্রস্থ। ঠাকুমার বড়

স্নেহের পাত্রী ছিল অপালা। তাই মৃত্যুর আগেই আদরের নাতনির হাতে তুলে দিয়ে যান তাঁর গয়নার বাক্সটি। কম করে সত্তর, আশি ভরি সোনার অলংকার। একমাত্র কাকা আমেরিকা প্রবাসী ডাক্তার। কলকাতায় মাঝেমধ্যে আসেন কোন কনফারেন্স উপলক্ষে। এলেই ভাইঝির জন্য নিয়ে আসেন অনেক মূল্যবান বিনোদন সামগ্রী।

একদিন আমি চৌরঙ্গীর ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছি, অপালার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখামাত্র ভারী খুশী হয়ে উঠল ও। হঠাৎ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা অপালার স্বভাবধর্ম।

স্যার, আপনি এখানে! আপনি তো দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন।

হেসে বললাম, দক্ষিণ কলকাতার মানুষের বুঝি চৌরঙ্গীতে আসতে মানা?

ও প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পরক্ষণেই হেসে ফেলল।

বোকার মতো বলে ফেলেছি স্যার।

কোনোরকম আগডুম বাগডুম যুক্তি না দেখিয়ে ও একেবারে সারেণ্ডার করে বসল।

এবার আমি বললাম, তুমি এখানে?

আমার বাড়ি তো এখানেই।

খুব কাছে বুঝি?

চলুন না স্যার।

এই দুপুর-রোদ্দুরে তুমিই বা এখানে কি করছ?

এ পিরিয়ডে স্যার আসেননি, তাই বাড়ি যাচ্ছি খেতে।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। মেয়েটার মাথার ঠিক আছে তো।

বললাম, তুমি তো আমাদের মর্নিং কলেজে পড়, তাহলে এই দুপুরে স্যার আসবেন কোত্থেকে?

ও যেন আমার এতখানি অজ্ঞতায় হেসে উঠল। তারপর নিজেকে বেশ কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, আমি তো মর্নিং কলেজে বি, এ পড়ি স্যার। দুপুরে আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখি।

আমি বিস্মিত। বললাম, তাই বুঝি!

হ্যাঁ স্যার। কাউকে বলবেন না যেন, নিয়ম নেই। এবার যখন আমেরিকা থেকে কলকাতা এসেছিলেন কাকা তখন আমার আঁকা ছবি দেখে বললেন, তোকে আর বি, এ পড়তে হবে না, ছবি আঁকা শেখ। কাকাই তো আমাকে আর্ট কলেজে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন।

একটুখানি থেমে আবার বলে উঠল, আমি কিন্তু মর্নিং কলেজ ছাড়িনি স্যার। সেই ইলেভেন ক্লাশ থেকে আপনাদের কাছে পড়ে আসছি। কত বকুনি খেয়েছি, কত স্নেহ পেয়েছি, কত গল্প শুনেছি, বললেই হুট্ করে ছেড়ে দেওয়া যায়! আপনিই বলুন না স্যার?

অপালা শেষের কথাগুলো বলছিল অকৃত্রিম আবেগের সঙ্গে।

আমি বললাম, কোনো দিকে ঝামেলা না হলে দুটোই চালিয়ে যাও।

এবার ও জেদ ধরল, চলুন না স্যার আমাদের বাড়ি।

আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমি ফেরার গাড়ি ধরতে যাচ্ছিলাম। এই মুহূর্তে হাতে কোনো জরুরী কাজ নেই। বললাম, খুব কাছে বাড়ি?

খুব বেশী হলে স্যার তিন চার মিনিট হাঁটলেই পেঁৗছে যাবেন।

অপালার বাবা মা বাড়িতে ছিলেন, আলাপ হলো। শুনেছিল্যম, ওর মা চিররুগ্না, তাই সংসারের পুরো দায়িত্ব অপালার ওপরেই। অমায়িক ভদ্র পরিবার। তখন প্রায় একটা বাজে, ওঁরা মধ্যাহ্ন ভোজে বসেননি। মেয়ে কলেজ থেকে প্রতিদিন এমনি সময়ে চলে আসার চেষ্টা করে। বাবা মা খাবার টেবিলে মেয়ের জন্য দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। প্রতীক্ষা তার বেশী হয়ে গেলেই মেয়ের কাছে বকুনি খেতে হয়।

ওঁদের খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে কথার মাঝে অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। একসময় বললাম, অসময়ে ও আমাকে টেনে আনল, আপনাদের খাওয়াই হয়নি এখনো। অন্য একদিন আমি আসব, আজ উঠি।

হৈ হৈ করে উঠলেন স্বামীস্ত্রীতে, তাও কি হয়! আপনি আমাদের সঙ্গে দুটি খেয়ে নিলে ভারী আনন্দ পাব।

বললাম, অনুগ্রহ করে আজ আমায় বাড়ি ফিরতে দিন, আমি না ফিরলে আর একজনের খাওয়া হবে না। কথা দিচ্ছি অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব।

সে উপলক্ষ এসেছিল। প্রায় দু'বছর পরে। কিন্তু তার আগে সুমনার হাত ধরে অপালা আমার বাড়িতে এসে ভাব জমিয়ে তুলেছিল সংগীতার সংগে। সংগীতা মন্তব্য করেছিল, একজন সমুদ্রের ঢেউ, আবেগে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যজন সমুদ্রের তল। সেখানে আবেগ নেই, নিঃশব্দে চলছে কোন-কিছু গড়ে তোলার খেলা। ভারী ভাল লেগেছে আমার দু'জনকে।

একদিন কতকগুলো ছবি নিয়ে এল অপালা। তারই আঁকা। কিন্তু ছবিগুলো দেখাবার আগে আমাদের সে সরিয়ে দিল বসার ঘর থেকে।

অপালা আর সুমনা, দু'বান্ধবী মিলে প্রায় পনের খানা ছবি সাজিয়ে রাখল ঘরের এখানে ওখানে। ছবিগুলোর মাঝে মাঝে প্ল্যাস্টিকের নানা রঙের ফুল এমনভাবে গুঁজে সাজিয়ে রাখল যাতে আমার বসার ঘরখানাকে একটা প্রদর্শনীর রুম বলে মনে হয়।

এবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল সুমনা। দু'জনেই পরেছে হাল্‌কা মাখন রঙের টাঙাইল, জরির বুটি তোলা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। খোঁপায় গোঁজা দুটি চাঁপা ফুল।

আমরা দুজনমাত্র দর্শক, তবু সুমনার স্নিগ্ধ, আন্তরিক অভ্যর্থনার ভেতর দিয়ে প্রদর্শনী হলে ঢুকলাম। শিল্পী স্বয়ং তার শিল্পকর্ম সম্বন্ধে বোঝাতে লাগল।

জল রঙে আঁকা সব কটি ছবি। পিংক, হালকা ব্লু, গ্রীন, বাফ, এইসব কালার দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছে। ছবিগুলো ভাস্কর্য-মূর্তি। এক একটি যেন এক এক রঙের পাথরে খোদাই।

আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। ছবিতে পাথরের এফেক্টই শুধু আসেনি, মসৃণ পাথরের চিকন লাবণ্যটুকুও ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পী।

সঙ্গীতা বলে উঠল, আরে এ যে 'লিজেন্ডস অব গ্রীস অ্যান্ড রোম'-এর কাহিনী নিয়ে আঁকা ছবি!

তাইতো! ঐ যে বীণা বুকে ঠেকিয়ে অরফিউস ঘাড় কাৎ করে প্রিয়তমা পত্নী ইউরিডাইসের দিকে তাকিয়ে আছে। আর ইউরিডাইস, দুহাত প্রসারিত করে যেন সকরুণ স্বরে বলছে, 'বিদায় প্রিয়তম, বিদায়!' চমৎকার!

অন্য একখানি ছবিতে কামনাজর্জর অর্ধপশু প্যানকে শাসন করছে সুন্দরী অ্যাফ্রোডাইট। ঘৃণা মেশানো বিদ্রূপের হাসিটি আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছে শিল্পী।

হতভাগ্য অ্যাক্টিয়োনের ছবিটি ভারী চমৎকার ভঙ্গীতে আঁকা। সুন্দর যুবা পুরুষের মুখখানা রূপান্তরিত হয়ে গেছে শিঙওলা হরিণের মুখে। শিকারের দেবী ডায়ানার হিংস্র কুকুরগুলো অ্যাক্টিয়োনকে চিনতে না পেরে হরিণ ভেবে আক্রমণ করছে তাকে।

সব থেকে আকর্ষণীয় ছবি, নার্সিসাস। জলের ধারে বসে মুগ্ধ, মগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। মানুষ কি সত্যিই নিজেকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে না?

ছবি দেখা শেষ হলে সঙ্গীতা কতক্ষণ চেয়ে রইল অপালার মুখের দিকে, কোনো কথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল না। মুগ্ধতা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। অপালার মুখে ফুটেছিল একটুকরো হাসি।

একদিন সুমনা একাই এল। হাতে কয়েকখানা গেস্ট কার্ড। বিড়লা অডিটোরিয়ামে ওড়িশী নাচবে সে। তারই নিমন্ত্রণ।

সে সময় কেউ বড় একটা ওড়িশী নাচত না। সুমনা প্রথমে ভরতনাট্যম শিখেছিল। এক সময় সে দাদা বৌদির সঙ্গে ওড়িষা ভ্রমণে যায়। ওর সন্ধানী চোখ সেখানকার এক পুজামণ্ডপের সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে ওড়িশী নাচের ছন্দটিকে আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়। সে বুঝেছিল, এ নাচ ক্লাসিক্যাল নাচের ব্যাকরণ মেনে চলে, কিন্তু স্বচ্ছন্দ চলনে কবিতার আলাদা এক সুষমা আর মধুরিমা আছে। ওড়িষার দেব-দেউলগুলি ঘুরে দেখার সময় সে ঐ নাচেরই ভঙ্গীগুলি লক্ষ্য করে। এতে তার আকর্ষণ বাড়ে, অনুরাগ গভীর হয়। সে পাগলের মতো গুরুর সন্ধান করে বেড়ায়। অবশেষে সর্বকলার সঙ্গমক্ষেত্র কলকাতাতেই মিলে যায় তার গুরু। কলেজের পড়াশোনা চালিয়েও নিরলস চেষ্টায় সে ওড়িশী নাচের ছন্দপ্রকরণ, পুষ্পিত বৈভবটি আয়ত্ত করে ফেলে।

বাবা মা ছিল না সুমনার। একমাত্র দাদার আশ্রয়ে থেকে সে চালিয়ে যাচ্ছিল তার পড়াশোনা। কলেজ থেকে তড়িঘড়ি ফিরে তাকেই ওবেলার রান্নাটা সেরে ফেলতে হতো। বৌদিও অফিসযাত্রী। সকালের সামান্য রান্নার ভার থাকত তার ওপর। কোনোরকম নাকেমুখে গুঁজে, মেয়েকে তার ইস্কুলে

পৌঁছে দিয়ে অফিসে ছুটত বৌদি। সুমনা কলেজ থেকে ফিরেই চটপট সেরে নিত তার কাজ। দুটোয় ছুটি হতো ভাইঝির। তাকে স্কুল থেকে এনে দুজনে খেতে বসত। পিসিকে ছোট্ট দুটো হাতে জড়িয়ে ধরত ভাইঝি, আদর যেন তার শেষই হতো না।

সন্ধ্যার মুখে দাদা বৌদি ফিরত প্রায় একই সঙ্গে। সুমনা আগেভাগেই রেডি করে রাখত জলখাবার। ওদের হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলেই সে টেবিলে জলখাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলত।

এত নিপুণ হাতে কাজ করেও সুমনা কিন্তু মন পেত না তার বৌদির। ওকে শুনিয়েই হয়ত বলত, এত তাড়াতাড়ি চতুর্ভুজা হয় কি সাধে, ঘর থেকে বাইরে পালানোর তোড়জোড়। নাচ শেখা একটা ছুতো।

কথাগুলো পাশের ঘর থেকে নিষ্ঠুরের মতো ছুঁড়ে দিত তার বৌদি, আর সেগুলো তীক্ষ্ম তীরের মতো ছুটে এসে বিঁধে যেত তার বুকের গভীরে। ঝরে পড়া চোখের জল আড়ালে লুকোতো সুমনা। অন্য কোনো মেয়ে হলে ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে হয়ত নাচই ছেড়ে দিত কিন্তু প্রাণের গভীরে যে ছন্দ একবার নাড়া দিয়েছে তার সম্মোহনী আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব ছিল সুমনার পক্ষে। সে সব অপমান বুকে গেঁথে নিয়েও বাণবিদ্ধ হরিণীর মতো ছন্দিত লয়ে শূন্যে ভাসিয়ে দিত তার দেহখানা।

সুমনার সান্ত্বনার আশ্রয় ছিল দুটি। একটি তার অনুত্তেজিত আচরণ, অন্যটি সংগীতার হৃদয়ের উত্তাপ।

যখনই আহত হতো সুমনা তখনই সে চলে আসত আমার বাসায়। কোনো কথা প্রকাশ করে বলার আগেই সংগীতা তার মুখের ছবি দেখে বুকের পাঠটি পড়ে নিতে পারত। অমনি সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলত, কি হয়েছে ভাই ননদিনী, আমার কাছে খুলে বল। অমন সুন্দর মুখখানায় আজ মেঘছায়া দেখছি কেন?

আর কারু কাছে মুখ খুলে মনের কথা না বললেও সংগীতার কাছে প্রায়ই সে তার গোপন হৃদয়ের সুখদুঃখের কথাগুলো বলে যেত। কিছু অশ্রু, কিছু উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মিশে থাকত তার সঙ্গে।

ভোরের রোদের ঝিলিক কখনো সখনো দেখা যেত সুমনার চোখের তারায়। সে সময়গুলো কথা আর গানে বড় উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

সংগীতা সুমনার মাথাটি আলতো করে নেড়ে দিয়ে গেয়ে উঠত, 'তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে'।

গানের উত্তরে সুমনা বলত, বিশ্বাস কর বউদি, 'শুধু অকারণ পুলক'।

সংগীতা হঠাৎ ধমকে উঠত, হাঁ মেয়ে, তাই বুঝি? আজকাল নিজেকে লুকিয়ে বেড়াতে শিখেছ?

তোমার কাছে লুকোলে আমি আমার সুখদুঃখের ঝাঁপিটা আর কার কাছে মেলে ধরব বৌদি।

সুমনা যদি হয় ইন্দ্রধনুর ছবি আঁকা মেঘ, তাহলে অপাঙ্গা কালবোশেখীর

দুরন্ত ঝড়। সে তার পথের বাধাকে নির্মমভাবে সরিয়ে দেয় মনের অসীম শক্তিতে। শান্ত শ্রী নেই অপালার কিন্তু শক্তির সজীব সৌন্দর্য আছে।

কার্ড দুখানা আমার পড়ার টেবিলে রেখে সুমনা বলল, স্যার, একটু সময় করে কিন্তু আসতে হবে আমার অনুষ্ঠানে।

একখানা কার্ডে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, চমৎকার। ওপরে বাঁদিকে জগন্নাথের মূর্তি, নিচে ডানদিকে ওড়িশী নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রণাম নিবেদন। মাঝে ওসান ব্লু কালিতে আমন্ত্রণ-লিপি। একেবারে পুরীর সমুদ্রের রঙ। কার পরিকল্পনা ?

নত চোখে, মুখে মৃদু হাসি। বলল, অপালাই ওসব করেছে।

আমি কার্ডখানার দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাক'লাম।

আরে, অপালারই তো নাম রয়েছে নিচে। আহ্বায়কের জায়গায় অপালা চৌধুরীর নাম।

পড়তে পড়তে বললাম, বিনায়ক গোস্বামী কে, যিনি তোমার সঙ্গে নাচবেন ?

লক্ষ্য করলাম, সুমনার নত মুখে লালের আভা ফুটে উঠল। পরক্ষণেই ও নিজেকে সংযত করে বলল, উনি লক্ষ্ণৌতে এক গুরুর কাছে তালিম নিয়ে এসেছেন কথকে। নিজে ভাল নাচেন, আবার সুযোগ মতো ইম্প্রেসারিওর কাজ করেন।

বললাম, চিঠিতে দেখছি, 'দেবদাসী কলাকেন্দ্র' নিবেদিত। এই প্রতিষ্ঠানটি কি বিনায়ক গোস্বামী মশায়ের ?

সুমনা মাথা নেড়ে বলল, না স্যার। অপালার মাথা থেকে ওটা বেরিয়েছে।

বললাম, তা ভালই বের করেছে অপালা। নামটি তো বেশ ভাবনা-চিন্তা করেই রেখেছে, এখন প্রতিষ্ঠানটি চালানোর দায়িত্ব কি ও নেবে ?

এতখানি ভেবে করা হয়নি স্যার। অনুষ্ঠান করতে গেলে একটা প্রতিষ্ঠানের নাম দিতে হয়, তাই একটা নাম বসানো হয়েছে। তবে বিনায়ক বলছিলেন, যদি আমাদের এই প্রথম অনুষ্ঠানটি জমে যায়, আর রিপোর্টাররা কাগজে কিছুটা সাফল্যের কথা লেখেন তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবা যাবে।

সংগীতা কলেজে গিয়েছিল। আমি বললাম, সুমনা, তুমি কি এখন চলে যাবে ?

অনেকগুলো কার্ড বিলি করতে হবে স্যার, তাই খুব তাড়া আছে। বৌদি না গেলে আমরা ভীষণ ভেঙে পড়ব।

তোমার সহচরীটি কোথায় ?

ও খবর কাগজের অফিসগুলোতে গেছে কার্ড বিলি করতে।

বেশ। তুমি কিন্তু যাবার আগে ফ্রিজ খুলে কিছু খেয়ে যেও। কোথায় কি থাকে আমার চেয়ে তোমরাই ভাল জান। শুধু মুখে চলে গেলে আমাকে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সুমনার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটল। ও মাথা নিচু করে আমার ঘর

থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, ফ্রিজ খুলে নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে যাব।

বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল অপালা।

স্যার, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

কি হলো আবার? শুভ কাজ করতে গেলেও সামান্য কিছু বিঘ্ন ঘটতে পারে।

সঙ্গীতা ঘরে ঢুকে বলল, প্রথম অনুষ্ঠান, অন্তত দু'চার মিনিটের একটা ভাষণ চাই। সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, তাই কার্ডে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ নেই। এখন মঞ্চে উঠে দু'চার কথা তোমাকে বলতে হবে, এই আর্জি নিয়ে এসেছে কর্মকর্ত্রী।

বললাম, তা না হয় হলো, কিন্তু অপালা, আশা করি স্টেজটি তুমি মনের মতো করে সাজাবে।

অপালা বলল, মঞ্চে জগন্নাথের মূর্তি রাখা হবে। গলায় থাকবে সাদা ফুলের গোড়ে মালা।

জানতে চাইলাম, পেছনে কোনো পট থাকবে না?

ও বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম কোনারক আর ভুবনেশ্বরের কিছু নির্বাচিত নর্তকীর নমুনা পেছনের পটে এঁকে দেব, কিন্তু পরে ভাবনা বদলে গেছে স্যার।

কি রকম?

নাচের ভেতর দিয়েই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে রূপ দেওয়া হচ্ছে, তাই পেছনে সরু সরু বাঁশের কাঠি আর ফুলপাতা দিয়ে একটা কুঞ্জ সাজানোর ব্যবস্থা করেছি। তার ভেতরে থাকবে কৃষ্ণের একটি ছবি। রাধার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। বাইরের দুদিকের প্যানেলে সখিদের নিয়ে রাধা। একদিকের পটে রাধার প্রসাধনের ছবি, অন্যদিকে মেঘ আর বিদ্যুতের ভেতর দিয়ে রাধার অভিসার।

বললাম, এর চেয়ে ভাল পরিকল্পনা আর কিই বা হতে পারে।

আমি কিন্তু পটের ছবিগুলো সংগ্রহ করেছি ওড়িশা মিউজিয়ামে রাখা তালপাতার পুঁথির ছবি থেকে।

সত্যিকারের প্রশংসা পাওয়ার মতো কাজ অপালার। বললাম, তোমার কাজ যেমন নিখুঁত তেমনি নিপুণ।

ও বেশ উজ্জ্বল চোখে আমার প্রশংসা উপভোগ করল। অকারণ লজ্জা অপালাকে আচ্ছন্ন করে না। ও নিজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন। প্রাপ্য মর্যাদাটুকু উপযুক্ত মানুষের কাছ থেকে পেলে ও খুশীতে ঝলমল করে ওঠে।

অপালা বলল, স্যার, বাবার সঙ্গে একবার ভুবনেশ্বর বেড়াতে গিয়ে ওখানকার মিউজিয়ামে ঢুকেছিলাম। ওখানে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পুঁথিটির চিত্রিত রূপ দেখতে পাই। কথাপ্রসঙ্গে বাবাকে ওখানকার কিউরেটর বললেন, জয়দেব নাকি ওড়িশারই মানুষ। কি করে হয় স্যার?

বললাম, এ নিয়ে বাঙালী আর ওড়িয়া পণ্ডিত সমাজের ভেতর বিতর্কের শেষ নেই।

আপনি কি মনে করেন স্যার?

জয়দেবের ব্যাপারে যুক্তির চেয়ে বাঙালীর ভাবাবেগ বেশী কাজ করে। ওরা কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠভাবে এ সমস্যাটির সমাধানের পথে এগিয়েছে।

বিষয়টাকে আর বিতর্কের ভেতর না টেনে এনে বললাম, দেখ, যাঁকে নিয়ে আজ আমরা বিবাদ করছি তাঁর সৃষ্টি কিন্তু বাংলা, ওড়িশার সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। পণ্ডিতেরা স্থান কাল পাত্র নিয়ে বিবাদ করেন কিন্তু যথার্থ সৃষ্টিকে কোনো সীমার ভেতর বাঁধা যায় না। সে দেশ আর কালসীমাকে অতিক্রম করে যায়। এখন ভারতীয় ভাষাগুলি ছাড়াও ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, জার্মানীতে অনূদিত হয়ে 'গীতগোবিন্দ' কোটি কোটি মানুষের অন্তরকে রসে প্লাবিত করছে।

কথাগুলো বক্তৃতার মত শোনাচ্ছিল, তাই থামলাম। হেসে বললাম, লেকচারের গন্ধ এসে যাচ্ছে, অতএব এইখানে থামা যাক।

আচ্ছা স্যার গীতগোবিন্দ তো গোবিন্দকে নিয়ে গীত। সুর তাল সবই আছে, কিন্তু এর সঙ্গে নাচের যোগ হলো কবে থেকে? কারাই বা নাচতেন?

বললাম, তোমার কৌতূহল তো বেশ! আচ্ছা শোন, অবশ্য আমি যতটুকু জানি তাই বলছি। নীলাচলে দেববিগ্রহের সামনে বহু শতাব্দী ধরে গীতগোবিন্দের গানের সঙ্গে নাচ হতো। একমাত্র দেবদাসীরাই দীর্ঘকাল ধরে এই নাচে অংশ নিত। এখন নতুন যুগের প্রতিভাবান নর্তক-নর্তকীরা ঐ গান আর নাচকে তাঁদের প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আজ আর বিগ্রহের সামনে বড় একটা নাচ হয় না।

সঙ্গীতা এবার প্রশ্ন তুলল, নাচের আসরে জগন্নাথের বিগ্রহ রাখা হয় কেন?

জগন্নাথের বিগ্রহের সামনেই তো গীতগোবিন্দকে অবলম্বন করে নাচগান হতো। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব একটি আদেশ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করলেন। সেটি মন্দিরের গায়ে স্থাপন করা হলো। তাতে কি লেখা ছিল জান?

ওরা দুজনেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, ওড়িয়াতে অনেকখানি লেখা। সামান্য দু'চার ছত্র যা মনে আসছে তাই বলছি 'বড় ঠাকুরঙ্ক সম্পরদা কপিলেশ্বর ঠাকুরঙ্ক বন্ধা নাচনীমান পুরুণা সম্পরদা তেলঙ্গী সম্পরদা এখানে সবি হে' বড় ঠাকুরঙ্ক গীতগোবিন্দহুঁ আন গীত ন সিখিবে। আন গীত নাট করাইলে জানী সে জগন্নাথঙ্ক দ্রোহ করই।

সঙ্গীতা বলল, দু'চারটে শব্দ ছাড়া কিছুই বুঝলাম না।

এর নির্গলিত অর্থ হলো, জগন্নাথ দেবের সামনে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবদাসীরা নৃত্যযোগে কেবল গীতগোবিন্দই গান করবে। অন্য নাচগান শেখা

বা তার অনুষ্ঠান করা জগন্নাথের বিরুদ্ধাচারণ বলে গণ্য হবে।

অপালা উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, সুমনাকে জিজ্ঞেস করলেও এতটা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। নাচের আসরে জগন্নাথদেবকে রাখার রীতি আছে, এটা প্রথা বলেই ওরা মানে, তার বেশী হয়ত কিছু জানে না।

আমি বললাম, সুমনা পুরোপুরি না জানলেও ওর ওড়িশী গুরুরা নিশ্চয়ই এসব জানেন।

অপালা আমার বাসা থেকে বেরিয়ে যাবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টাও কাটেনি, একটা ছোট্ট চিঠি এল সংগীতার নামে। পত্রবাহক অপালার পাড়ার একটি ছেলে।

চিঠি পড়তে পড়তে সংগীতা আঁৎকে উঠল।

আমি অমনি বলে উঠলাম, কি হলো?

অপালার মা গতকাল হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন।

সংগীতা আমার হাতে অপালার লেখা চিঠিখানা ধরিয়ে দিল।

অপালা লিখেছে, শ্রীচরণেষু বৌদি, কাল মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড আগেও মা আমার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছিল, হঠাৎ একটা যন্ত্রণা, মুহূর্তে সব শেষ। এখন সমস্ত বুকখানা খালি হয়ে গেছে, কেবলই মনে পড়ছে তোমার মুখ।—অপালা।

বললাম, এখুনি যেতে হবে। তুমি চটপট সব গুছিয়ে নাও।

ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, শ্মশানের কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেছেতো?

ছেলেটি বলল, অপালাদি মুখে আগুন দিয়েছে। পাড়ার অনেক লোক গিয়েছিল, কোনো অসুবিধেই হয়নি।

আমরা তিনজনে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে গেলাম অপালার বাড়িতে। বাইরের ঘরে অপালার বাবা বসেছিলেন, আমাকে দেখে হাত দুটি জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। স্বল্পবাক্, অতি সুভদ্র মানুষ। আমি ওঁর দুটি হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। মামুলি অসুখের কথা জিজ্ঞেস করলাম না। আমি জানি, ইতিমধ্যে বহুলোকই ঐ প্রশ্ন করেছেন এবং একই উত্তর পেয়েছেন।

আমি শুধু বললাম, অপালা অনেকখানি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

উনি বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, মায়ের অভাব কি কখনো কেউ পূর্ণ করতে পারে।

বললাম, আমি একটু অপালার সঙ্গে দেখা করব।

উনি আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনি সোজা ভেতরে যান।

প্রথম ঘরখানা পেরিয়ে দ্বিতীয়টিতে ঢুকেই দেখতে পেলাম ওদের। মেঝেতে বসে আছে দুজনে। সংগীতার বুকের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বসে আছে অপালা। তার কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়ে আছে পিঠে।

আমার পায়ের সাড়া পেয়ে সম্ভবত মুহূর্তে ঘুরে বসল অপালা। আমাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল এবং এগিয়ে এল। এই প্রথম আমি আনন্দে উচ্ছল অপালাকে মাথা নিচু করে আমার সামনে দাঁড়াতে দেখলাম। আমি ওর মাথায় হাত রাখতেই ও মেঝের ওপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরাল।

আমার এখানেও প্রবোধ দেবার কোনো ভাষা ছিল না। শুধু বললাম, তোমার মুখের হাসিখুশী রূপটা দেখতেই সকলে অভ্যস্ত, আজ মা তোমাকে নাড়া দিয়ে চোখের জল ঝরিয়ে দিলেন।

ও এবার আমার দুখানা হাত অসংকোচে ওর হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। হাতের চাপে বুঝলাম, ও আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে। টলটল নড়ছে চোখভরা জল।

কতক্ষণ পরে ধাতস্থ হলো অপালা। আমরা তিনজনে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ওর মায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলাম। অবশ্য অপালাই ছিল বক্তা, আমরা মাঝে মাঝে আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলাম।

একবার অপালার মা গঙ্গোত্রীর পথে যেতে যেতে প্রখর রোদ্দুরে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। কাছে পিঠে কোনো লোকালয় ছিল না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর একটি কিশোরীকে ছাগল চরাতে দেখে তিনি তাকে কাছে ডাকলেন।

মেয়েটি যেমন সুন্দর তেমনি শান্ত।

তুমি আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারে মা ?

মেয়েটি বলল, জঙ্গলের ভেতর একটু ওপরে উঠলেই আমাদের ঝুপড়ি। তোমরা কি ওখানে যাবে, না আমি লোটায় করে জল এনে দেব ?

বাবা বলল, বার বার তোমাকে ওঠানামা করতে হবে না, আমাদের তোমার ঝুপড়িতেই নিয়ে চল।

বাবা মা ওদের ঝুপড়িতে গিয়ে দেখে হতদরিদ্র পরিবার, কিন্তু কি আন্তরিকতা। ঘরের পুরুষটি মজুর খাটতে বেরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটির মা ঝকঝকে মাজা চুমকিতে জল এনে খেতে দিল। মকাই দুটো ঝটপট সেঁকে এনে অতিথিদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমরা বড় দুঃখী মা, এর চেয়ে বেশী দেবার আর কিছু নেই।

কথায় কথায় জানা গেল মেয়েটি বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, কিন্তু সামান্য এমন কিছু সম্বল নেই, যাতে ওকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারা যায়।

অমনি আমার মায়ের মনটি গলে গেল। ঐ কিশোরী মেয়েটিকে কোলে টেনে নিয়ে আমার মা এক কাণ্ড করে বসল। হাতের দুটো সোনার বালা আর গলার সরু হারখানা তাকে পরিয়ে দিয়ে বলল, এবার রাজার ছেলে এসে সোনার প্রতিমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

এমনি টুকরো টুকরো মায়ের অজস্র স্মৃতির সুতোয় অশ্রুবিন্দুর মালা গেঁথে চলল অপালা। আমরা জানতাম, অপালার হৃদয়টিও তার মায়েরই দান।

একসময় সঙ্গীতা বলল, সুমনাকে দেখছি না কেন, সে কি খবর পায়নি ?

অপালা বলল, ওকে ইচ্ছে করেই খবরটা দিইনি বৌদি। শুনলেই ও ভেঙে পড়বে। একেবারে পণ্ড হয়ে যাবে ওর ফাংসান। যে ছেলেটি তোমার বাসায় আমার চিঠি নিয়ে গিয়েছিল সে চমৎকার বাঁশ আর বেতের কাজ করতে পারে। অনুষ্ঠানের দিন সকালে ও মঞ্চের ওপর মালঞ্চ তৈরী করে দিয়ে আসবে। তার গায়ে ফুলের কাজ করবে মালাকার। আমার আঁকা প্যানেলগুলোও ছেলেটি সাজিয়ে রাখবে ঠিক ঠিক জায়গায়। আমি জানতাম তুমি খবর পেয়েই আসবে। আর তোমার ওপর ভার দেব সুমনাকে আমার এই অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলে সমস্ত দিক ম্যানেজ করতে। ও যেন ওর পুরো শক্তি দিয়ে ওর অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলে।

সঙ্গীতা বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সুমনাকে সব ঠিক বুঝিয়ে বলব। ওর অনুষ্ঠান সাকসেসফুল হতেই হবে। গীতগোবিন্দে যিনি মাধবের ভূমিকায় নাচবেন সেই বিনায়ক গোস্বামীর কথা কখনও তো তোমার মুখে শুনিনি।

বিশ্বাস কর বৌদি কোনো দিনই দেখিনি তাঁকে। সুমনা বলেছে, ফাংশানের শেষে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

নাচের অনুষ্ঠান দীর্ঘ করতালি-ধ্বনির ভেতর দিয়ে শেষ হয়ে গেল। আমি ভাবতেই পারিনি, সুমনা এমন অপরূপ সুষমায় নিজেকে মেলে ধরতে পারবে। একটা মুকুলিত শাখা যেন ধীরে ধীরে পুষ্পিত হয়ে উঠল। কোকিল ডেকে উঠল কুহুস্বরে।

'অভিসার' পর্বে বিনায়কের ভাও ভোলার নয়। কুঞ্জবিতানে একবার এসে বসছে, কিন্তু অস্থিরতা তাকে বেশীসময় বসে থাকতে দিচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত পায়ে কিছুটা এগিয়ে কর্ণমূলে হাতের পাতাটি ধরে কার যেন নূপুরের ধ্বনি শোনার চেষ্টা করছে।

হুহু একটা হাওয়ার শব্দ উঠল মঞ্চ কাঁপিয়ে। মৃদু করতালের ধ্বনির মতো মর্মরধ্বনি শোনা গেল। আশ্চর্য, তবলার লহরায় বেজে উঠল সে ধ্বনি। সে আসে, সে আসে। প্রত্যাশার পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে প্রার্থিতা। চতুর প্রেমিক সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। যেন প্রেমিকার জন্য আদপেই সে উদ্বিগ্ন নয়। হাতে ধরা একটি গন্ধপুষ্পের সুবাস গ্রহণই যেন তার একমাত্র আগ্রহের বিন্দু।

সহসা মনে পড়ে গেল শয্যার কথা। লতাবিতানের অন্তরাল থেকে এক-গুচ্ছ ফুল নিয়ে ছড়িয়ে দিল মধু-মিলন-শয্যায়। অমনি বেজে উঠল বাঁশরী। মন্দিরা, মৃদঙ্গে উঠল বোল।

সহচরীদের কলকণ্ঠে বেজে উঠল সঙ্গীত,—

'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শংকিত ভবদুপযানং।

রচয়তি শয়নম্ সচকিত নয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্ ।'

গানে নাচে অভিনয়ে তরঙ্গিত হয়ে উঠল প্রেক্ষামণ্ড।

সমাপ্তির পর দর্শকদের উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনে 'দেবদাসী কলাকেন্দ্রে'র কুশীলবরা আপ্লুত হলো। অনুপ্রেরণা লাভ করল পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য।

একে একে সবাই হল ছেড়ে চলে যাবার পর আমরা দুজনে একটি কোণের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। মনে হলো একজোড়া চোখের দৃষ্টি আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চোখাচোখি হতেই চেঁচিয়ে উঠল সুমনা, ঐ তো স্যার। অনুষ্ঠানের প্রথমে পৌরোহিত্য করে কোথায় যে চলে গেলেন, দেখতেই পেলাম না। আর বৌদি, তোমার তো আমার কাছে থাকবার কথা ছিল। একেই অপালার জন্য আমার কিছু ভাল লাগছে না, তারপর তুমিও একেবারে বেপাত্তা।

কথাগুলো বলতে বলতেই সুসজ্জিতা নর্তকী ছুটে এলো আমাদের দিকে। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সুমনাকে বললাম, তুমি যে ভেতরে ভেতরে এতখানি প্রস্তুত হয়েছ তা একেবারেই বুঝতে পারিনি। এই নাচই তোমাকে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে একদিন রক্ষা করবে।

সুমনা আমার পায়ে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, আশীর্বাদ করুন স্যার তাই যেন হয়।

সঙ্গীতা বলল, তোমার দাদা বৌদি কোথায় সুমনা ?

মাথা নত করে সুমনা বলল, তুমি তো সব জান বৌদি। অপালা আমাদের এই অনুষ্ঠানের কার্ডখানা আমার বৌদিকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। বৌদি একবার চোখ বুলিয়েই ঝাঁঝিয়ে উঠল, এসব আমাকে দেখানো কেন? তিনি নাচের ফাংশানের তদারকি করতে সারাদিন বেরিয়ে যাবেন আর আমি সি, এল নিয়ে ঘরে বসে থাকব রান্না করা, ঝাঁট দেওয়া আর বাসন মাজার জন্য।

এরপর অপালা আর দাদার কাছে যায়নি, কারণ সুমনার বৌদির অমতে দাদার কোথাও নড়াচড়ার সাধ্য নেই।

আমি এই অপ্রীতিকর পারিবারিক আলোচনার অবসান ঘটিয়ে বললাম, বাধা ছিল বলেই তুমি হয়ত এত ভাল একটা অনুষ্ঠান উপহার দিতে পারলে।

সুমনা ইতিমধ্যে মঞ্চের দিকে হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ইশারায় ডাক দিল।

পাঞ্জাবি আর চুড়িদার পরা একটি সুদর্শন যুবক উইংসের ভেতর থেকে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। এবারও ইংগিতে মনে হয় কিছু কথা হলো। ছেলেটি নত হয়ে আমার পা ছোঁয়ার আগেই আমি ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, শ্রীকৃষ্ণ মাধবের ভূমিকায় তোমার অভিনয় ভোলার নয়। তোমার হাত পায়ের স্বচ্ছন্দ গতি, বিশেষ বিশেষ মুদ্রা, চোখ মুখের এক্সপ্রেশান দর্শকদের প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছে। তোমাদের কয়েকটি দ্বৈত নাচও মনে রাখার মতো।

শেষে বললাম, কলাকেন্দ্রটিকে বাঁচিয়ে রেখো।

ও বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, আশীর্বাদ করুন যেন বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

এরপর সংগীতাকে হাত জোড় করে নত হয়ে নমস্কার জানাল।

সংগীতা বলল, শিল্পীকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলাম আমার বাসায়। একদিন সময় করে এলে খুব আনন্দ পাব।

বিনায়ক বলল, অবশ্যই যাব বৌদি, সেদিন জমিয়ে গল্প করা যাবে।

আমাদের ওরা একটা ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিল।

বাসায় পৌঁছে বারান্দার মোড়ায় বসলাম। দক্ষিণ থেকে ভারী উপভোগ্য হাওয়া বয়ে আসছিল। এরই ভেতর সংগীতার টবের বাগানে বেশ কয়েকটি মোতিয়া বেল ফুটেছে, কি মিষ্টি গন্ধ। বাইরে ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলো। মাজা রুপোর ঝকঝকে রেকাবির মতো নীল আকাশের বুকে চাঁদটা বার বার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। অদূরে গাছগাছালির ওপার দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে, চাকায় ঝংকার তুলে একটা ট্রেন ছুটে চলে গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কামরার টুকরো টুকরো আলো ঝিলিক দিতে দিতে মুছে গেল একসময়। প্রতিদিন কত ট্রেন যাওয়া আসা করে, তবু ঐ আওয়াজ উঠলেই কেমন এক ধরনের রোমাঞ্চ জাগে। একেবারে খাবার টেবিলে না বসে গেলে আমি ট্রেন দেখব বলে বারান্দায় আজও বেরিয়ে আসি। অনেক সময় ভাবি, একি আমার রক্তের ভেতর দিয়ে শৈশবের সেই ভাবের প্রবাহ! তখন মামার বাড়িতে থাকি। গ্রামের রাস্তার পাশেই আমাদের পাঠশালা। রসুলপুর নদীর ওপারের যাত্রীদের নিয়ে বাস ছুটে চলে যেত আমাদের পাঠশালার ধার দিয়ে। প্রতিদিন পৌনে দশটায় বাসটা আমাদের পাঠশালা পেরিয়ে যেত। আমরা দূর থেকে বাসের শব্দ শুনতে পেলেই হৈ হৈ করে পাঠশালা ছেড়ে বাইরে বরিয়ে আসতাম, ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাওয়া বাসটাকে দেখব বলে। পেট্রোলের গন্ধ ধুলোর গন্ধের সঙ্গে মিশে নাকে এসে ঢুকত। কি অপূর্ব সে দৃশ্য আর গন্ধ।

দুকাপ চা হাতে নিয়ে বারান্দায় এল সংগীতা। এক কাপ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য কাপটা নিয়ে বসল আমার পাশের মোড়ায়।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, তোমার ডিনারের খবর কি?

একটি পদ বাকী, এতক্ষণে সেটিকেও নর্মদাদি চাপিয়ে দিয়েছে উনুনে।

বললাম, শিল্পীদের তো একদিন আসতে বলেছ, সেকি শুধু চায়ের সঙ্গে গল্প জমাতে?

সংগীতা বলল, নেমন্তন্ন যখন তুমি করনি তখন আপ্যায়নের ভাবনাটা আমার ওপরেই ছেড়ে দাও।

বিনায়ক ছেলেটি কিন্তু বেশ। ওর নাচ আমার দারুণ ভাল লেগেছে। কথকের তাল আর গতি, ওড়িশীর দেহভঙ্গিমার সঙ্গে মিশে কেমন দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল বল!

সংগীতা বলল, যুগল নৃত্য অনেক দিন একসঙ্গে প্র্যাকটিশ না করলে এমন

বাহার নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত না।

বললাম, ঠিকই বলেছ। এক একবার মনে হচ্ছিল, ওদের দুজনকে কল্পনা করেই যেন কবি তাঁর এই মধুর রসের কাব্যটি রচনা করে গেছেন।

সংগীতা আমার কথার সূত্র ধরে অদ্ভুত একটি মন্তব্য করল, কবি জয়দেব যদি ভবিষ্যতের নর্তক-নর্তকীকে দেখে তাঁর কাব্য রচনা করতে পারেন তাহলে আমিও ঐ নর্তক-নর্তকীকে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতের একটি ছবি আঁকতে পারি।

বললাম, বুঝেছি। তোমার অনুমান সত্য হলে আমি বিশেষ খুশী হব। তবে অনুমানের বিশেষ কোনো সূত্র কি তোমার হাতে আছে?

সংগীতা বলল, তেমন জোরাল কিছু নেই, তবে মেয়েদের নাকি তৃতীয় আর একটি চোখ আছে বলে তোমরা বল, সেই চোখের দৃষ্টিই আমার এ অনুমানের ভিত্তি।

আরও একটু সরল অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দেবে?

সংগীতা বলল, তুমি কি কিছু লক্ষ্য করনি? সুমনা নাচের পোশাকেই আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করল কিন্তু বিনায়ক তার নাচের পোশাক ছেড়ে সুভদ্র এক যুবকের বেশে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এটা হতে পারে সুমনার গোপন নির্দেশ। আমরা যাতে বিনায়ককে তার স্বাভাবিক চেহারায় দেখতে পাই।

আমি বললাম, এর ওপর ভিত্তি করে একটা জোরাল অনুমান কি খাড়া করা যায়?

তুমি বুঝছ না কেন, বিনায়ক উইংসের ধারে সুমনার ইশারার জন্য অপেক্ষা করছিল। ও আমার পাশে দাঁড়িয়ে ওদিকে ঘাড় ঘোরানো মাত্রই বিনায়ক স্টেজ থেকে নেমে এল। তারপর সুমনা চোখের ভাষায় আর মাথার দুলুনিতে তোমার পা ছুঁতে ইংগিত করল। শেষে প্রথম আলাপেই আমাকে সম্বোধন করল বৌদি বলে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার অনুমানের স্বপক্ষে যাচ্ছে না কি?

বললাম, তোমার তীক্ষ্ম দৃষ্টির তারিফ না করে পারছি না।

সংগীতা বলল, আমার অনুমান ভুল হতে পারে, তবে এমন একটি মিলন হলে অবশ্যই আমরা স্বাগত জানাব।

বললাম, বিনায়ক তো বিবাহিত হতে পারে।

সংগীতা বলল, অসম্ভব কিছু নয়। তবে সেক্ষেত্রে বিনায়ককে ডাকতে গিয়ে সুমনা ইশারা, ইংগিতের আশ্রয় নিত না। বলত, বিনায়কদা, এখানে একটু আসুন। আমার মাস্টারমশায় আর বৌদির সঙ্গে দেখা করে যান।

আবারও বললাম, সাধু, তোমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের তারিফ না করে পারছি না।

সংগীতা বলল, ওদের ভেতর যদি কোনো বোঝাপড়া হয় তাহলে আমরা খুবই খুশী হব, কি বল?

অবশ্যই। সংসার জীবনে দুঃখী মেয়েটার একটা সুস্থিরতা আসবে। তাছাড়া একই শিল্পের সাধক ওরা, তাই মিলনটা হবে আনন্দের।

মানুষের ইচ্ছা আর সেই ইচ্ছার পূর্তি প্রায়ই এক পথ ধরে চলে না। আমরা অন্তর থেকে সুমনা আর বিনায়কের মিলনের যে ইচ্ছাটি পোষণ করেছিলাম বিধাতা পুরুষ সেখানে একটি ঝড়ের সৃষ্টি করে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে দিলেন।

প্রায় দিন দশেক পরে শ্রাদ্ধের চিঠি হাতে নিয়ে অপালা এলো। তারই মুখ থেকে শুনতে পেলাম আসন্ন ঝড়ের শব্দ।

অপালা আমাদের বসার ঘরে ঢুকে আমার হাতে শ্রাদ্ধের চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, সামান্য আয়োজন করেছি। মা যাঁদের ভালবাসত শুধু তাঁদেরই ডেকেছি। বৌদি তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে।

সঙ্গীতা বলল, অনুরোধ হলে তো রাখতে পারব না ভাই। দাবি হলে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

অপালা বলল, হাঁ আমারই ভুল। তাহলে সোজাসুজি বলে ফেলি, মায়ের শ্রাদ্ধ বাসরে তুমি রবীন্দ্রনাথের কয়েক খানা পূজার গান আর রজনীকান্তের দু'চারখানা ভক্তিগীতি গাইবে। তোমার গান থাকলে মা রেডিওটি খুলে বসে থাকত।

সঙ্গীতা বলল, আমি নিশ্চয়ই যাব অপালা।

স্যার আপনাকেও থাকতে হবে শ্রাদ্ধবাসরে। আমি বৌদির কাছে শুনেছিলাম, শ্রাদ্ধ বাড়িতে আপনি কখনো খান না। বেশ, ইচ্ছা না হলে খাবেন না, কিন্তু কাজের কাছে আপনি উপস্থিত থাকলে মায়ের আত্মার শান্তি হবে।

আমাকে এত করে বলতে হবে না অপালা, আমি অবশ্যই যাব এবং খেয়েও আসব। কারণ প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে যাই, সেদিন তোমার মা খেয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি খাইনি সেদিন। বলেছিলাম, অবশ্যই একদিন খাব। তাঁর আত্মা যদি শান্তি পায় তাহলে ঐ দিনই আমি খেয়ে আসব। আমার কথাটাও রাখা হবে।

এবার অপালাকে ডেকে নিয়ে সঙ্গীতা পাশের ঘরে চলে গেল।

ঘণ্টাখানিক গল্প করে ঘরে ফিরল অপালা। আমি সঙ্গীতাকে ডাকলাম। ও এলে বললাম, অপালার চেহারাটা এ ক'দিনে কেমন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে দেখেছ ?

সঙ্গীতা অমনি বলল, কারণ আছে।

সে তো আমিও জানি। ওর মায়ের চলে যাওয়াটা ওর বুকে কঠিন একটা আঘাত করেছে। কিন্তু তুমি কি লক্ষ্য করেছ ওর মুখে চোখে একটা ভাবনার ছাপ ফুটে উঠেছে।

সঙ্গীতা বলল, বলছি তো তার কারণ আছে। এতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলে

তা জানতে পেরেছি।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম সঙ্গীতার মুখের দিকে।

সুমনার কেসটা জটিল হয়ে উঠেছে। তাই অপালার মুখে তুমি দুশ্চিন্তার ছাপ দেখেছ।

কি রকম ?

সুমনা পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না। ঘরে পান থেকে চুন খসলেই কঠিন মন্তব্য। একেবারে হাড়মাস ভেদ করে মনে গিয়ে বিঁধছে। বাড়ি থেকে বাইরে বেরুনোর ব্যাপারেও কড়াকড়ি হচ্ছে। সুমনার দাদাবৌদি তো অপালাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। ভাবেন, ওই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। সুমনা নাকি অপালার কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, দেখিস, ওরা আমাকে তোর মায়ের কাজে আসতে দেবে না।

বললাম, বিনায়ক সুমনাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় তো ?

চাইলেই কি সব পাওয়া যায়। দু'দিকের ঘর সামলাতেই ওরা হিমশিম।

সুমনার বাড়ির খবর জানি, কিন্তু বিনায়কের বাড়িতে আবার কি হলো ?

তুলকালাম। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, রক্তে অব্রাহ্মণের মিশ্রণ ভাবতেই পারে না। আপাতত পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে বিনায়ক, তবে আর একটি ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটিয়ে বসে আছে দুজনে।

সে আবার কি ?

কার্শিয়াং-এ একটা ক্লাবের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিনায়ক কথক নাচের ডাক পেয়েছিল। ওর গুরুদেবই উদ্যোক্তাদের কাছে নামটা রেকমেণ্ড করেছিলেন। তারপর উদ্যোক্তারা যখন কণ্টাক্ট করতে এল ওর সঙ্গে তখন ও ওড়িশী নাচের একটা আইটেম ওদের প্রোগ্রামে যোগ করতে বলল। এমন কি বিনি পয়সায় একটা যুগল-নৃত্যে পরিবেশনের প্রলোভনও ওদের দেখালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রস্তাব মঞ্জুর।

বললাম, সুমনাকে কি ঘর থেকে এই নাচের জন্য দাদা বৌদি ছেড়ে দিল ?

এখানে অপালার সামান্য একটু ভূমিকা আছে। সে সুমনার সামনে তার দাদা-বৌদিকে বলল, দার্জিলিং-এ একটা নাচের স্কুল আছে, ওরা ওড়িশী নাচের শিক্ষিকা চায়। মাইনে ভাল দেবে, অবশ্য ইণ্টারভিউতে টিকলে। আসবে অনেকেই। ওর ভাগ্য ভাল থাকলে পেয়ে যাবে। কিন্তু সবার আগে আপনাদের অনুমতি চাই।

বৌদি অমনি বলে উঠল, যাওয়া আসার পয়সা আমরা দিতে পারব না। ওর যেতে ইচ্ছে হলে ও-ই যোগাড় করবে।

অপালা বলল, পয়সার কথা ভাববেন না বৌদি, ওরাই যাওয়া আসা থাকার খরচ দেবে।

বৌদি, কোনো কথা না বলে মুখখানা হাঁড়ি করে উঠে গেল।

দাদা নাকি বলল, যা ভাল বোঝ কর, কোনো ঝামেলাটামেলায় জড়িও না।

বললাম, অবশেষে দুজন নৃত্যশিল্পীর কার্শিয়াং গমন ও নৃত্য-প্রদর্শন।

সঙ্গীতা বলল, না মশাই, পুষ্পধনুর রথ ওখানেই থেমে যায়নি। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং হয়ে একেবারে গ্যাংটকে থেমেছে। সেখানকার একজন ব্যবসায়ী কার্শিয়াং-এ ওদের নাচ দেখে মুগ্ধ। তিনিই সারাপথ ওদের ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন নিজের গাড়িতে চড়িয়ে। ওরা দার্জিলিং ঘুরে তাগদা, মংপু, কালিম্পং দেখে তিস্তার তীরে তীরে জলতরঙ্গের বাজনা শুনতে শুনতে এগিয়েছে। তারপর পাহাড়ের চোখ জুড়ানো সবুজ ঢাল বেয়ে হাজির হয়েছে গ্যাংটকে। সেখানে তখন একটা শিল্প ও বস্ত্র প্রদর্শনী চলছিল। ওদের নাচ দেখানোর ব্যবস্থা হল সেই মেলা-প্রাঙ্গণেই।

বললাম, আঙুলে গোনা একটা সপ্তাহের ভেতর কিছু অর্থপ্রাপ্তি আর প্রকৃতি-দর্শন হয়ে গেল। দারুণ শুভযোগ বলতে হয়।

সঙ্গীতা বলল, সব দিক থেকেই শুভযোগ চলছিল। নক্ষত্রভরা নীল আকাশটা কৃষ্ণপক্ষের রাতে জ্বলজ্বল করছিল, হঠাৎ তার ভেতর দুমু করে ঢুকে পড়ল একটা ধূমকেতু।

সে কি! বেশ রসিকতা জুড়ে দিলে দেখছি।

সঙ্গীতা বলল, আজ্ঞে না, একেবারেই রসিকতা নয়। ব্যাপারটা শোন। এক ইংরাজী দৈনিকের রিপোর্টার তখন গ্যাংটকে ছিলেন। তিনি কভার করছিলেন মেলাটা। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল বিনায়ক আর সুমনার যুগল-নৃত্যের প্রশংসা। আর যায় কোথা, গ্যাংটকের গুপ্ত খবরে কোলকাতা তোলপাড়।

বললাম, কয়েকদিন আগেকার খবর কাগজেও তো প্রশংসা বেরিয়েছে ওদের গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানের।

সঙ্গীতা বলল, সেটা তো সকলকে জানিয়ে করেছে ওরা। ঘরের ছেলে, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে কয়েক ঘণ্টার ভেতরে। আর এ যে মিথ্যে ইণ্টারভিউর ভড়ং কি দিয়ে পুরো এক সপ্তাহ প্রাক-বিবাহ হানিমুনের মহড়া! একেবারে ক্ষমার অযোগ্য।

তোমার কাছেও?

না না, আমি তাদের ক্ষমার অযোগ্য ভাবতে যাব কেন। বেশ করেছে, তবে শেষ রক্ষাটি হলে হয়।

বললাম, অপালা এতখানি মুষড়ে পড়ল কেন?

সুমনা মিথ্যে বলার জন্য বাড়িতে মহা ঝামেলায় পড়ে গেছে। একেবারে চরিত্র নিয়ে টানাটানি। অপালা জট ছাড়াতে গিয়েছিল। সে বোঝাতে চেষ্টা করছিল, গ্যাংটকের নাচটা কাকতালীয়। ইণ্টারভিউয়ের সময়ে পাশের ঘরে একটু করে নাচের ডিমনোস্ট্রেশান দিতে হচ্ছিল। একজন বিচারক সুমনার নাচ দেখে গ্যাংটকে ওদের পারফরমেন্সের ব্যবস্থাটা করে দেন।

বৌদি নাকি চোখমুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ছোঁড়াটা ওখানে জুটল কি করে? নিশ্চয়ই ব্যাপারটা প্রি-প্ল্যান্ড্।

অপালা হাসতে হাসতে ব্যাপারটা হালকা করে দেবার চেষ্টা করছিল।

ও বলেছিল, বিনায়ক গোস্বামীও ইণ্টারভিউর ডাক পেয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে গ্যাংটকের অনুষ্ঠানে ওরা দুজনেই যোগ দেয়। আসলে ওদের নাচটা একসঙ্গে তৈরী করা ছিল কিনা, তাই সুবিধে হয়ে যায়।

এতগুলো যুক্তিপূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও ভাবিকে ভোলাতে পারেনি অপালা। বন্ধুর কেসটা যেমন ছিল, তেমনি ঝুলে রইল। তার ওপর বৌদি নাকি শেষ কথাটি শুনিয়ে দিয়েছে, হয় নাচ, নয় বাড়ি—দুটোর যে কোনো একটাকে ছাড়তে হবে। তাই অপালার মুখচোখের চেহারা এমন বিষণ্ণ আর ম্লান। সুমনাকে ও যে কি ভালবাসে না তা তুমি ভাবতেই পারবে না। সুমনা যেন অপালার নিশ্বাস প্রশ্বাস।

বললাম, তরুণ বয়সে বন্ধুত্ব গভীর হয় আর প্রেম গাঢ় হয় পরিণত বয়সে।

হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল সংগীতা। একসময় বুকের গভীর থেকে বলে উঠল, অপালার বন্ধুপ্রীতির কথা বলে শেষ করা যাবে না। ওর ঠাকুমা ওকে প্রায় আশি ভরি সোনার গয়না দিয়ে গেছেন। ব্যাংকের লকারে সেগুলো রাখা আছে। আরও অনেক কিছু রয়েছে তার ভেতর। অপালা ব্যাংকের খাতায় সুমনার নামটাও ঢুকিয়ে দিয়েছে। দুজনের যে কেউ অপারেট করতে পারবে।

ও সুমনাকে বলেছে, যা কিছু আমি পাব তার আদ্দেক তোর। তুই কিছু ভাবনা করিস না।

বললাম, তাহলে সুমনার আর ভাবনাটা কি ?

সংগীতা বলল, তুমি সুমনাকে খুব চিনেছ। আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, কানাকড়ি ঐশ্বর্যের লোভ নেই ওর। অপালা দুঃখে ভেঙে পড়বে বলে ও নির্বিবাদে সব মেনে নিয়েছে। ও আমাকে একদিন গোপনে বলেছে, বৌদি, আমি আমার মা বাবার কাছে কৃতজ্ঞ, তারা আমার জন্য কিছু রেখে যেতে পারেনি বলে। বাবার সামান্য আয়ে দাদার পড়াশোনা আর আমাদের সংসারটুকু কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত। দাদা ভাল চাকরি পেল কিন্তু তার আগেই খবরটা না শুনে বাবা চলে গেল আমাদের ছেড়ে। মায়ের সম্বল ছিল দুটোমাত্র কান-পাশা। বাকি সব দাদার পড়ার খরচ চালাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। মা বৌদির মুখ দেখেছিল ঐ শেষ সম্বলটুকু দিয়ে।

সুমনা বলে, বৌদি, আমি দুটো ঝিয়ের মতো বাড়ির কাজ করি, ভাইঝিটার দেখাশোনাও আমার ওপরে। তাছাড়া কলেজের অফ পিরিয়ডে একেবারে লাগাও বাড়িতে দুবোনকে নাচ শিখিয়ে টাকা রোজগার করেছি। ঐ টাকাতেই মাইনে যুগিয়েছি নিজের নাচ শেখার। আমি কেন অন্যের দয়ার দান নিতে যাব ? অপালার অনেক উঁচু মন, কিন্তু যদি সে মনে কোনোদিন সামান্যতম চিড়ও ধরে তাহলে আমি সইতে পারব না। ওকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বলেই একেবারে মরে যাব।

সংগীতা থামল।

আমি বললাম, ওদের ওপর আমাদের আকর্ষণের প্রধান কারণই হল ওদের আশ্চর্য দুটি মন। আচ্ছা সঙ্গীতা আমার মনের ভেতর একটা প্রশ্ন জেগেছে, তুমি তার সঠিক উত্তর দিতে পারবে ?

ও আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল।

আমি বললাম, সর্বস্ব দান করার ক্ষমতা আর সেই দান দরিদ্র হয়েও গ্রহণ না করার ক্ষমতা, এ দুয়ের ভেতর কোনটাতে মনের জোর বেশী দরকার হয় ?

সঙ্গীতা বলল, মনে হয় শেষেরটিতেই বেশী শক্তির দরকার।

বললাম, আমারও তাই মনে হয়। তবে এও ঠিক একজন বিত্তবান, যে চিরটা কাল ভোগের ভেতর প্রতিপালিত, তার পক্ষে সর্বস্ব ত্যাগ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু সে করতে পারে মনের গভীর কোনো আবেগের তাড়নায়। কিন্তু অভাবগ্রস্তের না নেওয়ার ভেতর তার গভীর আত্মমর্যাদাবোধ কাজ করে। যা তার প্রলোভন আর প্রয়োজন দুটোকেই সংযত করার ক্ষমতা রাখে। এটা প্রায় অসম্ভবের আওতায় পড়ে।

শ্রাদ্ধের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো। ডেকরেটার অপালার নির্দেশে ধবধবে পাটভাঙা সাদা থানেই শ্রাদ্ধ বাসর সাজিয়েছিল। মালাকার সাদা ফুলের সঙ্গে সবুজ পাতা কেটে কেটে অপালারই পরিকল্পনা মতো তৈরী করেছিল বর্ডারগুলো। বাঁশের সরু সরু কাঠির সঙ্গে সাদা ফুল গেঁথে গেঁথে বানানো হয়েছিল ফুলের ঝাড়-লণ্ঠন। হলুদ রঙটা পছন্দ করতেন অপালার মা। হলুদ কল্কে ফুল তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তাই শ্রাদ্ধের চাঁদোয়া ঘিরে যে সাদা ফুলের ঝালর ঝুলছিল, তাদের শেষ প্রান্তগুলিতে গাঁথা ছিল এক একটি করে হলুদ কল্কে ফুল।

সঙ্গীতার পুজো পর্যায়ের গানে আত্মনিবেদনের ভাবটি ফুটে উঠেছিল। দু'একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা এসে তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন।

যেখানে শ্রাদ্ধের কাজ হচ্ছিল সেখানে একটি উঁচু মঞ্চ তৈরী করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল বাবা মায়ের স্মৃতির স্পর্শমাখা ছবিগুলো। তাদের মাঝখানে ছিল অপালার মায়ের বেশ বড় একখানা ছবি, চন্দনে চর্চিত। পুজোয় বসে রয়েছেন, দৃষ্টি অন্তর্মুখী।

শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হলে আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে বাসায় আসার উদ্যোগ করছি, এমন সময় সঙ্গীতার হাতখানা চেপে ধরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অপালা। চোখ দুটো জলে ভেজা। অসহায়ের মতো বলে উঠল,তুমি ছাড়া মায়ের স্নেহ দিতে আমার আর কেউ রইল না বৌদি। আমি যত দোষই করি, তুমি আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না বল ?

সঙ্গীতা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, পাগ্‌লি, আমি কি কখনো তোদের ছাড়তে পারি রে।

বেলা পড়ে এসেছে, আমরা দুজনে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসেছি

বারান্দায়। সূর্যের ঝারি থেকে কোমল সোনা ঝরে ঝরে পড়ছে পার্কের পাতাভরা গাছপালার ওপর। বড় বড় বাড়িগুলোর গা বেয়ে সে আলো গড়িয়ে পড়ছে অলিতে গলিতে, বস্তির খাপরার চালে। সে দিব্য আলোর এক চিলতে প্রসাদ থেকে আমার ছোট্ট বারান্দাটুকুও বঞ্চিত হয়নি।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বলে উঠলাম, সংগীতা, তোমার মুখখানা সোনা-মুখী ডাবের মতো কোমল হলুদ হয়ে উঠেছে। এটা তোমার জন্মগত না শেষ সূর্যের প্রসাধন-লীলা তা বুঝে উঠতে পারছি না।

ও বলল, আর বুঝে কাজ নেই, তোমার এমন সুন্দর একটি মনোহারী মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ।

সঙ্গে সঙ্গে সংগীতা তার হাতের কাপটা জানালার বিটের ওপর নামিয়ে বারান্দার একপ্রান্তে রাখা টবগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বসন্তে গাছভরে ফুটেছে বেলফুল। ও দুটি সবুজ পাতাসহ একটি ফুটন্ত মোতিয়া বেল তুলে এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, তোমার সোনালী মন্তব্যের জন্য আমার সবুজ শুভ্র উপহার।

চমৎকার মুহূর্ত। আমরা আবার চা খেতে শুরু করেছি, হঠাৎ একটা ট্রেন তীব্র তীক্ষ্ন বাঁশী বাজিয়ে আমাদের আনন্দেভরা মগ্ন মুহূর্তকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চলে গেল। ঠিক যেন বুকফাটা একটা আর্তনাদ ঠেলে বেরিয়ে এসে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

সংগীতার হাতের কাপ স্থির হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সুমনা ঢুকছে।

আমার চা খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। শেষ চুমুকটা দিয়ে আমি বসার ঘরে ঢুকলাম। সংগীতা সিঁড়ির মাথায় আগন্তুককে সস্নেহ অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

আমি বসার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। মেয়েটা অনেকদিন আসেনি। অবশ্য একটা পুরো সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে, নিজের নাচ শেখার কাজ আর টিউশানি চালিয়ে কোথাও কর্তব্য রক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়া প্রায় অসম্ভব। আমরা অপালার কাছ থেকেই ওর খোঁজটা পেয়ে যাই।

সুমনা উঠে এল। আগের অভ্যেস মতো জড়িয়ে ধরল সংগীতাকে। কিন্তু একি! সময় পেরিয়ে যায় কিন্তু ওর হাতের বাঁধন শিথিল হয় না। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম, কান্নার আক্ষেপে ওর সারাটা দেহ ফুলে ফুলে উঠছে।

কতক্ষণ পরে সংগীতা ওকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। আমি বারান্দায় উঠে এলাম। সূর্য চোখের আড়ালে চলে গেছে। পশ্চিমের আকাশ জুড়ে তার অশান্ত আক্ষেপের ছবি।

সন্ধ্যা নামল। অগণিত নক্ষত্রে ভরে গেল আকাশ। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, চন্দ্রোদয়ে বিলম্ব আছে। মৃদু হাওয়া বয়ে আসছিল দক্ষিণ থেকে। আমার

বারান্দার টবে ফুটে ওঠা বেল ফুলের সকরুণ সুবাস নিয়ে খোলা দরজার পথে সে বাতাস ঢুকে গেল অন্দরে। যেন এক অশ্রুমুখী তরুণীর ব্যথাভরা হৃদয়ে সমবেদনার স্পর্শ দিতে বয়ে গেল সে।

পথে আলো জ্বলে উঠেছে। নিত্যকার ট্রেন বাসের যাত্রীরা কাজের শেষে ফিরে আসছে ঘরে। সংগীতাদের গলার ক্ষীণ শব্দটুকুও আর পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় ওরা এখন শোবার ঘর থেকে রান্নাঘরে চলে গেছে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বৌদির সঙ্গে কাটিয়ে চলে যাবার সময় সুমনা এল আমার ঘরে। সংগীতাই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। মুখখানা নত হয়ে আছে। আমি সংগীতাকে বললাম, খাইয়ে দিয়েছ তো?

বেশী খেল কই, এই একটুখানি খেয়েছে। শোন, আমি ওকে স্টেশান পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসছি।

বেশ তো।

এবার সুমনার দিকে তাকিয়ে বললাম, সুমনা, দুঃখের রূপ যে রকমই হোক তাকে দুহাতে ঠেলে সরাতে হবে। হার মানলে চলবে না। সব সময় ভাববে, নিজেকে রক্ষা করার অসীম ক্ষমতা তোমার নিজের ভেতরেই আছে।

কি ভেবে ও আর একবার আমার পা ছুঁয়ে সংগীতার সঙ্গে নিচে নেমে গেল।

কয়েক সেকেন্ড পরে আবার উঠে এল সংগীতা। আমার হাতে একখানা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ, আমি আসছি।

সংগীতা দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেল।

আমি চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলাম।

সুচরিতা,

পথ চলতে চলতে ছোট্ট একটি বাগানের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। চঞ্চল প্রজাপতির মত নাচতে নাচতে তরুণী একটি মেয়ে প্রতিটি গাছের কাছে গিয়ে ফুল ফোটানোর মন্ত্র বলছিল।

আমি তার দেহভঙ্গিমা আর অভিনয় কলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। নড়তে পারলাম না সেখান থেকে। কবিগুরুর ভাষায় সেদিন বলতে ইচ্ছে করছিল, 'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী'।

লীলাভরে সেদিন তুমি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে। কত্থকে ওড়িশীতে সেদিনই হয়েছিল যুগলবন্দী।

আমরা একটি পুষ্পিত মালঞ্চ রচনার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, কিন্তু ভয়ংকর এক ঘূর্ণি ঝড় ছুটে এসে ভেঙে দিয়ে গেল সে মালঞ্চ।

*　　*　　*

গ্যাংটক থেকে ফেরার দিনটির কথা চির অম্লান হয়ে থাকবে দুটি নীড় হারা পাখির স্মৃতিতে। মনে আছে? তাগ্‌দার কাছাকাছি এসে বিকল হয়ে গেল জীপ। তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাল তাল কুয়াশা

ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাহাড়ে অরণ্যে। আশ্চর্য দক্ষতায় ড্রাইভার দার্জিলিংগামী জীপের মুখ ঘুরিয়ে দিল তাগ্দার দিকে। কয়েক কিলোমিটার পথ গভীর অরণ্যের ভেতর দিয়ে গাড়ি নিচের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এল তাগ্দায়। আমরা রাতের আশ্রয় পেলাম গভীর অরণ্যের ভেতর ইংরাজ আমলের তৈরী প্রাচীন এক বাংলোতে। কাঠের বিশাল বাড়ি, কাচের বড় বড় জানালায় ঘেরা। প্রায় দুশো ফিট লম্বা দুটো কনিফার বাংলোর একপাশে দাঁড়িয়ে। নির্জন অরণ্য, নিস্তব্ধ বাংলো। চৌকিদার রাতের খাবার দিয়ে নেমে গেল তার নিচের কোয়ার্টারে। ড্রাইভারও চলে গেল তার সঙ্গে।

আমরা দুজন। আকাশভাঙা বৃষ্টি নামল। তোমার ভুলে যাওয়ার কথা নয় সুমনা, হঠাৎ পর্বতকে চৌচির করে দিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাজ। কেবল সেই মুহূর্তে তুমি আমাকে স্পর্শ করলে। একটি ভয় পাওয়া হরিণীর মতো তুমি ত্রস্ত পায়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে আমার বুকে। পরমুহূর্তে সরে গিয়েছিলে তুমি। অদ্ভুত তোমার সংযম। নিজের শুদ্ধতার শক্তিতে বিজয়িনী হয়েছিলে সেদিন।

মনে আছে? বাইরে বিদ্যুতের ঝিলিক, পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘ-গর্জনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ছেদহীন বৃষ্টির প্রবাহ, সেদিন আমরা দুজনে হাতে হাত রেখে উপভোগ করেছিলাম। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আমাদের দুজনের দেহমন। আমরা হলঘরের সব কটা আলো জেবলে দিয়ে শুরু করেছিলাম নাচ। কখনো একক, কখনো দ্বৈত। গান চলেছিল, নাচ চলেছিল। নিজেরা সৃষ্টি করছিলাম, উপভোগ করছিলাম নিজেরাই। আমাদের ঘিরে সেদিন একটি অলৌকিক জগত তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুতের চমকে, বৈদ্যুতিক আলোর প্রবাহে, আমরা দুই নৃত্যশিল্পী দৃশ্যমান। কাচের স্বচ্ছ ঘর ঝলমল করে উঠছিল। অরণ্যের আশ্রয়ে যেসব পশুপক্ষী লালিত তারা এই বৃষ্টির নেশাভরা রাতে বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখছিল দুই সিদ্ধ সিদ্ধার নাচ। নিচে জনহীন অর্কিড সেণ্টারের গ্যালারিতে বসে বিচিত্র বর্ণের পোশাকে সজ্জিত কুসুম-কন্যারা মুগ্ধনেত্রে উপভোগ করছিল আমাদের লীলা-নৃত্য।

সেই মোহময়ী রাত্রিতে বৃষ্টিতে, বাতাসে, অরণ্যগন্ধে, নৈশ অন্ধকারে অনিবার্য এক দেহজ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু আমরা তাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। আমরা আমাদের সে রাতের মধুর ভাবটিকে কোনো মোহমায়াতেই লুপ্ত হতে দিইনি। পাশাপাশি শুয়ে নিদ্রাহীন নিশি যাপন করেছিলাম, হাতে হাতও রেখেছিলাম কিন্তু উদ্দাম ইচ্ছার ঢেউ সৌন্দর্যের তটভূমিকে লঙ্ঘন করেনি। সুমনা, আমরা দুজনেই শুদ্ধতার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। হয়ত আমাদের সে রাতের এই আচরণকে অনেকেই অস্বাভাবিক ভাবালুতা বলে মনে করবেন, কিন্তু আমরা সে রাতে শুধুমাত্র আমাদের সৃষ্ট নৃত্য-কলার আনন্দটুকুর পরিপূর্ণ উপভোগ চেয়েছিলাম। দেহের আকর্ষণ যে কোনো তরুণ-তরুণীর কাছে দুর্বার, আমরাও সে আকর্ষণের বাইরে নয়, কিন্তু তার ওপরেও অন্য কোনো বোধ যে মানুষের থাকতে পারে, সে রাতে

আমরা দুজনে সেই উপলব্ধির আনন্দেই বিভোর ছিলাম।

* * *

সুমনা, আমাদের সেই আনন্দের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেল মহানগরীতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। আমার বাড়ির প্রতিটি মুখ বরফ-শীতল। আমাদের গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানে আমার মা, দাদা বৌদির সঙ্গে এসেছিল তুমি জান। অডিটোরিয়ামের বাইরে তুমি তাদের প্রণাম করেছিলে। তোমার নামটি জানতে চেয়েছিল মা, কারণ কার্ড কম থাকায় আমি বাড়িতে একখানা কার্ড দিতে পারিনি। কেবল অনুষ্ঠানে আসতে বলেছিলাম। বৌদি আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, তোমার দোসর মেয়েটি কে? কেমন নাচে?

আমি বলেছিলাম, মঞ্চে দেখো, নিজের চোখে গুণাগুণ যাচাই করে নিও।

তুমি সেদিন মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে তোমার নামটি বলেছিলে। মা কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করেনি তোমাকে।

আমি বাড়ি ঢুকে খাবার টেবিলে বসলাম। মা খাবার নিয়ে এল। অন্য দিন বৌদিই খাবার আনে, একটু অবাক হলাম বৈকি।

আমি খাচ্ছিলাম, মা পাশে বসে। হঠাৎ মা বলল, তুমি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েও পড়নি। তোমার ইচ্ছা হল নাচ শেখার, ভাল গুরুর কাছে নাচ শিখলে। তোমাকে লক্ষ্ণৌতে রাজার হালে রেখেছিলেন তোমার বাবা। টাকা খরচ করেছেন দু'হাতে। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে তোমার নাচের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন গুরুজী। তুমি এই অল্প বয়সে কত তারিফ কুড়োলে। তোমার বাবার কত আনন্দ সেদিন। কিন্তু একি হাল হলো তোমার। বাবা ভাগ্যিস মারা গেছেন, তোমার এ পরিণতি দেখলে আফশোসে বুক ফেটে মারা যেতেন।

আমি কোনো কথার জবাব দিইনি। মা শেষে বলল, একটা মেয়ে আসবে বলে তার জন্যে হা-পিত্তেশ করে কুঞ্জে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করল না। তুই না গোস্বামী বাড়ির ছেলে? রায়বাহাদুর ব্রজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী তোর ঠাকুর্দা। কোথাকার একজন অব্রাহ্মণ, চাষাভুষো বাড়ির মেয়েকে জড়িয়ে ধরে স্টেজে নেচে এলি! ছিঃ ছিঃ, এরপর মুখ দেখাতে পারব না আমি কারু কাছে।

আমি সেদিন প্রতিবাদ করিনি, আর প্রতিবাদ করলেও কোনো ফল হতো না। সংস্কার মিশে গেছে ওদের রক্তে।

আমাদের গ্যাংটকের খবর, কাগজে বেরিয়ে যাবার পর বাড়ি ফিরেই আমি অতি শীতল অভ্যর্থনা পেলাম। দেখলাম, কাজের মেয়ে চারুশীলার ওপর পড়েছে আমাকে অন্নদানের ভার। আমি যেন রবাহূত একটা লোক। হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে পড়ে ওদের করুণার দান ভোগ করে যাই।

আমার বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার মায়ের নামে উইল করে দিয়েছেন। দান বিক্রির ক্ষমতা মায়ের হাতে। চিরদিনই মা ভীষণ মেজাজী। তার অপছন্দের জিনিসকে চোখের আড়ালে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

সুমনা, উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছু না পেলেও মায়ের জেদটা আমার ভেতর পুরোপুরি এসে গেছে।

কয়েকদিন আগে মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ। মা বেশ কঠিন গলায় বলল, বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তৈরী থাক।

এই প্রথম আমি মায়ের মুখের ওপর কথা বললাম, বিয়েটা যখন আমাকেই করতে হবে তখন আমার ওপর ওটা ছেড়ে দাও।

মায়ের সমস্ত শরীরটা কঠিন হয়ে গেল। স্থির গম্ভীর গলায় মা বলল, এখন থেকে নিজের রাস্তা নিজে দেখে নাও।

আমি আর এক মুহূর্তও এ বাড়িতে থাকা সম্মানের বলে মনে করছি না। পথে প্রান্তরে নাচ দেখিয়ে পয়সা কুড়িয়ে খাব, শুয়ে থাকব গাছতলায় তবু আমার পিতৃগৃহে আর কোনোদিনই ফিরে আসবো না।

সুমনা, এই মহাপৃথিবীতে হারিয়ে যাবার আগে তোমার কাছে এই চিঠি লিখে সবকিছু জানালাম। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে প্রতিপালনের ক্ষমতা আমার নেই। তোমাকে এই মুহূর্তে আবেগের বশে এক বিড়ম্বিত জীবন থেকে অন্য এক আচ্ছাদনহীন প্রান্তরে টেনে আনতে চাই না। তুমি ক্ষতবিক্ষত তোমার দাদার বাড়িতে, তবু মাথার ওপর রয়েছে ছাদ। সেখান থেকে তোমাকে সরিয়ে এনে দিনের পর দিন শিল্পচর্চা চালিয়ে যাব, সে সংগতি বা মানসিক শক্তি আমার নেই। তাই একাই চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম সমস্ত মায়া কাটিয়ে।

তুমি এখনও অনাঘ্রাতা কুমারী। তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক এমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যাতে তুমি নিজেকে অস্পৃশ্য অশুচি ভাবতে পার। পথে থাকলেও পথের দেবতার কাছে নিত্য তোমার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যাব, তিনি যেন তোমাকে দুঃখজয়ের মন্ত্র শিখিয়ে দেন।

ক্ষণিকের অতিথি।

চিঠিখানা শেষ করে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। এমন চমৎকার একটি মেয়ে, তাকে নিদারুণ দুর্ভাগ্য তাড়া করে ফিরছে।

সঙ্গীতা ফিরে এল।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি?

স্টেশান অব্দি যেতে হলো না। খালি একটা মিনিবাসে তুলে দিলাম। পড়েছ?

বিপর্যয়কর।

একি করল বিনায়ক! সুমনার কথাটা একবারও ভেবে দেখল না। একটা পেয়ালার মতো বুকখানা ওর ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল।

সঙ্গীতা বসে পড়ল মেঝেতে। তার মুখখানা দেখে মনে হলো সে ভেতরে ভেতরে বড় কষ্টে কান্নাকে চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

একসময় বলে উঠল, তুমি চিঠির শেষ দিকটা পড়েছ ভাল করে?

সবটাই পড়েছি।

ঐ যেখানে বিনায়ক লিখেছে, তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক এমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি যাতে তুমি নিজেকে অস্পৃশ্য, অশুচি ভাবতে পার।

পড়েছি।

সুমনা বার বার ঐ লাইনটা আমার কাছে উচ্চারণ করছিল। ও বলছিল, বৌদি দেহটাই কি সব? ওটাই কি সবচেয়ে মূল্যবান? মনের কি কোনো দাম নেই! তার কাতরতা, ক্ষয়ক্ষতি কি দেহের আঘাতের চেয়ে কম? শরীর ছোঁয়নি ও, কিন্তু আমার সারা মনটাকে যে বার বার ছুঁয়ে গেছে, এ কথা একবারও বিনায়ক ভাবল না কেন?

মেয়েটা আমার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদছিল আর বলছিল, একি হলো বৌদি, জীবনে আমি তো কোনোদিন কাউকে আঘাত করিনি। আমার ভালোবাসায় তো কোনো খাদ ছিল না, তবে আমি কেন হেরে গেলাম আর আমার সর্বস্ব হারালাম?

বললাম, তুমি ওকে কি সান্ত্বনা দিলে?

সংগীতা বলল, এ অবস্থায় কি কোনো সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব, না সান্ত্বনায় মানুষ শান্ত হতে পারে?

বললাম, মনের এই অস্থির অবস্থায় সুমনার এখন দাদার বাড়ির তাল সামলানো কঠিন হয়ে উঠবে।

সংগীতা সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, সে তাল তিন দিন আগেই কেটে গেছে।

কি রকম?

সুমনার বৌদি ওকে চেপে ধরেছিল, কোথায় বেরুচ্ছ?

নাচের ইস্কুলে।

মিথ্যে বলে আর পাপ বাড়িও না, ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে সন্ধ্যেয় কোথাও বেড়িয়ে বেড়ানোর তাল খুঁজছ। তোমার বেরুনো চলবে না।

ও সেদিন বেরোয়নি। পরের দিন অপালার সঙ্গে ঘুরে ওয়ার্কিং লেডিজ হস্টেলে একটা সীট যোগাড় করে উঠে গেছে।

আচ্ছা। ওর ব্যাপারে অপালার রি-অ্যাকশান কি?

অপালা সারাদিন ওকে নিয়ে সীটের জন্যে ঘুরেছে, যোগাড়ও করে দিয়েছে, কিন্তু ওর সঙ্গে প্রায় একটিও কথা বলেনি।

সেকি! কেন?

অভিমান। ওর কাছে ওরা দুজনে ঘর বাঁধার জন্য কোনো সাহায্য বা পরামর্শ নেয়নি বলে। সুমনা বলে, আচ্ছা বৌদি, বিনায়কের সঙ্গে যার পরিচয়টুকুও হয়নি তার কাছ থেকে বিনায়ক সাহায্য নেবেই বা কি করে? আর তাছাড়া তুমি তো আমাকে জান, পথে পড়ে থাকলেও হাত বাড়িয়ে আমি কারু সাহায্য নেব না।

বললাম, এখন তাহলে মেয়েটা চালাবে কি করে?

নাচের টিউশানির বাড়ি থেকে কিছু অ্যাডভান্স নিয়েছে। আশ্চর্য দক্ষতা অপালার, এরই ভেতর দুটো টিউশানিও যোগাড় করে দিয়েছে সুমনাকে।

বললাম, এই ভাল, মেয়েটা এখন নিজের চেষ্টায় দাঁড়াক।

সুমনার বিষাদপর্বের মাস চারেক পরে অপালা এল আমার বাসায়। হাতে বিয়ের নেমন্তন্ন কার্ড।

সঙ্গীতা বলল, কার্ড নেব না, তুমি তো সম্পর্ক প্রায় ত্যাগই করেছ।

অপালা সঙ্গীতার হাতখানা চেপে ধরে কতক্ষণ শুধু দাঁড়িয়ে রইল, কোনো কথা বলতে পারল না।

যে মেয়েটি কথা না বলে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারে না, যে তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়ে সবার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, সে হঠাৎ নীরব হয়ে যাওয়ায় আমিও ধন্দে পড়ে গেলাম।

অপালা যখন মুখ খুলল তখন তার চোখে সজল মেঘের ছায়া।

এ কি বিয়ে না আনন্দের দিন বৌদি, এ এক রকমের নিয়ম রক্ষা।

সঙ্গীতা বলল, একথা কেন বলছ ভাই, যে পরিস্থিতিতে আমাদের বিয়ে হোক না কেন, এটি আমাদের জীবনের সব সেরা মুহূর্ত।

তুমি হয়ত ঠিক বলছ বৌদি, কিন্তু আমার মনটা একেবারে ভেঙে গেছে। তুমিই বল, বিয়ের পিঁড়িতে বসে সুমনার মুখখানা কি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠবে না? গলায় মালা পরাতে গিয়ে কি আমি চিরদিনের সেই রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারব?

সঙ্গীতা এর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

একটু চুপ করে থাকার পর অপালা বলল, তোমাকে তো বলেছি, বাবা কথা বলেন খুব কম। মাসখানেক আগে হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, মায়ের শেষ ইচ্ছের কথাটা তোমার হয়ত মনে আছে।

আমি মাথা কাৎ করে জানালাম, আছে।

বাবা বললেন, আমার যা কিছু আছে দেখে বুঝে নাও। আমি স্থির করেছি, দুতিন মাসের ভেতরেই একটা ওল্ড হোমে চলে যাব। কথা অনেকখানি এগিয়েছে। তোমার বিয়ে নিয়ে তোমার মায়ের যে শেষ ইচ্ছেটুকু ছিল, তা অন্তত আমি দেখে যেতে পারলে তৃপ্ত পেতাম। অবশ্য তোমার ব্যাপার তুমিই স্থির করবে।

বাবার পরিকল্পনার ওপরে কোনোদিনই কোনো কথা বলার অধিকার আমাদের ছিল না। তিনি আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাজে আমরা কেউ কোনোদিন বাধা হয়ে দাঁড়াব না। তবে স্বাধীনতার মর্যাদা তোমাকেই রাখতে হবে।

অবাক ব্যাপার বৌদি, বাবার সঙ্গে এই আলোচনার পাঁচ দিনের মাথায় পাত্র নিজেই এগিয়ে এল।

পাশাপাশি ঘর। ওদের দুজনের কথা আমার কানে এসে বাজছিল। জানালার একটা ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ওদের দুজনকে।

সংগীতা সবিস্ময়ে বলল, পাত্র এগিয়ে এলো! তার মানে, সে কি তোমার চেনা?

ঠিক ধরেছ। আমি যখন আর্ট কলেজে ঢুকলাম, সুবীরদা তখন ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। ও সমস্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল।

সংগীতা বলল, আঁকিয়ে হিসেবে নিশ্চয়ই খুব নামডাক ছিল?

ও যেমন অসাধারণ আঁকিয়ে ছিল, তেমনি ছিল ওর দারুণ অভিনয়ের প্রতিভা। কলেজ সোস্যালে সিরাজউদ্দৌলা নাটক হলো। সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করে মাতিয়ে দিলে সবাইকে।

সংগীতা বলল, তরুণ নবাবের বেশে ওকে নিশ্চয় মানিয়েছিলও সুন্দর।

ওকে সে সময় কলেজের মেয়েরা অ্যাপোলো বলে ডাকত। ওর সঙ্গে স্কেচ করতে এখানে ওখানে যেত অনেকে।

এবার তোমার কথা বল। সুবীর কি করে তোমার কাছে এল?

সেদিন গলি থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়েছি, সুবীরদার গলা পেলাম। ও রাস্তার ওপার থেকে চেঁচাচ্ছিল। আমি ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। ও রাস্তা পেরিয়ে আমার কাছে চলে এল। বলল, স্বদেশ পত্রিকায় তোমার আঁকা নার্সিসাসের ছবি দেখলাম। এক কথায় অপূর্ব। তুমি কি নার্সিসাসের মতো নিজের ভালোবাসায় নিজে মুগ্ধ হয়ে থাকবে নাকি চিরদিন? সিঁথিতে দেখছি সিঁদুর ওঠেনি এখনও।

হেসে বললাম, বিয়ের বরাত সকলের ভাল হয় না সুবীরদা।

ও অমনি বলল, পাত্রী গ্র্যাজুয়েট, আর্ট কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা, বিত্তবান পিতার একমাত্র সুশীলা সুশ্রী কন্যা, তার কপালে পাত্র জোটেনি, একথা কে বিশ্বাস করবে?

বললাম, আমার বাবা এমন কিছু বিত্তবান নয়।

সুবীরদা বলল, রাখ রাখ, আর বিনয় করতে হবে না।

আমি অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললাম, তোমার বিয়েতে আমি কিন্তু বাদ পড়ে গেছি সুবীরদা।

ও বলল, তুমি শুধু নও সকলেই বাদ পড়ে গেছে।

বললাম, কি রকম?

বিয়ে করিনি তাই কাউকে ডাকার প্রশ্নই ওঠেনি।

বললাম, কাছেই বাড়ি, আপত্তি না থাকলে চল।

সুবীরদা বলল, বাড়ি থেকে যখন কাজে বেরিয়ে এসেছ তখন আজ আর যাব না। এখন বল, কোন রাজকার্যে চলেছ?

বললাম, গুরুতর কোনো কাজই নয়, স্রেফ একটা টিউশনি।

আবার ও বলল, তোমার মতো পয়সাওলা বাড়ির মেয়েরা যদি সব টিউশনি নিয়ে নেয় তাহলে আমাদের মতো হাঘরে হতভাগাদের কপালে কি জুটবে?

আমি বললাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না সুবীরদা।

ও বলল, একটা রেস্টুরেণ্টে বসতে আপত্তি আছে? অল টাইম টি টাইম।

রেস্টুরেণ্ট থেকে যখন বেরুলাম তখন আমাদের নীড় রচনার কথাবার্তা ফাইন্যাল হয়ে গেছে।

অপালা এবার আমার ঘরে ঢুকে বলল, স্যার নিয়ম রক্ষার জন্য যাবেন না যেন। আগেভাগে গিয়ে অনেকক্ষণ থাকতে হবে।

বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলো নির্বিঘ্নে। এরপর নিয়মমতো অপালা গেল তার শ্বশুরবাড়িতে। টালিগঞ্জের দিকে বহুকালের ভাড়া নেওয়া স্যাঁতসেঁতে এক বাড়ি, তাও নিচের তলার তিনখানামাত্র ঘর। তারই ভেতর সুবীরের দু'দাদা, বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করে। দাদারা বংশের ধারা অনুযায়ী সুদর্শন। লেখাপড়া কারুরই এগোয়নি বেশীদূর। তাই দুজনের একজন 'সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী', অন্যজন ছোট্ট একটা স্টেশনারী দোকান চালায় গলির মুখে অ্যাসবেস্টারের চালার তলায়। সর্বত্রই অভাবী সংসারের ছাপ।

সবার বড় আর এক দাদা কৃতি, ডাক্তার। বউ, ছেলেমেয়ে আর মাকে নিয়ে আলাদা থাকে। বাবা বছর পাঁচেক আগেই গত হয়েছেন।

নিয়ম রক্ষার জন্যেই যেন নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে এসেছে, এমনি একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সুবীরের সংসারে। কিন্তু ঐ অনভ্যস্ত নিম্ন মানের পরিবেশে অপালাকে দিব্যি মানিয়ে নিয়ে থাকতে দেখে সবাই বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেল। বাউণ্ডুলে দেবরটি ছবি আঁকার নামে প্রায়ই বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চলে যেত কলকাতার বাইরে, তখন দুই বৌদি তাদের ছেলেমেয়েদের ঢুকিয়ে দিত সুবীরের ঘরে। অন্তত কটা দিনের জন্য একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা। কিন্তু অপালা ঘরখানা অধিকার করায় সে সুযোগ আর রইল না। মায়েদের মুখভার হলেও ছেলেমেয়েরা কিন্তু ভারী খুশী হয়ে উঠল নতুন মানুষটিকে পেয়ে। সময় পেলে অপালা ওদের নিয়ে বসে যেত ছবি আঁকা শেখাতে। মাঝে মাঝে ধোপদুরস্ত পোশাকে সাজিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেত এখানে ওখানে।

কয়েকদিন বলার পরে একদিন নিতান্ত অনিচ্ছায় অপালাকে নিয়ে দাদার ফ্ল্যাটে গেল সুবীর। বিয়ের সময় সেই যা একবার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা, তারপর মাস দুয়েক পার হয়ে গেছে, কোনো পক্ষেরই সাড়াশব্দ নেই। বিবেকে লেগেছিল অপালার। তাই এগিয়ে গিয়ে শাশুড়ী আর ভাসুরের পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে আসতে চেয়েছিল সে।

সুবীর প্রথমে ওর ইচ্ছাকে এড়িয়ে গিয়েছিল, কারণও কিছু দেখায়নি। শেষে রাজী হতে হয়েছিল অপালার জেদের ফলে।

অপালা সমারোহের সঙ্গে বড় জায়ের সংসারে অভ্যর্থনা না পেলেও সুভদ্র ব্যবহার পেল। ওর বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ কিছুক্ষণের ভেতরেই বুঝে নিল, এ বাড়িতে শাশুড়ীর অধিকারের সীমা কতখানি। বড় জা-ই সূর্যের মতো কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে কিরণদান করছেন সবাইকে। এমন কি স্বয়ং

স্বামীরত্নটিও তাঁর দাক্ষিণ্যের বাইরে নয়। ব্যক্তিত্ব ঝলসে উঠছে তাঁর প্রতিটি পদপাতে, প্রত্যেকটি বাক্যপ্রয়োগে। তবু নতুন বউ বলেই হোক, অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে বলেই হোক অপালা জায়ের কাছ থেকে কিছুটা সমাদর পেল।

বৈকালিক চা-পর্বে গৃহস্বামী এলেন ডাইনিং টেবিলে। অপালা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

দাদার চেম্বারের বাইরে এতক্ষণ বসেছিল সুবীর। সে দাদার পিছু পিছু এসে টেবিলে বসল।

চা এলে অপালা চেয়ার ছেড়ে উঠল সার্ভ করতে। বড় জা বলে উঠলেন, বস বস, তোমাকে হাত লাগাতে হবে না, বামাই চা দেবে।

বামা নামের কাজের মেয়েটি অল্প সময়ের ভেতরে এসে ঢুকল খাবারঘরে। হাতে বিরাট এক ট্রে। তাতে চারটি প্লেটে সাজানো খাবার, দুটিতে দু'এক পদ বেশী। মনে হলো, ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে ফ্রাইং প্যানে সদ্য ভেজে আনা হয়েছে কয়েকখানা মাংসের কাটলেট।

ছেলেমেয়েরা অনুপস্থিত। তাদের ছুটির সময় হয়ে গেলেও স্কুল বাসে ফিরতে সময় লাগবে।

ওরা খাওয়া শুরু করেছিল। হঠাৎ অপালার ভাসুর তাঁর ভাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আর কতদিন টো টো করে বেড়াবি? কিছু একটা কাজকর্ম কর। একটি মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে এলি, তার খাওয়া পরার ব্যবস্থা তো করতে হবে?

কাটলেটটা টানতে যাচ্ছিল অপালা, হাত থেমে গেল। সুবীর নিরুত্তরে খেয়ে যাচ্ছে।

বড়জা তেড়ে উঠলেন, ঠাকুরপো কি কোনোদিন তার খাওয়া পরার অসুবিধের কথা তোমাকে জানিয়েছে?

না, তা হয়তো মুখ ফুটে জানায়নি, তবে···।

এবারও ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, তবে চুপ।

ডাক্তার দাদাটি কিছু সময়ের জন্য নীরব হয়ে গেলেন।

খাওয়া শেষ হলে উঠে গেলেন অপালার বড়জা। বামা ঝিকে বলতে গেলেন প্লেটগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এরপর পট থেকে চা পরিবেশন হবে।

ফাঁক পেয়ে আবার কথা শুরু করলেন ডাক্তার, কয়েকদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করিস একবার। চোখের ডাক্তার এস. কে. বাসুর নাম তো শুনেছিস। ওর একটি চৌকস ছেলের দরকার। পেশেণ্টদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ডায়েরীতে লিখে রাখবে। আই এগজামিনেশানের সময় ওদের অ্যাটেণ্ড করবে। এক একজন করে পেশেণ্টকে ডাক্তারের কাছে পাঠাবে আর কি। সব শেষে খাতাপত্রে ডেইলিকার হিসেবপত্র তুলে দিয়ে ছুটি। আপাতত শ' পাঁচেক। কিছু বাড়তে পারে পরে। একেবারে ঢু-ঢুর চেয়ে এ অনেক ভাল।

আজকাল মাথা খুঁড়লেও পাঁচ টাকার একটা চাকরি পাবি না।

বড়জা ঢুকেই স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, সুশান্ত আর তার বউয়ের কাণ্ডটা দেখলে তো। কাল সকালে আসার কথা আজ এখনও এসে পৌঁছল না। রাতে আর আসছে।

ডাক্তার বললেন, কার ভাই দেখতে হবে তো।

বোকার মতো কথা বল না। পাওয়ার প্ল্যানটের কাজ, কখন কিসে আটকে পড়ে কে বলতে পারে। আমি কেবল ভাবছি, পরশু থেকে ফ্রিজভরা রান্না রেঁধে রেখেছি, এখন সেগুলো নিয়ে কি করি।

এবার পট থেকে নিজেই কাপে কাপে চা ঢালতে লাগলেন। হঠাৎ যেন কি একটা ভাল কথা মনে পড়ে গেল। হাতে ধরা রইল পট।

অপালার বড়জা বলে উঠলেন, আজ কিন্তু তোমাদের ওখানে রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে হবে না, এখান থেকেই সব খেয়ে যাবে। এক গাদা রান্না পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে অপালা বলে উঠল, আজকে তো খাওয়া হবে না দিদি, আগে থেকেই বাবা রাতে আমাদের খাবার জন্য বলে রেখেছেন। আসলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগে একজন অ্যাসিস্টেণ্ট ট্যুরিস্ট অফিসারের দরকার। মিনিস্টার বাবার পরিচিত। তাঁকে ডিনারে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন, যদি আখেরে কিছু লাভ হয়।

মুখখানা এতটুকু হয়ে গেল বড় জায়ের। টেনসানের মুখে চা ঢালতে গিয়ে চলকে পড়ল কাপের বাইরে।

কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে হাঁ করে চেয়ে থেকে অসভ্যের মতো শব্দ করে চা গিলতে লাগলেন ডাক্তার সাহেব।

পথে নেমেই ক্ষেপে উঠল সুবীর, কতদিন পরে বৌদি এমন আদর করে খেতে বলল আর তুমি আকাট মিছে কথাটি বলে তাকে এড়িয়ে গেলে।

অপালা ঠাণ্ডা মাথায় বলল, নিজের ভাই আর ভাজের জন্যে রান্না করা একরাশ খাবার আস্তাকুড়ে ফেলতে হবে ভেবে তোমার বৌদিটি জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাদের মতো ডাস্টবিন সামনে দেখে, তাতেই সবকিছু ফেলে দিয়ে খালাস হতে চাইলেন। করুণা দেখানোর এত বড় একটা সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায়। আচ্ছা ঐ উচ্ছিষ্টগুলো কি করে তোমার গলা দিয়ে নামত, বলতে পার?

সুবীর বলল, মিথ্যে চাকরির ব্যাপারটা টেনে আনলে কেন?

অনেক সময় সত্যের চেয়েও মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে মানুষ তার মর্যাদা রাখতে পারে সুবীর। তোমার দাদা একজন শিল্পীর মর্যাদা কতখানি তা বোঝেন না। তাই তাঁর চোখের সামনে তোমার সত্যিকারের মূল্যটা তুলে ধরতে একটুখানি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভিক্ষে করে খাব তবু আত্মীয়ের কৃপাদৃষ্টির ভোগ কোনোদিনও খাব না। পা চালিয়ে বাড়ি চল, রাতের রান্না করতে হবে।

সঙ্গীতার কাছে তার এইসব অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে চোখের জল

ফেলেছিল অপালা। আমি ওর চোখের জল ফেলার কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ অপালা অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। সে এতখানি আবেগপ্রবণ হলো কি করে!

সংগীতা আমার ভাবনার ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঐ আত্মীয়দের কাছে অপমানিত হয়েছে বলেই যে ও চোখের জল ফেলেছে তা কিন্তু নয়।

তবে?

সুবীরের চরিত্রের ক্ষুদ্রতাই ওকে কাঁদিয়েছে।

আমি জানতে চাইলাম, এখন ওরা কেমন আছে?

সংগীতা বলল, সুবীর চাকরি করছে।

খুব ভাল খবর, কিন্তু চাকরিটা কি ঐ ট্যুরিস্ট অফিসারের?

সংগীতা কপালে হাত চাপড়ে বলল, সত্যি, তুমি যে কোন্ জগতে বাস করছ তা ভেবে পাই না। ওটা তো অপালার একটা আড়ালমাত্র। মর্যাদা রক্ষার আড়াল।

তবে অন্য কোন্ চাকরি?

সুবীরের দাদার দেওয়া সেই আই-স্পেশালিস্টের চেম্বারের চাকরিটা।

চম্‌কে উঠে বললাম, বেশ রসিকতা শুরু করলে তো!

সত্যি বলছি।

সে কি! অপালা শেষ পর্যন্ত রাজি হলো?

সে নিজেই গিয়ে মাথা মুড়িয়ে সুবীরের দাদার হাতে পায়ে ধরে স্বামী-রত্নের জন্য ঐ চাকরির ব্যবস্থা করেছে।

বললাম, সংগীতা, আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো?

একেবারে জলজ্যান্ত আমার পাশে বসে তুমি অপালার পরিণতির কথা শুনছ।

এটা কি করে সম্ভব হলো সংগীতা?

স্বামীকে অনেকখানি নীচে নামার হাত থেকে রক্ষা করল এইভাবে।

হেঁয়ালি রেখে কি হয়েছে বল, আমি অপালার চরিত্রের সঙ্গে এসব মেলাতে পারছি না।

সংগীতা বলল, সুবীর খুবই প্রতিভাবান কিন্তু আত্মসংযম আর আত্ম-সম্মানবোধের অভাব আছে তার।

কি করে বোঝা গেল?

বিয়ের আগে ও একদল সঙ্গী নিয়ে দীঘা, দার্জিলিং ঘুরে বেড়িয়েছে। ঐ দলে মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

বললাম, সেটা ছবি আঁকার প্রয়োজনে সব সময়ই হতে পারে।

যত সহজভাবে তুমি ব্যাপারটার সমাধান করতে চাইছ, তা কিন্তু আদপেই নয়। ওর চেহারার জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে অনেক মেয়েই কাছে এসেছে। কথাটা এভাবেও বলা যায়, ও তাদের কাছে টেনেছে নানা ছুতোয়। তাদের টাকায় ও ফুর্তি করেছে, ঘুরে বেড়িয়েছে এখানে ওখানে। ইদানিং একটা নামকরা যাত্রা

পার্টিতে নায়কের ভূমিকা নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে গাঁগঞ্জ।

বললাম, সেটাতে দোষের কি আছে?

যাত্রা করা দোষের নয়, কিন্তু যাত্রার নায়িকাকে নিয়ে সরে পড়ার তাল, এবং তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যাত্রা থেকে নায়কের বিতাড়ন, এসব কি খুব মর্যাদার ব্যাপার?

অপালা এত সব খবর জানল কি করে?

ওর সেজজা ওকে খুবই ভালোবাসে, সে কথা প্রসঙ্গে ওসব বলে দিয়েছে। তাছাড়া ঐ জা-ই এক বাণ্ডিল চিঠি দেখিয়েছে ওকে। সব কটাই সুবীরের প্রেমিকাদের লেখা।

বললাম, ঐ চিঠির বাণ্ডিলটি উনি যোগাড় করলেন কি করে?

ওঁকে যোগাড় করতে হয়নি, ওঁর নামেই সুবীরের বিভিন্ন প্রেমিকার চিঠি আসত। দেবরের এই প্রেমের খেলাগুলি উনি বেশ হালকা ভাবেই নিতেন এবং এনজয়ও করতেন।

হঠাৎ তাহলে ভদ্রমহিলা সুবীরের ওপর বিরূপ হলেন কেন?

যখন তিনি দেখলেন বিয়ের পরেও চিঠি চালাচালি হচ্ছে, তখন কঠিন ভাষায় সুবীরকে সাবধান করে দিলেন। তাতেও যখন কাজ হলো না, তখন অপালার কাছে সবকিছু না জানিয়ে তাঁর উপায় রইল না। তুমি শুনলে হয়তো অবাক হবে, সুবীরের প্রেমপত্রগুলো হাতে পেয়েও অপালা কিন্তু একটি ছত্রেও চোখ বুলোয়নি। সে তার জাকে বলেছে, যার চিঠি তাকেই ফিরিয়ে দিন দিদি, ওসব আগুন দিয়ে নাড়াচাড়া করলে নিজেকেই জ্বলতে হবে।

বললাম, অপালার স্থির বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেছে। তুমি জানতে চাইছিলে না, অপালার মতো মেয়ে কি করে সুবীরের চাকরির জন্য তার ভাসুরের কাছে উমেদার হলো?

আমি বললাম, সত্যিই এটা আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে।

সঙ্গীতা বলল, কিছুদিন থেকে সুবীর, অপালার বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছিল। তখনও প্রেমপত্রের ব্যাপারটি জানতে পারেনি অপালা। সে সরল বিশ্বাসে সব কিছুই বলেছিল জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির কাছে। এরপর হঠাৎ অপালা লক্ষ্য করল তার বাবার ওল্ড হোমে যাওয়া সম্বন্ধে ভারী উৎসাহী হয়ে উঠেছে সুবীর। একদিন সে পাশের ঘর থেকে শুনতে পেল, সুবীর তার বাবাকে বলছে, 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ,' এইসব বাক্য যেসব ঋষিরা উচ্চারণ করেছিলেন তাঁরা যথার্থই সত্যদ্রষ্টা। সংসারের ভার যথাসময়ে পুত্র, পুত্রবধূর হাতে তুলে দিয়ে বনের শান্ত নির্জন পরিবেশে চলে যাওয়া, এটাই তো পরম সুখ। এতে সংসারের শান্তি, নিজেরও শান্তি। অনেকদিন তো কোলাহলে কাটানো হলো, ভোগের জীবনও উপভোগ করা হলো কতদিন, এখন সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আত্মচিন্তায় ডুবে যাওয়া।

এ উপলব্ধি একমাত্র ভারতীয় ধারণাতেই সম্ভব।

অপালা কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। এত সুন্দর করে সাজিয়ে এমন গভীর কথা বলতে পারে সুবীর!

অপালার এ বিস্ময় কিন্তু স্থায়ী হলো না, ভেঙে গেল ঠিক দুদিন পরেই। প্রেমপত্রের খবর জানার পরে তার মনে হলো, এসব কথা থিয়েটারের সাজানো ডায়লগ। পাকা একজন অভিনেতার ভূমিকা নিয়েছে সুবীর। তার বাবা ওল্ড হোমে চলে গেলে সুবীরই ধরবে সংসারের হাল। অপদার্থ, মুখোশধারী মানুষটার গোপন ইচ্ছার দরজা বন্ধ করে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল সে। ঐ আই-স্পেশালিস্টের বেয়ারা কাম ক্লার্কের চাকরিরই যোগ্য ঐ মানুষটা।

পরের দিনই অপালা সুবীরের অজান্তে ভাসুরমশায়ের কাছে গিয়ে তদ্বির তদারক করে ওর চাকরিটা পাকা করে এলো। তিন দিনের মাথায় ডাক আসতেই ওকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল চাকরি করতে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করতে না শিখলে পরভোজীর শিক্ষা হবে না।

বললাম, এত ঘটনা ঘটে গেছে!

সংগীতা বলল, আমার কাছে দুঃখের কথা বলতে বলতে মেয়েটার বুকখানা ভেঙে যেন চুরমার হয়ে গেল। কখনো ওর চোখে আগুন দেখলাম, কখনো জল। ও আমাকে ওর অদ্ভুত সব অনুভূতির কথা বলেছে।

আমি গালে হাত ঠেকিয়ে অপালার সদ্যবিবাহিত জীবনের কাহিনী শুনে যেতে লাগলাম।

সংগীতা বলে চলল, রাতে অপালার কাছে যে মানুষটা শুয়ে থাকে সে যেন অপালার সম্পূর্ণ অচেনা। একটা অপরিচিত মানুষকে দেহ নিয়ে খেলা করতে দেবার কথা সে ভাবতেই পারে না। এক রাতে সুবীরের একখানা হাত যখন এগিয়ে আসছিল তার দিকে তখন তার মনে হয়েছিল ফণা মেলে একটা বিষাক্ত সাপ এগিয়ে আসছে তার দিকে। মুহূর্তে ছোবল মারবে ভেবে সে চিৎকার করে বিছানা থেকে ছিটকে নেমে গিয়েছিল। সেদিন ঐ চিৎকারের জন্য মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল জায়েদের কাছে।

সুবীর ঘুমিয়ে থাকলে ও তাকিয়ে দেখে। একেবারে অন্যমানুষ। বড় আকারের একটি শিশুর মুখ, তখনই মায়া হয়। কে যেন ওর সব দোষ ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অপালার বুকের ওপর থেকেও সরিয়ে নেয় ভারী পাথরখানা। ও তখন আদরে সোহাগে ভরে দেয় তার স্বামীকে।

এক রাতে অপালার একখানা হাত কতক্ষণ বুকের ওপর চেপে ধরে রইল সুবীর। একটা অদ্ভুত অনুভূতি ফল্গুর অন্তঃসলিলা ধারার মতো বয়ে যেতে লাগল অপালার শরীরের ভেতর দিয়ে। ওর মনে হলো, ভেতরে জমে থাকা কঠিন ক্ষোভ আর দুঃখগুলো গলে ঝরে মিশে যাচ্ছে ঐ ধারার সঙ্গে। স্বামীর সোহাগে স্নান করে শুদ্ধ আর ভারমুক্ত হয়ে সে যেন নতুন এক জীবন লাভ করল সে রাতে। ইদানিং প্রায়ই নিরুত্তাপ স্বামীকে জাগিয়ে তোলার ভূমিকা নিতে হতো অপালাকে। মাঝে মাঝে গ্লানি, লজ্জা আর ঘৃণায় কুঁকড়ে যেত

তার সারাটা শরীর। একটা পরাজয়ের অনুভূতি হাঁ-করা অজগরের মতো তিলে তিলে গ্রাস করত তাকে। তাই এ রাতে সুবীরের দিক থেকে উত্তাপ আর আমন্ত্রণ পেয়ে সে গভীর একটা তৃপ্তি বোধ করল।

পরের দিনই কিন্তু মুখোশটা খুলে পড়ল সুবীরের। সকালে চা খেতে খেতে সে নরম গলায় অপালার কাছে আর্জি জানাল, কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে?

কত টাকা?

এই হাজার চারেক।

এতো টাকা! কি করবে এতো টাকা নিয়ে?

আরও অনেক লাগত কিন্তু ডাক্তার বোসের সঙ্গে যাচ্ছি বলে খরচটা অনেক কম পড়বে।

আমাকে খুলে বল ব্যাপারটা?

সুবীর বলল, এবার সিমলায় চোখের ডাক্তারদের কনফারেন্স হচ্ছে। ওখানে ডাক্তার বোসের সঙ্গে আমিও যাব ভেবেছি। সিঙ্গল ফেয়ার ডাবল জার্নি ছাড়াও অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে। ওখান থেকে একটা ট্যুরেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্নরে যাবার প্ল্যান করছেন ডাক্তাররা। আমারও এই সুযোগে দেখা হয়ে যাবে। কিছু স্টাডিও করতে পারব।

অপালা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ইস, তুমি একা সিমলা আর কিন্নরে যাবে, কেন বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল না।

সুবীর নাকি বলে উঠল, তেমনটা হলে তো আমার চেয়ে বেশী খুশী আর কেউ হতো না, কিন্তু সেটি হবার যে কোনো উপায় নেই। আমাকে ডেলিগেট হিসেবে ঢোকাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছেন ডাক্তার বোসের মতো জাঁদরেল লোক, তার ওপর তুমি। একেবারে অসম্ভব।

একটু থেমে বেশ দুঃখ দুঃখ গলায় বলতে লাগল সুবীর, তাহলে থাক বরং, আমি ক্যানসেল করে দিই আমার যাওয়ার ব্যাপারটা। সত্যি, তোমার যাওয়া হবে না, আর আমি আনন্দ উপভোগ করব, সেটাতে পুরো আনন্দ আমি কিছুতেই পাব না।

অমনি অপালার চোখে জল এসে গেল, এত ভালবাসে তাকে সুবীর! সে সুবীরকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি নিশ্চয়ই যাবে। তোমার চোখ দিয়েই আমি দেখব সবকিছু। তুমি কিন্নরের অনেক স্কেচ আনবে কিন্তু। শুনেছি, কিন্নর কিন্নরীরা দারুণ দেখতে। ওদের যতদূর সম্ভব স্কেচে ধরে রাখার চেষ্টা করবে, কিন্তু বাপু এই কালো কুচ্ছিত বউটাকে ফেলে ওদের প্রেমে আবার মজে যেও না যেন।

একটা হাসির লহর তুলল স্বামীস্ত্রীতে।

অপালা উদার গলায় বলল, এতদূর যাবে, তোমার এই চার হাজার টাকায় কুলোবে?

সুবীর নাকি জোর দিয়ে বলল, ওতেই কুলিয়ে নিতে হবে। আমি তো

আর ডাক্তার বোস নই যে ফাইভ স্টার হোটেলে থাকব।

অপালা জোর দিয়ে বলল, বিদেশ বিভুঁয়ে হঠাৎ যদি টাকার দরকার পড়ে তাহলে পাবে কোথায়? তুমি আরও এক হাজার টাকা বেশী নিয়ে যাবে। সবটা খরচ না হয়, ফেরত আনবে।

কাজ বেরিয়ে গেল সুবীর খাওয়া দাওয়া সেরে। এক ফাঁকে অপালার ঘরে এসে ঢুকলো তার প্রিয় সেজো জাটি। সে দরজার ওপার থেকে ওদের সব কথাই শুনেছিল।

ঢুকেই তার প্রথম কথা হল, গুণধর কর্তাকে একটি পয়সাও দিস্ না যেন।

অপালা সহাস্য মুখে বলল, কেন, কি হল সেজদি।

লজ্জা করে না তোর হাসতে? হাতে একতাড়া চিঠি ধরিয়ে দিলাম, তার একছত্রও পড়ে দেখলি না। অন্তত এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, সাতদিন আগে এসেছে। আমি সুবীরকে বলে দিয়েছি, এবার থেকে আমার নামে যেন তোমার কোনো চিঠি না আসে। এলে সবাইকে বলে দেব।—শুনে নির্লজ্জ শুধু হাসে।

একটু কাঁপা কাঁপা গলায় অপালা বলল, কি লেখা আছে ওতে?

তুই পড়্ না।

আমার ওসব জিনিস ছুঁতে ইচ্ছে করে না সেজদি।

তাহলে চিঠির মর্মটাই শুধু বলছি শোন। ষোল তারিখে সুবীর সিমলা যাচ্ছে তার বান্ধবীকে সঙ্গ দিতে। ডাক্তারদের কনফারেন্স সিমলাতে নয় চণ্ডিগড়ে। ডাক্তার বোস পনের দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন, তাই সুবীরও ছুটি পেয়েছে। এই সুবর্ণ সুযোগটি সে হেলায় হারাতে চায় না। বড়লোকের আদুরে মেয়ে সাহানা। টাকার অভাব নেই, স্বাধীনতারও। দুভাই, এক বোন। লরেটোতে পড়াশোনা করেছে। মেয়েটা ওর জন্যে স্টেশানে হুইলারের স্টলের ধারে অপেক্ষা করবে। তুই গিয়ে ঐ দুটোর মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে আয়।

অপালা স্থির গলায় বলল, আমি নিরাশ্রয় নই দিদি। আমার বাবার একমাত্র মেয়ে বলে বলছি না। মেয়েদের সব থেকে বড় আশ্রয় তার নিজের কাছে। আমার মনই আমার সেই আশ্রয়। সুখদুঃখ, ঝড়-ঝাপটায় সেই আমাকে রক্ষা করবে দিদি।

অপালাকে ঝাঁকানি দিয়ে তার জা বলল, তুই ওকে একবারও কিছু বলবি না? ও যা ইচ্ছে তাই করে যাবে?

আমি তো ওকে আঘাত দিতে অথবা শাসন করতে এ বাড়িতে আসিনি দিদি, আমি ভালবাসা দিতে আর পেতে এসেছিলাম। ঐ পাওয়ার ভাগ্যটা দেখা গেল দুজনের কারুরই নেই।

জা বলল, তোর এত বড় বড় কথা বুঝি না ভাই, আমার তো রাগে সারা শরীরে আগুন জ্বলে যাচ্ছে। হাঁ শোন, বেলেল্লাপনা করবে ওরা, আর তুই তার টাকা যোগাবি, কক্ষনো নয়।

আমি কথা দিয়েছি টাকা দেব বলে, কথা তো ফেরাতে পারব না দিদি। ঐ টাকায় ও নরকে নামবে কি স্বর্গের সিঁড়ি বানাবে, সেটা ওর মর্জি।

সঙ্গীতাকে বললাম, ও কি টাকা দিয়েছিল ?

অনেক টাকা।

আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, অনেক টাকা, কেন ?

সঙ্গীতা বলল, যাতে আর কোনোদিন টাকা না চায়। অনেকগুলো টাকার সঙ্গে এক টুকরো চিঠিও দিয়েছিল। একটা প্যাকেটে ওগুলো ঢুকিয়ে ভাল করে এঁটে দিয়ে বলেছিল, টাকা আছে, এখন খোলার দরকার নেই, একেবারে সিমলা পেঁছে খুলবে। খুচরো এক হাজার দিয়ে দিলাম, ওটা দরকার মতো পথে খরচ করতে পারবে।

দারুণ কৌতূহল তখন আমার। সঙ্গীতাকে জিজ্ঞেস করলাম, চিঠিতে কি লেখা ছিল এবং প্যাকেটে কত টাকাই বা দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছে ?

ও টাকা দিয়েছিল তিরিশ হাজার। চিঠিতে কোনো সম্বোধন না করেই লিখেছিল, এর প্রতিটি টাকা আমার টিউশনি থেকে জমানো। বাবার ব্যাঙ্কের টাকায় হাত দেবার অধিকার এখনও আমি পাইনি। আর তা পেলেও তার থেকে সামান্য একটি কড়ি তোমার ফুর্তির জন্য ব্যয় করতাম না।

আমি আমার বাবার বাড়িতে আজ থেকে থাকব। কোনো অবস্থাতেই তুমি আর আমার খোঁজ করবে না।

অপালা চিঠির নিচে তার নামটা পর্যন্ত সই করেনি।

এসব কথা তুমি তো কই আমাকে আগে বলনি ?

অপালা আমার হাতে ধরে বারণ করে গিয়েছিল, স্যারকে এখন বল না বৌদি। উনি আপসেট হয়ে পড়বেন। দু'চার মাসের পর ব্যাপারটা যখন একেবারে চুকেবুকে যাবে তখন তুমি আমার দুর্ভাগ্যের কথা তাঁকে জানিও।

আমি বললাম, অপালার এই সিদ্ধান্তের কথা আগে জানলেও আমি মোটেই আপসেট হতাম না। তাকে অন্তর থেকে সমর্থন জানিয়ে যেতাম। এখন ও কেমন আছে কিছু জান কি ?

সঙ্গীতা বলল, কিছুদিন আগে সুমনা কলেজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। ওর কাছ থেকে দুটো খবর পেয়েছিলাম।

কি খবর ?

সুবীর বুঝে গেছে, অপালা কঠিন ঠাঁই। তার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

দ্বিতীয় খবর, অপালার বাবা ওল্ড হোমের খরচ ছাড়া বাকি সমস্ত সঞ্চয় মেয়েকে দিয়ে গেছেন। এখন তিনি ওল্ড হোমে বেশ শান্তিতেই আছেন।

কয়েকটা বছর কেটে গেছে প্রায় যোগসূত্রহীন নীরবতার ভেতর। ওদের দুবন্ধুর সঙ্গে কোনো রকমেই আমাদের আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। সাংসারিক ব্যস্ততার ভেতর আমরাও ডুবে গিয়েছিলাম। ছোট্ট একটি নিজস্ব বাসগৃহ

নির্মাণ করতে পেরেছি এতদিনে। তারই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সামান্য আয়োজনে কদিন ধরে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি দুজনে।

হঠাৎ কাজের মাঝখানে ঝটিতি আমার ঘরে ঢুকে পড়ল সঙ্গীতা। নিমন্ত্রিতদের নামের তালিকা তৈরী করছিল সে।

মুখ তুলে প্রশ্নের ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকালাম।

ও গালে সপেন্সিল হাত ঠেকিয়ে বলল, কত বড় ভুল হয়ে গেছে বুঝেছ ?

আমি শুধু হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মগজে ভুলের ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল না।

সঙ্গীতার দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে আছি দেখে ও বলে উঠল, ওদের দুই পাখির কথা একবারও কি তোমার মনে পড়েনি ?

আমি চমকে উঠলাম। বাড়ি করার ব্যাপারে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে নিকট, দূর কোনো আত্মীয় বা পরিচিত সম্বন্ধে কোনো রকম ঔৎসুক্য মনে জাগেনি।

সঙ্গীতাকে বললাম, সত্যি, এ ভুলের মার্জনা নেই।

ও বলল, আমারও তো মনে পড়েনি।

বললাম, তবুও শেষ পর্যন্ত তুমিই বিস্মৃতির পর্দাটা সরাতে পারলে।

সঙ্গীতা বলল, আমাকে অপালাই কিন্তু এই ভুল সংশোধনের সুযোগটুকু করে দিয়েছে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, তোমার সঙ্গে অপালার দেখা হয়েছে বুঝি ? কই বলনি তো।

ও মাথা নাড়ল। তার মানে সঙ্গীতার সঙ্গে অপালার দেখা হয়নি।

সঙ্গীতা ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে একখানা খাতা নিয়ে এল। ওটা ঠিক খাতা নয়, একটা ডায়েরী। ঐ পুরোনো ডায়েরীর পাতায় ও অভ্যাগতদের নামের তালিকা তৈরী করছিল। হঠাৎ সেই ডায়েরী ওল্টাতে গিয়ে ও একটা স্কেচ দেখতে পেল। আকাশের বুকে একতাল কালো মেঘ। দুটো বলাকা ঝড়ের মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে উড়ে চলেছে। একটি মেয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে দেখছে মেঘের সেই রূপ। মেয়েটির আঁচল আর এলো চুল ওড়াচ্ছে ঝড়ের হাওয়া।

স্কেচের নিচে লেখা আছে 'কৃষ্ণকলি'। সেই চিরস্মরণীয় গানের কথা আর সুর সেই মুহূর্তে বেজে উঠল কানে।

'কৃষ্ণকলি আমি তাকেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।'

অমনি আঁকিয়ের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। আহা, এতদিন সুমনা আর অপালার কথা মনে পড়েনি। ভাগ্যিস অপালার ছবিখানা চোখে পড়ল।

আমি বললাম, সঙ্গীতা, আজ বিকেলের দিকে চল সুমনার ডেরায় হানা দিই। ওকে নিয়ে তিনজনে ঐ উড়ো পাখিটাকে ধরতে বেরুব।

সঙ্গীতা আমার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে হেসে উঠল।

তুমি ঠিক নামই দিয়েছ ওর, 'উড়োপাখি'। অপালা সত্যিই একটা উড়োপাখি।

বিকেলে নর্মদাদি চায়ের টেবিলে খেতে দেবার জন্য মাছের চপ ভাজছিল। সঙ্গীতা আরও কয়েকটা বেশী করে ভাজিয়ে নিলে। বেরুবার সময় ওগুলো প্যাকেটে ভরে সঙ্গে নিয়ে চলল।

রোদ্দুরের তেজ একেবারে কমে এসেছিল। গাঢ় সোনালী মধু-রঙের আলো প্লাবিত করে দিচ্ছিল চরাচর। শীতের শেষে প্রথম ফাল্গুনের ছোঁয়ায় শুরু হয়ে গিয়েছিল পাতাঝরা শূন্য ডালে কিশলয়ের উচ্ছ্বাস, শিমুলের শাখায় শাখায় নববসন্তের রঙীন প্রলাপ।

আমরা দোতলা বাসের ওপর তলায় বসে বাড়ি, বহুতল বাড়ি, পার্ক আর ময়দানের গাছপালা দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট স্টপেজে এসে নেমে পড়লাম।

সঙ্গীতা বাসে বসেই পুষ্পিত একটা শিমুলের ডালে কুচকুচে কালো একটা কোকিলকে আবিষ্কার করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমি বলেছিলাম, ওর মুখে বাণী নেই কেন জান, কাছে পিঠে কোকিলা নেই।

সঙ্গীতা বলে উঠেছিল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেই তো কোকিলের গলায় বিরহের সুর বাজে।

আমি ওর মন্তব্যে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলেছিলাম, তোমার বিশ্লেষণই সঠিক।

সন্ধ্যার মুখে লেডিজ হস্টেলে এসে সুমনার রুম মেটের কাছে জানলাম, ও প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় বেরিয়ে যায় আর টিউশনি সেরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা।

আমি সঙ্গীতার মুখের দিকে তাকালাম। ও সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যাগ খুলে একটা খামে ভরা চিঠি বের করল। সুমনার রুমমেটের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, দয়া করে ওকে এই চিঠিটা দিয়ে দেবেন ভাই।

মেয়েটি বেশ হাসিখুশী। সবে অফিস থেকে ফিরেছে। বলল, নিশ্চয়ই দেব। আপনারা একটু চা খেয়ে যাবেন না?

সঙ্গীতা বলল, আজ বড় তাড়া আছে ভাই। এই যে আপনি চা খেতে বললেন, এতেই আমরা খুশী। এর ফলে একটি উপরি লাভও হল।

মেয়েটি হেসে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকাল সঙ্গীতার দিকে।

সঙ্গীতা বলল, কেবলমাত্র সুমনার পরিচিত জেনে আপনি আমাদের বসতে এবং চা খেতে বললেন, এতেই বোঝা গেল, সুমনা আপনাদের ভালবাসা পেয়েছে।

মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দিদি ওকে ভাল না বেসে পারা যায় না। বড় কম কথা বলে, স্বভাবটি মধুর। কারু একটু অসুবিধে দেখলেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা নমস্কার বিনিময় করে পথে এসে নামলাম।

বাস রাস্তার দিকে যেতে যেতে বললাম, যদি সুমনাকে না পাও তাই আগেভাগে চিঠি লিখে এনেছিলে ?

শুধু সুমনা নয়, অপালার জন্যেও লিখে এনেছি। তবে আমার মন বলছে, অপালাকে বাড়িতে পেয়ে যাব।

আমরা অপালার বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। দোতলা বড় বাড়ি। বাবা ওল্ড হোমে চলে যাবার পর নিচের তলায় সবটা জুড়ে ও স্টুডিও বানিয়ে নিয়েছে। ওপরের একখানা ঘর ওর বিশ্রামকক্ষ। বাকী দুখানা বড় বড় ঘর মা বাবার স্মৃতি-সুধায় ভরা।

পুরানো একমাত্র পরিচারিকা বিন্দুর মা এখন ঘরদোর আগলায় আর উড়োপাখিকে সামলায়।

গেট দিয়ে ঢুকে দরজার দিকে এগোতে গেলাম, মাথায় কিসের যেন ছোঁয়া লাগল। ওপরে তাকিয়ে দেখি, থোকা থোকা মালতী ফুল দুলছে।

সামনে তাকালাম। কর্পোরেশানের বাতির হলুদ আলো মাধবীর ঘন পাতায় বাধা পেয়েছে। এক ফাঁকে একটুকরো আলো ছিট্‌কে এসে পড়েছে মেজেটার ওপর। আর তাতেই তৈরী হয়ে গেছে ডানা মেলা হলুদ একটা বউ-কথা-কও পাখি।

বললাম, চমৎকার। আড়ালে যে শিল্পীটি বসে প্রকৃতির রাজ্যে কাটুমকুটুম বানিয়ে চলেছেন তাঁর লীলার কি অন্ত আছে!

সংগীতা বলল, শিল্পীর বাড়িতে শিল্পকর্মগুলি মানিয়েছে ভাল।

আমরা বেল টিপলাম। বিন্দুর মা দরজা খুলল। চোখে ছানি, ভাল করে ঠাওর হয় না। তাছাড়া কতটুকুই বা ও আমাদের দেখেছে, ছাড়াছাড়ি তো পুরো দুবছর। সুমনার সঙ্গে মাঝে সংগীতার দেখা না হলে অপালার বাড়ির নতুন অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্বধে কোনো কথাই জানতে পারতাম না।

সংগীতা বলল, তুমি বিন্দুদি না ?

আপনি কে গো ?—শোভন পাল্টা প্রশ্ন।

তুমি কি চিনবে ? আমি অপালার সংগীতা বৌদি।

ও সামান্য সময় গুম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে স্মৃতিমন্থন করতে লাগল। হঠাৎ বলে উঠল, আসুন দিদি আসুন। কতকাল পরে এলেন, সেই দিদি-মণির বিয়ের সময় এসেছিলেন।

বিন্দুদির চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ কিন্তু স্মৃতি উজ্জ্বল।

সংগীতা বলল, অপালা কোথায় ?

বিন্দুদি বেশ বলল, কেন গো, দিদিমণি ছাড়া কি আপনাদের খাতির হবে না ? ওপরে এসে বসুন। ঠিক সাতটার ঘড়ি বাজবে তার দু'দশ মিনিটের মধ্যে দিদিমণি এসে পড়বে।

রোজ এমনটি হয় বুঝি ?

হপ্তায় দুদিন, সোম আর শুক্কুর বার। বুদ্ধদেবের মন্দির যেন কোথায় আছে, সেখানে পাঠ শুনতে যায়।

আমরা বিন্দুদির সঙ্গে ওপরে উঠে গেলাম। বিন্দুদি ঘর খুলতে যাচ্ছিল, আমরা বললাম, এই বারান্দায় বেশ হাওয়া দিচ্ছে, এখানেই বসব মাদুর পেতে।

তা যেখানে মন চায় বস।

বিন্দুদি মাদুর এনে পেতে দিল। একটা মঞ্জরিত আমগাছ শাখাপ্রশাখা মেলে উঠে এসেছে দোতলার বারান্দা অব্দি। মিষ্টি দক্ষিণে একটা হাওয়া বয়ে আসছে তার ভেতর দিয়ে। ভারী ভাল লাগছে এই সন্ধ্যেটা।

আমাদের চমকে দিয়ে বারান্দার দেয়াল ঘড়িতে সাতটা বাজল। আমরা তৈরী। এবার আমাদের অপেক্ষার অবসান হবে।

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ হলো। আবার গাড়িটা চলে গেল। বেল বাজতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বিন্দুদি। সংগীতাকে সেই মুহূর্তে পেয়ে বসল ছেলেমানুষীতে। সে সিঁড়ির ধারে চওড়া একটা দেওয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল।

কিছুক্ষণের ভেতরে পায়ের সাড়া পাওয়া গেল সিঁড়িতে। অপালার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, আড়ি, আড়ি বৌদি। এতদিন পরে বেঁচে আছি কিনা দেখতে এলে ?

সিঁড়ির ওপরে উঠে এসে তাকাল অপালা। আমি একা বসে আছি দেখে খানিকটা অবাক হলো বৈকি। তাহলে কি সে বিন্দুদির কাছে ঠিক শোনেনি। ছানিপড়া চোখে কাকে দেখতে বুড়ি কাকে দেখেছে।

অপালা দ্রুত এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে আমাকে প্রণাম করার জন্য মাথা নুইয়েছে, অমনি পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল সংগীতা।

সব প্রণামটা স্যারকে নিবেদন করে দিলে আমার ভাগে কি রইল ?

অপালা ঘুরে সংগীতার বুকে মুখ লুকালো।

সত্যি, আমাদের মনের গভীরে কোথায় যে মেয়ে দুটো দাগ কেটে বসে আছে কে জানে।

সংগীতা ওর বড় ব্যাগখানা থেকে একটা প্যাকেট বের করে অপালার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, নর্মদাদির রসুইখানার প্রিপারেশান, খেয়ে দেখো।

অপালা বলল, নর্মদাদির তৈরী মানে দারুণ ব্যাপার।

আগে তো খাও, তারপর মন্তব্য।

অপালা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার এ ক'বছরে অনেক ছবি এঁকেছি, নিচে সব সাজানো আছে, আপনাদের একটু দেখাব।

তুমি না বললেও আমি নিজে দেখতে চাইতাম।

সংগীতা বলল, তার আগে একটা কথা সেরেনি। সাতই ফাল্গুন আমরা আমাদের তৈরী ছোট্ট ঘরে প্রবেশ করব। তুমি আর সুমনা সকাল থেকে সমস্ত আয়োজনের মধ্যমণি হয়ে কাজটি যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

অপালার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে গভীর আবেগে বলে চলল,

কি দারুণ একখানা সংবাদ। আমি তিনখানা নতুন বাটিকের পর্দা তৈরী করেছি, ওগুলো তোমার ঘরে ঝুলিয়ে দেব।

সংগীতা বলল, না না সেকি!

একদম কথা নয়। সেদিন আমাদের তুমি মধ্যমণি করেছ সুতরাং আমাদের ইচ্ছে মত কাজ হবে। আমি আমার আঁকা ছবি ঘরের দেয়ালে যেখানে যেমন মানায় তেমনি সাজিয়ে রাখব। ওটা আমাদের দম ফেলার আর একটা জায়গা হল বৌদি। ঠিকানা?

সংগীতা অপালার জন্য লিখে আনা চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বলল, এতে সব পাবে। তুমি ঘরে না থাকলে এই চিঠিই তোমার জন্য রেখে যেতাম।

আমরা অপালার আঁকা ছবি দেখব বলে ওর সঙ্গে নিচে নেমে গেলাম। দু'খানা বড় বড় ঘর দুপাশে, মাঝে একখানা হল ঘর। সবটাই অপালার স্টুডিও।

একখানা ঘরে ও শুধু অরণ্যের ছবি এঁকেছে। বিভিন্ন ঋতুতে অরণ্যের বৈভব। তাল তাল হালকা নীলাভ কুয়াশা ঢুকে পড়েছে অরণ্যের মধ্যে। কিছু দেখা যায়, কিছু অদৃশ্য। সে এক মসলিনের অবগুণ্ঠনে ঢাকা রহস্যময় জগৎ।

শীতের অরণ্য প্রায় নিষ্পত্র। কতকগুলো কৃষ্ণবর্ণের কঙ্কাল যেন দুদিকে বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চারটে কাক পত্রহীন ডালে বসে, স্থির দৃষ্টি। পুবের আকাশে লালের আভা, হয়ত ওদের উত্তাপের প্রতীক্ষা।

বর্ষার অনুষঙ্গে এসেছে মেঘ, বিদ্যুৎ, বলাকা। তবে বর্ষাধারায় পুষ্ট নদীর অরণ্য-পরিক্রমার ছবিটি মনোহারী। প্রান্তরে বঙ্কিম ভঙ্গীতে প্রবাহিত নদী, দুই তীরে ঘন সবুজ পত্রাচ্ছাদিত অরণ্য, ধূমল ঐরাবতের মত তাল তাল মেঘ, উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-লেখা, মেঘলোকে ভাসমান বলাকার সারি—সে এক আশ্চর্য অনুভূতি! রঙের আগুনে দীপ্ত বসন্তের অরণ্য, দাবাগ্নিতে অর্ধদগ্ধ গ্রীষ্মের অরণ্য, সব মিলিয়ে এ যেন মহা অরণ্যের এক শোভাযাত্রা।

একটিমাত্র ছবি অরণ্য-সংহারের। সপুষ্প, সপত্র বিরাট একটি বৃক্ষ সদ্য উৎপাটিত। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বৃক্ষ-কাণ্ড রণক্ষেত্রে বাহুপদহীন শবের মত পড়ে আছে। সদ্য সংহার-প্রাপ্ত বৃক্ষটির ওপরের আকাশে আশ্রয়হীন পক্ষীরা উড়ে ফিরছে আর্তকলরবে।

উল্টোদিকের ঘরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৌকোর ছবি। যাত্রী নিয়ে চলেছে চন্দ্রাতপ দেওয়া শিকারা। কাশ্মীরের লেকে সূর্যাস্তের ছবি। অস্তসূর্যের দিকে মুখ করে ভেসে চলেছে নৌকো। মাথায় ফেজ, শিকারাওয়ালা বসে আছে হাল ধরে। দুই ভ্রাম্যমান ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।

কেরালার ব্যাকওয়াটারে নৌ-বাইচের ছবি। প্রতিযোগিতার উত্তেজনাপূর্ণ শেষ-মুহূর্তটি ধরা আছে বিরাট ক্যানভাসে।

ভোরের রঙ লেগেছে পুরীর সমুদ্রে। প্রায় নগ্ন নুলিয়ারা ঢেউয়ের ওপর তুলে ধরছে তাদের নৌকো।

দ্বিপ্রহরের সমুদ্রে নানা রঙের খেলা। কাছের নীল একটু দূরে সরে গিয়ে

সবুজের আভা, আরও দূরে হালকা বেগুনি, তারপর কেমন যেন সব রঙ মিলে মিশে একাকার। তারই ওপর দিয়ে ভেসে আসছে একসারি নৌকো, ধবধবে সাদা পাল তোলা গরবিনী রাজহংসীর মত। অন্ধ্র নুলিয়াদের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকো ওগুলো।

তালের ডোঙার ওপর দাঁড়িয়ে বর্শা ছুঁড়তে উদ্যত মৎস্য-শিকারী। কলার মান্দাসে ভেসে চলেছে বেহুলা, কোলে লখীন্দরের মাথাটি সযত্নে রাখা।

এ পর্বটিও ওর হাতের টানে, রঙের ছোঁয়ায় দৃষ্টি-নন্দন।

হলঘরটি খোলার আগে অপালা বলল, এখানে যে ছবির সিরিজটি তৈরী হচ্ছে তার পেছনে অদ্ভুত একটা প্রেরণা সারাক্ষণ আমাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। বৌদি, আমি থেরীদের জীবনী নিয়ে ছবি আঁকছি।

আমি বললাম, তুমি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী থেরীদের জীবন-কথা সংগ্রহ করলে কোথা থেকে? যতদূর জানি, ওগুলি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সুত্ত পিটকের খুদ্দক নিকায়ের ভেতরে রয়েছে। কলেজে পড়ার সময় আমাদের সংস্কৃতের প্রফেসার কথা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মে নারীর স্থান সম্বন্ধে একদিন কিছু আলোচনা করেছিলেন। সেখান থেকেই আমরা জানতে পারি, বারবণিতা, বিধবা, শোকাহত মা, রাজমহিষী, সুন্দরী কুমারী কন্যা—সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর নারীই থেরীর সম্মান লাভ করেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, থেরীরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর গাথা উচ্চারণ করতেন, যাতে তাঁদের অতীত জীবন ও সাধনার অনেক উপাদানই থাকত।

আমরা সেদিন জানতে চেয়েছিলাম, থেরীদের ঐ জীবনবৃত্তান্ত কোন্ বই থেকে জানা যাবে?

তার উত্তরে তিনি সুত্ত পিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের নাম করেছিলেন। ঐ পর্যন্ত। আমরা কোনোদিন আর ঐ পালি গ্রন্থটির খোঁজখবর নিইনি।

এক নিঃশ্বাসে আমার এতগুলো কথা বলে যাওয়ার পর অপালা বলল, আমি ঐ বইয়ের নামও শুনিনি স্যার।

সংগীতা বলল, তাহলে তুমি থেরীদের জীবনী নিয়ে ছবি আঁকছ কি করে?

অপালা বলল, আমি একদিন সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেড়াতে বুদ্ধ মন্দির থেকে আরতির বাজনার শব্দ শুনতে পাই। অদ্ভুত এক অনুভূতি আমাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি তখন শব্দ অনুসরণ করে পায়ে পায়ে মন্দির চত্তরে ঢুকে পড়ি। সেখানেই প্রথম আমি দেখি এক দিব্যকান্তি ভিক্ষুকে। বয়স বেশী নয় বৌদি, কিন্তু তাঁকে দেখলে, তাঁর কথা শুনলে সেখান থেকে সহজে উঠে আসা যাবে না।

আরতির পর আমি সেদিন মন্দির চত্তরে অনেক ভক্তের সঙ্গে মিশে প্রথম অম্বপালির কাহিনীটি শুনি। তাঁর বলার গুণে বড় চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল সে কাহিনী। আসর ভেঙে গেলে আমি খবর নিয়ে জানলাম, ভিক্ষুপ্রবর

সপ্তাহে দুদিন থেরীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন।

আমি এরপর তাঁর প্রতিটি আলোচনার আসরেই হাজির থাকি। ওঁর বলাটা ঠিক যেন ছবি এঁকে এঁকে বলা। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের ওপর থেরীদের জীবনের ছবিগুলো ফুটে উঠতে থাকে। তার থেকে আমি একটা প্রেরণা পেয়ে যাই। আমার থেরী-কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকার ইতিহাস এইটুকু।

কথা শেষ করে দরজা খুলে দিল অপালা। সারা হল জুড়ে ক্যানভাসের ওপর আঁকা ছবির মিছিল। বিভিন্ন দেওয়ালে জোরালো আলো লাগানো। কোথাও হালকা ব্লু বাল্বের ছটা, কোথাও বা জোরালো হলুদ আলো।

ও আমাদের প্রথমে অম্বপালীর কাছে নিয়ে গেল। একটা ক্যানভাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমেই এক আম্রবৃক্ষের ছবি। তার তলায় শুয়ে আছে এক শিশুকন্যা। উদ্যানরক্ষক শিশুটিকে কোলে তুলে নেবার জন্য দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঠিক যেন শিশু শকুন্তলার প্রতিচ্ছবি।

অপালা এবার তার ছবির পরিচিতি দিতে গিয়ে বলতে লাগল, বৈশালীর রাজোদ্যানের এক আম্রবৃক্ষের তলায় উদ্যানপালক কুড়িয়ে পায় এই শিশু-কন্যাটিকে। আম্রবৃক্ষের তলায় পাওয়া যায় বলে কন্যাটির নাম হয় অম্বপালী।

ধীরে ধীরে কন্যাটি তরুণী হলো। তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। বহু রাজপুত্র এগিয়ে এল পরমাসুন্দরী নৃত্যপটিয়সী এই কন্যাটিকে লাভ করার জন্য। শুরু হয়ে গেল তীব্র কলহ।

শেষে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠার আগেই একটা রফা হলো প্রতিযোগীদের মধ্যে। অম্বপালী হবে নগরনটী, সর্বভোগ্যা।

দ্বিতীয়টি 'নর্তকী' অম্বপালীর ছবি। এটিকে অপূর্ব সৌন্দর্য সুষমায় ফুটিয়ে তুলেছে অপালা।

কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম পুষ্পাভরণে ভূষিত। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। বহুমূল্য বারাণসীর রেশমী বস্ত্র আর চোলীতে আচ্ছাদিত শ্রীঅঙ্গ। মুক্তামালা আর মণিকাঞ্চনের আভরণে সারা দেহ সুশোভিত। যেন পুষ্পিত বসন্তে প্রেমের প্রতিমা রতির আবির্ভাব।

সংগীতা বলল, নর্তকীর মুখখানা বড় চেনা চেনা লাগছে অপালা!

অপালার মুখে ফুটে উঠল মৃদু মৃদু হাসি। বলল, তোমার চোখকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বৌদি। সুমনাকে ঐ সাজ পরিয়ে ঐরকম নাচের ভঙ্গিমায় দাঁড় করিয়ে এঁকেছি।

সংগীতা বলল, চমৎকার মানিয়েছে।

তিনদিন ওকে এখানে এনে রেখেছিলাম। হস্টেলে ফিরে যাবার সময় বললাম, ঐ বেনারসী, গয়না সব তোর, তুই নিজের কাছে রেখে দে।

নিয়ে গেল ও?

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বৌদি। শেষে বলল, কোথায় এখন রাখব বল এতসব দামী জিনিস, রেখে দে তোর কাছে। নাচের আসরে দরকার হলে

ঐ আসল জিনিসগুলো পরেই নাচব। তুই আমি তো আলাদা নয় অপালা।

বললাম, এটা তোর সান্ত্বনা দেবার কথা।

ও বলল, অপালা, তুই চিরদিনই আমাকে ভুল বুঝে গেলি।

এরপর অপালা সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, বৌদি, ক্যানভাসের ভেতর এই তিন নম্বর ছবিতে উদ্যানে ঘেরা একটি বিহার দেখছ। ঐ বিহারের বেদীতে বসে রয়েছেন তথাগত। তাঁর চরণে লুটিয়ে অম্বপালী নিবেদন করছেন অন্তরের আকুল প্রণতি।

এই বিহার নিজের উদ্যানে তৈরী করিয়ে বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে দান করছেন অম্বপালী। তাঁর অন্তর বুদ্ধের করুণার স্পর্শে অমৃতময় হয়ে গেছে।

এতদূর অবধি অম্বপালীর কাহিনী আমার অজানা ছিল না। কিন্তু শেষ ছবিটি আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

এক পলিতকেশা লোলচর্মা বৃদ্ধা বসে আছেন পত্রশূন্য একটি বৃক্ষের তলায়। বৃক্ষের ছড়িয়ে পড়া শাখাপ্রশাখা দেখে মনে হচ্ছে, এই মুমূর্ষু বৃক্ষটি একদিন সজীব ছিল। অজস্র শ্যামল পত্রে আচ্ছাদিত ছিল তার দেহ। ঋতুতে ঋতুতে পুষ্পিত হত মুকুলগুলি। দক্ষিণ বাতাসে শিহরন জাগত তার যৌবন-বাসনায়।

কিন্তু আজ সে রিক্ত। একটি পাখিতেও ভ্রমক্রমে বসে না তার ডালে।

কে এই রমণী! এই বিগতযৌবনা বৃদ্ধাকে কেন এনে বসান হলো বহুবর্ণ রঞ্জিত অম্বপালী-চিত্রগুচ্ছের মধ্যে!

অপালার গলা শোনা গেল, নটী অম্বপালীর চৈতন্যোদয় হয়েছিল। মানুষের যৌবন যে একেবারে ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর সে উপলব্ধি এসেছিল তাঁর নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে। এরপর তিনি বিশ্বের সমস্ত বস্তুর অনিত্যতাকে তাঁর ধ্যানের বিষয় করে নিয়েছিলেন। নিচে দেখুন অম্বপালী রচিত গাথার কয়েকটি ছত্র তুলে দিয়েছি।

আমরা বসে পড়ে প্যানেলের নিচের দিকে উৎকীর্ণ লেখাগুলো পড়তে লাগলাম।

আমার ভ্রমরকৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশরাজি একদিন ছিল সুবিন্যস্ত, বেণীশোভিত। সেই কেশে ধারণ করতাম স্বর্ণালঙ্কার। আজ সেই সুশোভিত কেশরাজি স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে শির থেকে।

আমার ভ্রূযুগল ছিল চিত্রকরের তুলিতে আঁকা ছবির মত, আজ তা জরাগ্রস্ত, প্রলম্বিত।

আমার চক্ষুতারা গাঢ় নীলবর্ণের মণির ন্যায় ছিল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়, এখন তা অস্বচ্ছ, শোভাহীন।

আমার সুগোল স্তম্ভ সদৃশ বাহুযুগল, কোমল ও সুগঠিত পদদ্বয় বিশুষ্ক পাটলী শাখার ন্যায় এবং বলি আচ্ছাদিত।

সুচিক্কণ শঙ্খের ন্যায় সুগোল আমার গ্রীবাদেশ এখন জরাগ্রস্ত হয়ে ভগ্ন ও বিনষ্ট।

মার্জিত সুবর্ণ ফলকের মতো কান্তিময় আমার দেহ এখন সূক্ষ্ম বলি-রেখায় আচ্ছাদিত।

বনবিহারী কোকিলের ধ্বনির ন্যায় আমার সুললিত কণ্ঠস্বর আজ বিকৃত ও ভগ্ন।

আমার এ দেহ এখন জর্জরিত দুঃখের আলয়। জীর্ণ গৃহ থেকে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে প্রলেপ।

সত্যবাদীগণের বাক্য কখনো বৃথা হয় না।

পড়া শেষ হলে বললাম, জীবনের পরম একটি সত্যকে তুমি তোমার ছবির মাধ্যমে ধরে রাখতে পেরেছ অপালা। এ যেন চোখের সামনে অভিনীত হলো নিত্যকালের মানুষের অনিবার্য পরিণতির কাহিনী।

স্যার, ভিক্ষুপ্রবর অপূর্ব অভিনয়ের ভঙ্গীতে কাহিনীগুলো বলে যান। আমাকে ছবির জন্য বিশেষ কিছু ভাবতে হয় না।

সঙ্গীতা আর একটি ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

অপালা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল ছবিখানার দিকে। আমি জানি, অপালা শুধু চিত্রশিল্পী নয়, সে কলেজের থিয়েটারে দারুণ অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এখানেও সে ক্যানভাসের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে ডান হাতখানা সামনে প্রসারিত করে আর্তকণ্ঠে ডাক দিতে লাগল, মা 'জীবা', মা 'জী-ঈ-বা…'।

এবার ফিরে দাঁড়াল ক্যানভাসের দিকে। আমরাও এগিয়ে গিয়ে ওর ছবি দেখতে লাগলাম।

অপালা বলল, বৌদি, এবার আমরা মাঝের ছবিখানা আগে দেখব।

এই ছবিতে একটা মহাশ্মশানের দৃশ্য। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অচিরাবতী নদী। এক নারী তার হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তার মৃতা শিশুকন্যাটির উদ্দেশ্যে পাগলিনীর মতো ডেকে চলেছে, 'মা জীবা, মা জীবা'।

এবার আমরা প্রথম ছবিটিতে আসছি। এক জননী কোলে নিয়ে বসে আছেন তাঁর শিশুকন্যাটিকে। ইনি উব্বিরী। শ্রাবস্তী নগরীর এক সম্ভ্রান্ত গৃহের কন্যা। স্বভাবে, সৌন্দর্যে ইনি ছিলেন অতুলনীয়া। একদিন তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি ভেসে এল কোশলরাজের কানে। তিনি উব্বিরীকে নিয়ে এলেন রাজঅন্তঃপুরে। কিছুকাল পরে সেখানেই ভূমিষ্ঠ হলো তাঁর এক কন্যা। রাজা কন্যার মুখ দর্শন করে মুগ্ধ হলেন। তিনি তার নাম রাখলেন, জীবা। একদিন উব্বিরী সামান্য অন্তঃপুরচারিণীর পদ থেকে অভিষিক্তা হলেন রাজমহিষীর পদে।

কিন্তু এই সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। অচিরেই নেমে এলো শোকের অন্ধকার। শিশুকন্যাটি মায়ের কোল শূন্য করে চলে গেল পরলোকে।

সন্তানহারা জননী পাগলিনীর মতো ছুটে যান মহাশ্মশানে, যেখানে তাঁর সন্তান ঘুমিয়ে আছে চিরনিদ্রায়।

শেষ ছবিটি এবার দেখুন। ঐ নদী, ঐ একই মহাশ্মশানের দৃশ্য। এখন

শ্মশানের বুকে দণ্ডায়মান করুণাঘন বুদ্ধ। তাঁর পদতলে প্রণত শোকাতুরা উব্বিরী।

সন্তানশোকে কাতরা জননী 'মা জীবা', 'মা জীবা' বলে ডাকছিল, তথাগত পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, তুমি 'মা জীবা, মা জীবা' রবে কেন কেঁদে বেড়াচ্ছে, শান্ত হও। এই মহাশ্মশানে সহস্র সহস্র জীবা ভস্মীভূত হয়েছে। তুমি কোন্ জীবার জন্য শোকার্ত হচ্ছ?

তথাগতের বাক্যে অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল উব্বিরীর। তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, এই কয়টি কথা।—

আমার অন্তরে বিদ্ধ শর অপসারিত হয়েছে। প্রিয় সন্তানের জন্য যে প্রাণনাশী শোক আমার অন্তরকে বিষাক্ত করে তুলেছিল তা বিদূরিত হয়েছে।

আজ আমি শান্ত, আকুলতা-শূন্য। চিত্ত সুনির্মল।

আমি সর্বদর্শী প্রভু বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও তাঁর সঙ্ঘের শরণ নিলাম।

দীর্ঘ কয়েকটি বছর পার হয়ে এসেছি আমরা। সংসারের আবর্তনে ছিন্ন হয়ে গেছে বহু যোগসূত্র। নতুন গ্রন্থিবন্ধন হয়েছে নতুন মানুষের সঙ্গে। এগিয়ে চলেছে জীবন নব নব আবর্ত রচনা করতে করতে।

নৃত্যশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সুমনা। কাগজে মাঝে মাঝেই তার নাম দেখতে পাই। কলা-সমালোচকদের প্রশংসাধন্য সে। সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় নাচের বিশেষ মুদ্রায় তার ছবি বেরুলে আমরা দুজনে বড় আগ্রহ ভরে দেখতে থাকি।

কিছুদিন আগে একটি টি. ভি. অনুষ্ঠানে দেখলাম সুমনাকে। আমাদের গৃহপ্রবেশের দিন শেষ দেখেছি ওদের দুবন্ধুকে। তারপর বেশ কয়েকটা বছরের ব্যবধান।

টি. ভি.তে একক ওড়িশী নৃত্য পরিবেশন করল। এ ক' বছরে অনেক অনুশীলনের ছাপ রয়েছে ওর নাচে। বয়স অবশ্যই বছরের হিসেবে বেড়েছে কিন্তু মুখে কিংবা অঙ্গসঞ্চালনে বয়েসের ছাপ পড়েনি। মনোহারিণী, অভিব্যক্তিপূর্ণ দেহ-সম্পদ নিয়ে সে নৃত্যলীলায় পরিক্রমা করল সারাটি মঞ্চ।

ওর অনুষ্ঠান শেষ হলে স্বভাবতই আমরা ভারী খুশী হয়ে উঠলাম। সঙ্গীতা ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠল।

এই য্যাঃ, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

সঙ্গীতাকে জিভ কেটে বাক্যটি উচ্চারণ করতে শুনে আমি আগ্রহী হয়ে উঠলাম, কি ভুলে গিয়েছিলে?

তোমাকে একটা কথা বলতে।

কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা?

ওভাবে বল না। হয়ত এর বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, তবে কথাটা আমার বলা উচিত ছিল।

বললাম, এবার বিনা ভূমিকায় বলে ফেল।

সঙ্গীতা বলল, বেশ কিছুদিন আগে বাসে দেখা হয়ে গিয়েছিল সুমনার রুমমেটটির সঙ্গে। এতকাল পরেও মেয়েটি ঠিক আমাকে চিনতে পেরেছিল। ওর মুখেই কথাটা শুনলাম।

আবার চুপ। সঙ্গীতা কথার ভেতর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে ভালবাসে।

আমি মুখে কোনো প্রশ্ন না করে শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সঙ্গীতা সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, সুমনা এখনও বিনায়ককে ভুলতে পারেনি।

কি করে বোঝা গেল ?

ওদের বিচ্ছেদের পর এতগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু সুমনা এখনও সংসারী হয়নি। তাছাড়া ও নাকি প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, কোনো পুরুষের সঙ্গে ও আর দ্বৈত নৃত্যে নামবে না।

বললাম, সুমনা এ ব্যাপারে ভুল করল কি ঠিক করল জানি না, তবে তার ভাবনা নিজস্ব একটা পথ ধরে চলে। সে উচ্ছল নয়, স্থির।

সুমনার অন্তরঙ্গ বন্ধু অপালাও অনেকদিন আমাদের স্মৃতি থেকে আড়ালে চলে গিয়েছিল। সেই কতদিন আগে আমরা তাকে শেষ দেখে এসেছিলাম। তখন সে মগ্ন হয়ে বৌদ্ধ থেরীদের কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকছিল।

আশ্চর্য জীবনচক্র আমাদের, কখন যে চলতে চলতে পথের ধারে আমরা পরিচিতজনদের ফেলে রেখে এগিয়ে যাই তার হিসেব থাকে না। আবার আবর্তন চক্রে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যাওয়া কোনো কোনো মুখের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তখন বিস্ময় আর খুশীর হাওয়া বইতে থাকে। তাকে ঘিরে ক্ষণকালের জন্য হলেও আনন্দবাসর বসে যায়। এ যেন বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া মণিটিকে সহসা কুড়িয়ে পাওয়ার আনন্দ।

বাংলাদেশ ছাড়িয়ে এতখানি দূর অজন্তা দেখতে এসে আমরা যে তেমনি আশ্চর্যভাবে কুড়িয়ে পাব আমাদের চেনা মুখের মেয়েটিকে তা ছিল আমাদের কাছে একেবারে অভাবনীয়।

পাঁচ দিন অপালার আতিথ্য নিয়ে আমরা দুজনে কাটালাম অরণ্যের ধারে অপালার তৈরী 'উদয় বিহারে'। লম্বা টানা ব্যারাকের মতো ঘরখানা। পাথরের দেয়াল, ওপরে অ্যাসবেস্টারের ছাউনি।

সারা দিন রাত কেটে যায় অতীতের ছবিগুলো স্মৃতির পাতা থেকে ওল্টাতে ওল্টাতে।

আমরা ইতিমধ্যে অপালার সঙ্গে দুদিন গিয়ে দেখে এলাম অজন্তার গুহাচিত্রাবলী। অপালা শিল্পী, সে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন রীতিতে বহু ছবি এঁকেছে। অজন্তা-শিল্পের কোনো রীতি বা তথ্য তার অপরিচিত নয়। সে ভারী সাবলীল ভঙ্গীতে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের।

রাতে জ্যোৎস্নায় ভরে থাকে আকাশ। প্রান্তর থেকে রাতের বাতাস বয়ে আসে। সেই হৃদয় জুড়ানো হাওয়া বনের পত্রাবলীতে মর্মরধ্বনি তুলে চলে যায়

ওপারে প্রবহমান স্রোতস্বতীর জলধারার সঙ্গে আনন্দলীলায় মেতে উঠতে।

অপালা বৌদির কাছে আব্দার জানায়, শাপমোচনের সেই গানটা গাও বৌদি।

সংগীতা জানে অপালা তাকে কোন্ গানখানা গাইতে বলছে। এ গান সে একাধিকবার ওদের দুজনকে শুনিয়েছে।

সেই পরিবেশে সংগীতার গলায় গান আপনিই এসে যায়।

'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে।।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।'

গান শেষ হলে জ্যোৎস্নাধারার প্লাবনের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল অপালার অশ্রুধারা।

রাতে বৌদির সঙ্গে একই শয্যায় শোয় অপালা। দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত গল্পে মশগুল হয়ে থাকে দুজনে।

আমাকে একান্তে পেয়ে সংগীতা বলল, ইনি সেই ভিক্ষু।

বললাম, কলকাতায় যাঁর কাছ থেকে থেরীগাথা শুনে অপালা নতুন ছবির সিরিজ শুরু করেছিল?

হাঁ।

সাধু এখানে কিসের জন্য এসেছেন?

নিভৃতে তপস্যার জন্য।

বললাম, অপালা কেনই বা ওঁকে অনুসরণ করছে? ওতে একজন সাধুর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটবে না?

সংগীতা বলল, অপালা যে মোহগ্রস্ত সে বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই। তুমি হয়ত লক্ষ্য করেছ সারাদিন অপালা অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণ করে। সন্ধ্যায় একটি বড় আকারের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসে গুহামুখে। সারারাত সে প্রদীপ জ্বলতে থাকে অনির্বাণ। আকাশে যখন শুকতারা দেখা দেয় তখন উঠে পড়ে অপালা। নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এগিয়ে যায় ফল ও খাবারের থালা নিয়ে। প্রদীপ নিভিয়ে দেয় তখন। গুহামুখে একটা বেদীর ওপর ভিক্ষুর জন্য রেখে দেয় খাবার জিনিসগুলি। তারপর ও ডাক দিতে থাকে ভিক্ষুকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। সে সময় অপালা সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত। সে তখন অন্য কাউকে চেনে না। তার সমস্ত ভাবনা জুড়ে থাকে তখন সেই ভিক্ষু।

বললাম, ভিক্ষুর দিক থেকে কি অপালার ওপর কোন আকর্ষণ আছে?

অপালার সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জেনেছি, ভিক্ষু নির্বিকার। তবে মাঝে মাঝে অপালার ওপর তাঁর করুণা জাগে।

কিভাবে বোঝা যায়?

নিঃশব্দে এসে একসময় তিনি অপালার দেওয়া খাবার নিয়ে গুহার ভেতরে

চলে যান। তাছাড়া···।

আবার থেমে গেল সংগীতা।

উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাছাড়া কি?

কলকাতা থেকে সেবার 'থেরী কাহিনী' অসমাপ্ত রেখে ভিক্ষু যখন বাইরে চলে যান তখন অপালা ওঁর খোঁজ নিয়ে ফিরেছে বহু জায়গায়। শেষে তাঁর দেখা পেয়েছে বুদ্ধগয়ায়। সেখান থেকে দুটি থেরীগাথা সংগ্রহ করে তবেই ফিরেছে। এর থেকেই বোঝা যায় ভিক্ষুর দাক্ষিণ্য আছে অপালার ওপর।

বললাম, অপালার সহজাত শিল্পপ্রতিভা আছে, আর তার সঙ্গে রয়েছে দারুণ খেয়াল।

সংগীতা বলতে লাগল, তারপর কলকাতায় ফিরে এলেন সাধু। চলল একটানা থেরীদের প্রসঙ্গ। উল্লসিত অপালা, ছবি এঁকে যায় পাগলের মতো। 'কৃশা গোতমী', একমাত্র মৃত পুত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন বুদ্ধের কাছে। প্রাণ-ভিক্ষা করেছিলেন পুত্রের। তথাগত বলেছিলেন, নগরে গিয়ে সেখানকার এমন কোন গৃহ থেকে একটি সর্ষপ বীজ সংগ্রহ করে আন যে গৃহে কোনোদিন মৃত্যু হয়নি।

কৃশা গোতমীর চৈতন্যোদয় হয়েছিল সেই থেকে।

এমনি মুক্তা, পটাচারা, সুমেধা, ইসিদাসী, আরও কতজনের সামান্য সাংসারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে অর্হত্বলাভের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে।

কাউকে বাদ দেয়নি অপালা। সবার ওপরে তার সমান শ্রদ্ধা। তুলির টানে সে ফুটিয়ে তুলেছে প্রতিটি অন্তরের ভাব ভাবনাগুলি। শেষে ভিক্ষু উদয়ভদ্র আবার উধাও।

বললাম, এবার কোথা থেকে অপালা তাকে আবিষ্কার করল?

ভারতের সব বৌদ্ধস্থানে ঢুঁড়েও অপালা সন্ধান পায়নি উদয়ভদ্রের। শেষে এই অজন্তায় এসে আশ্চর্যভাবে খোঁজ পেয়ে গেল তার বহুপ্রার্থিত মানুষটির।

বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ সংগীতা, অপালা এক ধরনের মোহের শিকার হয়েছে।

সংগীতা বলল, থেরীদের কাহিনীর ওপর ওর মোহটাই স্বাভাবিক, কারণ সেগুলোই এখন ওর ছবির বিষয়। কিন্তু সেই সূত্রে কথকের ওপর স্বাভাবিক-ভাবেই পড়ে গেছে আকর্ষণ।

বললাম, সে যাই হোক, বিষয়টি পবিত্র, সুতরাং এর পরিণতি শুভ হোক, এই প্রার্থনাই জানিয়ে যাব করুণাময় বুদ্ধের কাছে।

পাঁচদিন সেই প্রায় জনহীন প্রান্তরে অপালার সঙ্গে কাটিয়ে অবশেষে কলকাতায় ফিরে এলাম আমরা। অপালার এই মুহূর্তে কলকাতায় ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, তাই সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের কোনো প্রয়োজনই বোধ করিনি। আসার সময় সংগীতাকে জড়িয়ে ধরে আকুল অপালা বলেছিল, আমি কোথায় আছি, কি করছি জানি না বৌদি, শুধু

তোমরা আমার জন্য একটু ভালবাসার জায়গা রেখো তোমাদের মনের মধ্যে।

ঐ পাগলী মেয়েটাকে একা ওখানে ফেলে আসতে হচ্ছে ভেবে সংগীতা বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সারাটা ট্রেন জার্নি'তে ও দু' চারটের বেশী কথা বলেনি। জানলার ধারে বসে উদাস দৃষ্টিতে চেয়েছিল বাইরের দিকে।

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা প্রথমেই চিঠি দিলাম সুমনাকে। ও সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো আমাদের বাড়ি।

অনেক কথা হলো সুমনার সঙ্গে। বুঝলাম, এখনও অপালার জন্য তার হৃদয়ভরা উত্তাপ।

সে বলল, ওর কথা শুনে বড় ভাবনায় পড়লাম বৌদি। অন্তত এ সময়টায় একবার ওর কাছে আমার থাকা দরকার।

আমি বললাম, তুমি ঠিকই বলেছ সুমনা, তোমার বন্ধু মনে হয় একটা ঘোরের ভেতর রয়েছে। তোমাকে কাছে পেলে সে অস্থিরতা ওর ধীরে ধীরে কেটে যেতে পারে।

সুমনা সত্যিই চলে গেল প্রাণের বন্ধুর টানে। ট্রেনে ওঠার আগে সে তার বৌদিকে যাত্রা-সংবাদটা জানিয়ে দিল ফোন করে।

মাস দেড়েকের ভেতরেই একটা চিঠি এল সংগীতার নামে। বিকেলের ডাকেই চিঠিটা এল। আমরা তখন বারান্দায় চায়ের আসরে। নর্মদাদি নিচ থেকে চিঠিটা এনে ধরিয়ে দিলে হাতে।

আমি ঠিকানা পড়ে ওর দিকে খামটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার চিঠি।

সংগীতা খাম খুলে চিঠিখানা বের করে পড়তে লাগল। আমি দেখলাম, ওর মুখের ছবি গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

চিঠিপড়া শেষ হলে ও বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, পড়ে দেখ।

আমি নিচে সুমনার নাম দেখলাম। অমনি সাগ্রহে চিঠিখানা পড়তে লাগলাম। অনেক প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়া বৌদি,

আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের ওপর আশ্চর্যভাবে যবনিকা পড়ে গেল আজ। এই অবস্থায় আমার মন সুখ-দুঃখের অতীত একটা অনুভূতির মধ্যে রয়েছে। তোমাকে ছাড়া এই মুহূর্তে একান্ত আপনার আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই তোমাকেই চিঠি দিয়ে সবকিছু জানাচ্ছি।

আমাকে কোনো খবর না দিয়ে চলে আসতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল অপালা। কিন্তু পরক্ষণেই সে রামবিলাসের উপস্থিতি ভুলে পাগলের মত জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। প্রাণের বন্ধুকে কাছে পেয়ে সে যেন সোনার খনি আবিষ্কারের রোমাঞ্চ আর আনন্দ একসঙ্গে অনুভব করেছিল।

আমরা যে এই কটি সপ্তাহ কি করে একসঙ্গে কাটিয়েছি তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে চিঠির পাতার সংখ্যাগুলোকে অকারণে বাড়াব না। তবে একসঙ্গে দূরের গ্রামগুলোতে হেঁটে গেছি। অন্দরমহলে ঢুকে গিয়ে আলাপ জমিয়ে এসেছি মেয়েদের সঙ্গে। তাদের সংসারের সুখদুঃখের ছবি এঁকে গেছে তারা

সহজভাবে, কোনো রকম আড়াল না রেখে।

আমরা একান্তে নিজেদের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবন মিলিয়ে দেখেছি। মনে মনে সুখের স্বাদ পেয়েছি, আবার কষ্টের ছোঁয়াও লেগেছে গোপন মনের গভীরে।

জ্যোৎস্না রাতে হাতে হাত বেঁধে নিশি পাওয়ার মতো দুবন্ধুতে ঘুরে বেড়িয়েছি ঐ দিগন্ত খোলা প্রান্তরে। কোনো কোনো দিন রাত গভীর দেখে রামবিলাসের বউ আমাদের খুঁজে এনেছে কোনো টিলার ধার থেকে।

গত সপ্তাহের দিনগুলো আমাদের কেটেছে ভারী দুশ্চিন্তায়। প্রতিদিন অপালা নিয়মমত ভিক্ষু উদয়ভদ্রের জন্য খাবার রেখে এসেছে, কিন্তু সে খাবারের এককণাও গ্রহণ করেননি সাধু।

আমরা দুজনেই বিস্মিত, চিন্তিত। অক্ষম, অসহায়ের মতো নানা চিন্তার জাল বুনে চলেছি, কি হতে পারে! কি হতে পারে!

শেষে ভিক্ষু উদয়ভদ্রের অসুস্থতার চিন্তাই আমাদের দু'জনকে উদ্বিগ্ন করে তুলল।

গত রাত ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমার উজ্জ্বল, নির্মল রাত্রি। আমরা আগে থেকেই কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছিলাম। অপালা উৎসবের জন্য এঁকে রেখেছিল চারটি ছবি। বুদ্ধের জন্ম, বিবাহ, প্রাসাদ ত্যাগ ও সিদ্ধিলাভ।

রামবিলাসকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে ফুলপাতা সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। আমরা ঐ জ্যোৎস্নাধোয়া প্রান্তরে একটা বেদী তৈরী করে নিয়ে সাজিয়েছিলাম ছবিগুলো ফুলপাতা দিয়ে। সে রাতে বেশ কয়েকটি পদ রান্না করা হয়েছিল। তার ভেতর ছিল পয়েসান্ন। বুদ্ধকে সেই পায়েস নিবেদনের পরিকল্পনা করেছিলাম।

তথাগতকে কেন্দ্র করে পুজা অর্চনা শেষ হলো। প্রায় সারা রাত বিরতি দিয়ে দিয়ে আমি নাচলাম। বুদ্ধজন্মের সময় আনন্দ-উৎসবের নৃত্য, সিদ্ধার্থের বিবাহ-বাসরের নৃত্য, গৃহত্যাগের সময় বিচ্ছেদ-বেদনার অভিনয়, সিদ্ধিলাভের পর সুজাতার পায়েসান্ন নিবেদনের অভিনয়। এতগুলি নাচ ও অভিনয় করতে সে রাতে জানি না কেন, কোনো রকম ক্লান্তিবোধ করিনি আমি।

বুদ্ধের বেদীতে নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে সত্যিকারের পায়েসান্ন নিবেদনের পর বিদ্যুৎঝলকের মত একটি চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। আমি অপালার দিকে ফিরে বললাম, শুকতারা জ্বলজ্বল করছে আকাশে, ভোরের বেশী বাকী নেই। চল, আমরা রাতের পোশাক ছেড়ে পরিশুদ্ধ হয়ে, পায়েসান্ন নিয়ে ভিক্ষু উদয়ভদ্রের গুহায় ঢুকে পড়ি। দেখা যাবে তিনি কি অবস্থায় রয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল অপালা। বলল, বুদ্ধপূর্ণিমা শেষ হলো, নতুন দিনের সূর্যোদয় হচ্ছে, এটাই তাঁর কাছে যাওয়ার পরম লগ্ন।

আমরা শুদ্ধ বেশবাসে পায়েসান্ন নিয়ে গুহামুখে পেঁছিলাম। আজ আর

প্রতিদিনের মতো অপালা ভিক্ষুকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য ডাক দিল না।

পূর্ণিমার রাতে ভিক্ষুর গুহামুখে জেলে দেওয়া প্রদীপটি প্রতিদিনের মতো না নিভিয়ে আমি হাতে তুলে নিলাম। অপালার রেকাবিতে পায়েসান্ন।

আমি আগে চলেছি প্রদীপ হাতে, অপালা পেছনে। বুঝলাম, টিলা পাহাড়ের অনেকখানি কুঁদে গুহাপথটি তৈরী করা হয়েছে। আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। সহস্র বছর আগে হয়ত নির্মাণ করা হয়েছিল এই গুহা, সাধকদের নিভৃত সাধনার জন্য। তারপর কত সাধক এই সুড়ঙ্গ পথে গমনাগমন করেছেন। তাঁদের চরণস্পর্শে ধন্য হয়েছে গুহা। তাঁদের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হয়েছে এই পথে। আমার কানে এসে পেঁছিতে লাগল সাধকদের সহস্র বছরের পদধ্বনি। যেন শুনতে পেলাম, মৃদুস্বরে ভিক্ষুদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে মন্ত্র, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

সুড়ঙ্গ পথ শেষ হয়ে গেল। এবার পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত একটি ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহের মেজে মসৃণ ও বেদীর মতো উচ্চ।

আমরা তখন রোমাঞ্চিত। কেউ বসে রয়েছেন বেদীতে। আমরা হাতের প্রদীপ আর পায়েসান্নের পাত্র নামিয়ে রাখলাম প্রস্তর বেদীর নিচে। লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলাম।

আমি উঠে বসে দেখলাম, আকুল আবেগে অপালা লুটিয়ে পড়ে তখনও প্রণাম করছে।

এবার বেদীর দিকে চোখ মেলে তাকালাম। পূর্বদিকে মুখ করে ধ্যানের মুদ্রায় বসে রয়েছেন তাপস। পাহাড়ের এক রন্ধ্রপথে ভোরের সোনালী সূর্যালোক এসে পড়েছে তাঁর মুখের ওপর।

এ আমি কাকে দেখছি! বার বার চোখ মুছে তাকালাম। সেই একই মূর্তি! আমার অন্তরের নিভৃত আসনে বসিয়ে যাঁকে প্রতিদিন স্মরণ করেছি, যাঁকে নিয়ত অভিষিক্ত করেছি ব্যথার অশ্রুজলে সেই বিনায়ক বসে রয়েছেন সাধন বেদীতে।

কি আশ্চর্য রূপান্তর! ভোরের সূর্যের স্পর্শে অন্তরের ভাব সৃষ্টি করেছে এক জ্যোতির্মণ্ডল। ওষ্ঠে লেগে আছে সর্বমানবকে ভালবাসার সস্মিত হাসিটি। আমাদের দেখতে পেয়েছেন তিনি, কিন্তু সে দৃষ্টি কোন ব্যক্তি-বিশেষের ওপর নিবন্ধ নয়। বিশ্বের সমস্ত নরনারীকে যেন দেখছেন সেই করুণার দৃষ্টিতে।

আমি অস্ফুটে বিনায়কের নাম উচ্চারণ করতে লাগলাম। অপালা পায়েসান্নের পাত্র প্রসারিত করল ভিক্ষু উদয়ভদ্রকে নিবেদনের বাসনায়।

তোমাদের স্নেহের প্রত্যাশী—সুমনা।

চিঠি পড়া শেষ হলে আমি তাকালাম সংগীতার দিকে। আমার মনে তখন লেগে আছে বিস্ময়ের ঘোর।

সংগীতা বলল, চমৎকার!

আমি সারামুখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সঙ্গীতা এবার বলে উঠল, বিনায়কের উদয়ভদ্রে রূপান্তরের ভেতর দিয়ে দুই বান্ধবীর বন্ধুত্বের বন্ধন চির অটুট হয়ে গেল।

অনেকদিন যেতে পারিনি দয়ালজীর কাছে। প্রচুর কাজ জমে আছে।

একসময় এসে দাঁড়ালাম দয়ালজীর সামনে।

ওঁর স্বভাবসিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কি খবর অধ্যাপক, কয়েকদিন একেবারে নিরুদ্দেশ?

বললাম, শরীর মন ভাল ছিল না দাদা।

এখন সুস্থ?

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, অনেকগুলো কাজ জমে আছে, বিশেষ করে ডঃ সেনের বইখানা তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।

নিয়মমত মুখোমুখি বসে দুজনে ফলাহার করলাম। এরপর উনি ওঁর কাজ নিয়ে বসলেন। আমি সিনপ্সিস লেখার কাজ শুরু করলাম।

একসময় লেখা শেষ হলো। যে কোনো একটি বইয়ের সিনপ্সিস লেখা শেষ হলেই উনি সাগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আমি ঐ ছোট্ট সিনপ্সিসটি পড়তে শুরু করলেই উনি চোখদুটি বন্ধ করে নিবিষ্ট হয়ে শুনতেন। ভাল-মন্দ বোঝার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওঁর।

অবাঙালী হয়েও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর এই আগ্রহে আমি মুগ্ধ হতাম।

আমার সিনপ্সিসটি পড়া শেষ হলে উনি চোখ খুলে হাততালি দিলেন।

বললাম, কোন সাজেস্সান থাকলে বলুন।

উনি বললেন, না, এ বিষয়ে কিছুই বলার নেই। তবে কয়েকদিন থেকে ভাবছি, একটি কথা বলব।

বলুন দাদা।

উনি মুখ নিচু করলেন। আমি দেখলাম চোখ দুটি বন্ধ হলো। কোনকিছু গভীর ভাবনার সময় উনি সাধারণতঃ এমনি করে থাকেন।

কতক্ষণ একইভাবে বসে রইলেন। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। কি এমন কথা থাকতে পারে ওঁর, যাতে কথাটা বলতে এতখানি সময় নিচ্ছেন।

একসময় চোখ খুললেন দয়ালজী। আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

এখন গলার স্বর স্পষ্ট, কিন্তু কিছুটা আবেগের স্পর্শ রয়েছে।

কথাটা বলতে আমার চেয়ে বেশী কষ্ট কেউ পাবে না। প্রফেসার, দীর্ঘ কয়েক বছর আমরা মুখোমুখি বসে আছি। একদিন আপনি না এলে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি।

উনি কথাকটি বলে একটু থামলেন।

আমি বললাম, আমিও এখানে না এসে পারি না দাদা।

উনি বললেন, যত কষ্টই হোক আমাদের এ বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

আমি অত্যন্ত ব্যথিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আমার ওপর এ শাস্তি কেন

দাদা ! আপনার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারি না ।

বিশ্বাস করুন, আমিও ভাবতে পারি না অধ্যাপক । তবে কয়েকদিন ধরে ভেবেছি, আমি যদি আপনার মঙ্গল চাই তাহলে আমার কাছ থেকে আপনাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে ।

অভিমানের সুরে বললাম, আমি এখানে এলে নিশ্চয়ই আপনার কাজের কিছু ক্ষতি হয় । সারাক্ষণ গল্প করে আপনার কাজকর্ম সব পণ্ড করি ।

একেবারেই তা নয় । আপনি এখানে এলে আমারই উপকার । আমার পাবলিকেশনের কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায় । উপরি আছে আনন্দ ।

তবে আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছেন কেন দাদা ?

আপনার মঙ্গলের কথা ভেবে । এতদিন আপনাকে স্বার্থপরের মতো আগলে রেখে আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি ; আপনি বাড়িতে বসেই আমার এ কাজগুলো সহজেই করে ফেলতে পারেন । আমার লোক আপনার বাড়িতে গিয়ে এ কাজগুলো দেয়া-নেয়া করতে পারে । এখানে দীর্ঘসময় আপনাকে বসে থাকতে হবে না । আপনি ঘরে বসে এই সময়গুলো আপনার কাজে লাগাতে পারবেন ।

একটু থেমে দয়ালজী হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরলেন । আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ওঁর হাতটা কাঁপছে ।

উনি বললেন, একদিন আপনার 'শৈলপুরী কুমায়ুন' পড়ে আমি আপনাকে দীপক নিয়ে খুঁজেছিলাম । আমার সেদিনের স্বপ্ন আপনাকে সফল করতে হবে । আপনি অনেক বড় সাহিত্যিক হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন, এই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা । আপনি আর একটুও সময় নষ্ট করবেন না । সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে । তাকে ঠিকমত ধরে নিয়ে যিনি কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন, তাঁর জয় সুনিশ্চিত ।

কষ্টে আমার কথা বন্ধ হয়ে আসছিল । আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর কাছে গিয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিলাম । উনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ।

বললাম, আপনার এ ভালবাসার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব দাদা ।

আমি দেখলাম, দয়ালজীর চোখ সজল হয়ে উঠেছে । ভাঙা গলায় বললেন, আপনি কোনো দিকে না তাকিয়ে শুধু লিখে যাবেন । আমি নিজে গিয়ে আপনার লেখা শুনে আসব ।

আমি ঘরে ফিরে আসছিলাম । মন ভারাক্রান্ত । সন্ধ্যা নেমেছে । সারা আকাশ জুড়ে ঝড় উঠল । বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল ঝড়ের তাণ্ডব । একসময় থেমে গেল সে ঝড় । বেরিয়ে পড়ল নীল আকাশ । একটা শঙ্খচিল উড়ে চলেছে পশ্চিম দিগন্তের দিকে । তার ডানায় লেগেছে শেষ সূর্যের সোনা ।

